নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৪

ইসলাম ও আধুনিক যুগ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-১৪

ইসলাম ও আধুনিক যুগ

মূল : শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : জুন ২০১৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-91723-8-3

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com
✆16297 or 01519521971 ✆ 01832093039 ✆ 01939773354

মূল্য : চারশত আশি টাকা মাত্র

ISLAM O ADHUNIK JUG
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful islam
Price: Tk. 480.00 US$ 9.00

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی

اما بعد:

بندہ بنگلہ دیش کے سفروں میں جناب مولانا حبیب الرحمٰن خان صاحب سے متعارف ہوا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکتبۃ الاشرف کے نام سے یہاں ایک باوقار اشاعتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس سے وہ اکابر علماء دیوبند کی اہم کتابوں کے بنگلہ تراجم شائع کرتے رہتے ہیں جن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رح، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رح، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رح اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدس سرہم کی اہم تالیفات شامل ہیں۔ نیز انہوں نے اس ناکارہ کی تالیفات میں سے "ذکر و فکر"، "جہان دیدہ"، "اصلاحی مجالس" اور دوسری متعدد اہم کتابوں کا معیاری بنگلہ ترجمہ بھی شائع فرمایا ہے۔ اور اس مرتبہ معلوم ہوا کہ حاضری کے وقت دیکھا کہ بندے کے "آسان ترجمۂ قرآن" کی پہلی جلد کا ترجمہ بھی جو مولانا ابو البشر صاحب نے کیا ہے، نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ شائع ہو گئی ہے، اور باقی جلدیں زیر طبع ہیں۔

بندہ بنگلہ زبان سے نابلد ہے، لیکن مستند و معتمد علماء کو ان تراجم کے بارے میں نہ صرف مطمئن بلکہ ترجمے کے صحیح اور بامحاورہ ہونے پر رطب اللسان پایا، اور یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ تمام کتابیں جدید ذوق کے مطابق کتابت و طباعت اور ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ اعلیٰ معیار پر ہیں۔

الحمد للہ، مکتبۃ الاشرف نے یہ بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے اور مسلسل دے رہا ہے جس کی اہل علم و دانش کو پذیرائی کرنی چاہئے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں، اسے خدمت دین کا ذریعہ اور تمام متعلقین کیلئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین

بندہ
محمد تقی عثمانی عفی عنہ
نزیل حال ڈھاکا

۲۶ رجمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
۹ رمئی ۲۰۱۰ء

[শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বহস্তে লিখিত অভিমত ও দুআ]

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর

অভিমত ও দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ.

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিক্‌র ও ফিক্‌র, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্টমানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবুল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)

ঢাকায় অবস্থানকালে

২৯ জুমাদাউল উলা ১৪৩১ হিজরী

৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সউদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তার, অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারা দেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং প্রথমবার প্রকাশকালে দশ খণ্ড ও পরবর্তীতে আরো চারটি খণ্ড এ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ খণ্ড প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড 'ইসলামী মু'আশারাত', পঞ্চম খণ্ড 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি', সপ্তম খণ্ড 'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন', অষ্টম খণ্ড 'উত্তম চরিত্র : ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও অর্জনের উপায়' নবম খণ্ড 'ইসলামী জীবনের কল্যাণময় আদব', দশম খণ্ড 'দৈনন্দিন কাজে প্রিয় নবীর ﷺ প্রিয় দুআ ও আমল', একাদশ খণ্ড 'ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল', দ্বাদশ খণ্ড 'সীরাতে রাসূল ﷺ ও আমাদের জীবন', ত্রয়োদশ খণ্ড 'দ্বীনী

মাদরাসা, উলামা ও তলাবা' এবং চতুর্দশ খণ্ড 'ইসলাম ও আধুনিক যুগ' বিষয়ক। গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বরের বরাত দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডের অনুবাদই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই চতুর্দশ খণ্ড (এবং এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ খণ্ড) **'ইসলাম ও আধুনিক যুগ'**।

এ কিতাবে হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম বিভিন্ন আধুনিক বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। বিশেষত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পৃথিবীর বস্তুরাজী থেকে উপকৃত হওয়ার বিধান সুন্দরভাবে বাতলে দিয়েছেন।

এতে নির্বাচন ও ভোট সম্পর্কে দুটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনাটি যদিও প্রায় প্রথমটিরই অনুরূপ কিন্তু কিছু কিছু নতুন কথাও তাতে আছে বিধায় আমরা তা রেখে দেয়েছি।

আর কিছু আলোচনা এমন আছে যাতে পাকিস্তানের একান্ত নিজস্ব আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এসকল আলোচনায়ও যেহেতু আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু বিষয় আছে, তাই সেগুলোকেও আমরা রেখে দিয়েছি।

আল্লাহ পাক এ সকল আলোচনা দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমীন

আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকাসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ	বিনীত
১২ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭ হিজরী	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মোতাবেক ১৮ জুন ২০১৬ ঈসায়ী	৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
বুড়ো বাবা বৃদ্ধাশ্রমে	১২৩
পশ্চিমা নারী এখন এক বিক্রিপণ্য	১২৪
নারীকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে	১২৪
নারীর প্রতি অবিচার	১২৫
আমাদের সমাজের চালচিত্র	১২৫
প্রকৃতিবিরোধী সাম্য	১২৬
পর্দা নারীর অলংকার	**১২৮-১৩৯**
যৌনচাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থা	১২৯
মানুষ কেন কুকুর-বেড়ালের কাতারে	১২৯
অনিবারণীয় পিপাসাই যার পরিণাম	১৩০
হারাম থেকে বাঁচার জন্য দুই প্রহরী	১৩০
পারিবারিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য পর্দার প্রয়োজনীয়তা	১৩১
নারী ও পোশাক	১৩২
পোশাকের দুই উদ্দেশ্য	১৩২
বাইরে যাওয়ার সময় নারীর বেশভূষা কেমন হবে	১৩৩
চেহারার পর্দা	১৩৩
আসল উদ্দেশ্য বেপর্দা হওয়া	১৩৪
নারী-পুরুষের প্রভেদ ঘুচে গেছে	১৩৫
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ	১৩৫
পর্দাহীনতার সয়লাব	১৩৬
নারীর বিবেক-বুদ্ধির উপরে পর্দা পড়ে গেছে	১৩৭
জনসংখ্যার অর্ধেক বেকার বসে থাকবে	১৩৭
কাজ বলতে কী বোঝায়	১৩৮
সময় থাকতে সচেতন হোন	১৩৮
পর্দাহীনতার সয়লাব	**১৪০-১৪৭**
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পর্দা	**১৪৮-১৫৩**
নারীর মর্যাদা ও তার কর্মক্ষেত্র	**১৫৪-১৬০**
মসজিদে মহিলাদের উপস্থিতি	**১৬১-১৬৭**
নবীযুগে মসজিদে মহিলাদের আগমন	১৬৩
হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহ.)-এর ঘটনা	১৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিশ্বজগতের বস্তুরাজি থেকে উপকারলাভের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বজগত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর প্রতিটি বস্তুকে মানুষের খেদমতে লাগিয়ে দিয়েছেন। এর একেকটি কণা অহর্নিশ মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। এটা এক বাস্তব সত্য। কুরআন মাজীদ এ সত্য বারবার স্পষ্ট করে দিয়েছে। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ

অর্থ : 'আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[১]

সূরা জাছিয়ায় ইরশাদ–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑬

অর্থ : 'তিনি নিজের পক্ষ থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতরে চিন্তাশীল লোকদের জন্য আছে বহু নিদর্শন।'[২]

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেমন একদিকে বান্দার প্রতি কৃত নিজ অনুগ্রহ ও নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে সূক্ষ্মভাবে এদিকেও ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বিশ্বজগতের সমস্ত জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন মানুষের কর্তব্য

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৯

২. সূরা জাছিয়াঃ, আয়াত ১৩

আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত নি'আমত চেনা এবং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী এসবকে জানার চেষ্টা করা। মানুষের কর্তব্য আল্লাহ-প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-চরিত্রকে কাজে লাগিয়ে উপকারী বস্তুরাজি খুঁজে বের করা ও তাকে যথাযথ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। বিশ্বজগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারী যে-সকল বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন, তা যে কত বিপুল, তা কারও পক্ষে অনুমান করাই সম্ভব নয়। এর মধ্যে অনেকগুলো আছে অতি স্পষ্ট, সকলেরই সামনে বিদ্যমান। প্রত্যেকেই অতি সহজেই তার উপকার গ্রহণ করতে পারে এবং অবিরত তা করেও যাচ্ছে। আবার বহু নি'আমত রয়েছে গুপ্ত। খুব সহজেই সেগুলোকে কাজে লাগানো যায় না। তা কাজে লাগানোর জন্যে বিবেক-বুদ্ধি ও শ্রম-সাধনার দরকার এবং দরকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً

অর্থ : 'তোমরা কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গুপ্ত নি'আমতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন।'[৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বজগতকে মানুষের জন্য তো অবশ্যই নিয়োজিত করে দিয়েছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জগতের প্রতিটি বস্তু মানুষ এমনি-এমনিই পেয়ে যাবে, সেজন্য তাদের কোনও রকমের চেষ্টা করতে হবে না ও হাত-পা নাড়াতে হবে না, ব্যস বসে বসেই সবকিছু পেয়ে যাবে; বরং কুরআন মাজীদ জানাচ্ছে যে, আল্লাহ-প্রদত্ত নি'আমত দু'রকমের। কিছু নি'আমত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। তা জানার জন্য কোনও মেহনত করতে হয় না এবং বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগাতে হয় না। কিন্তু কিছু কিছু নি'আমত এরকম প্রকাশ্য নয়; বরং তা গোপন এবং তা জানার জন্য বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগাতে হয় আর তা অর্জনের জন্যে চেষ্টা ও মেহনত করতে হয়। কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

৩. সূরা লুকমান, আয়াত ২০

অর্থ : 'আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য সাগরকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তার নির্দেশে তাতে নৌযান চলাচল করে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[৪]

এ আয়াতে সমুদ্রকে নিয়োজিত করার কারণ বলা হয়েছে এই যে, তার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে। কুরআন মাজীদে সাধারণত 'আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান' দ্বারা 'জীবিকা উপার্জন' বোঝানো হয়ে থাকে। কাজেই এ আয়াতের এক অর্থ তো এই হতে পারে যে, তোমরা যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার সেই লক্ষে তোমাদেরকে সাগরে নৌযান চালানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও মুফাস্‌সির বলেন- এ আয়াতে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান' দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বোঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে আল্লাহ তা'আলার ওই অসংখ্য নি'আমতের অনুসন্ধানকে, যা তিনি সাগরের ভেতর সৃষ্টি করেছেন। যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন- আমি তোমাদের জন্য সাগরের ভেতর অসংখ্য উপকারী বস্তু সৃষ্টি করেছি। সে অসংখ্য উপকারী বস্তুর ধারক সাগরকে আমি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেইসব বস্তুর সন্ধান করে উপকৃত হতে পার। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার উত্তরোত্তর এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলছে যে, সাগরের তলদেশে যত খনিজদ্রব্য, উদ্ভিজ্জ-সামগ্রী এবং আরও হাজারও রকমের গুপ্ত নি'আমত রয়েছে, স্থলভাগে এসব বস্তু অত পরিমাণে নেই।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এদিকেও ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যতবেশি অনুসন্ধান করবে এবং গবেষণার ময়দানে সে যতবেশি এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বজগতের নতুন-নতুন নি'আমত তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে। এমন অনেক নতুন-নতুন বস্তু তার সামনে এসে যাবে, যা আগে সে কল্পনাও করতে পারেনি। উদাহরণত কুরআন মাজীদে মানুষের যানবাহন হিসেবে ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব জায়গায় এসব বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এদিকেও করে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী দিনে মানুষের যানবাহন হিসেবে এমন-এমন নতুন বস্তু তৈরি হবে, যে সম্পর্কে অতীতে মানুষের কোনও ধারণা ছিল না। ইরশাদ হয়েছে-

---

৪. সূরা জাছিয়া, আয়াত ১২

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

অর্থ : 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার উপর সওয়ার হতে পার এবং তা তোমাদের জন্য শোভাস্বরূপ। আর (ভবিষ্যতে) তিনি তোমাদের জন্য এমন সব জিনিস সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা এখনও জান না।'[৫]

কিয়ামত পর্যন্ত যত নতুন-নতুন যানবাহন সৃষ্টি হবে, কুরআন মাজীদ এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে সম্পর্কে আগাম খবর দিয়ে দিয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۚ

অর্থ : 'আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তায়ও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা সত্যবাণী।'[৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন, তাঁর অপার কুদরতের নিদর্শনাবলী প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ লাভ করতে থাকবে। কোনও কালেই তার ধারা বন্ধ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে নতুন-নতুন নি'আমত প্রকাশিত হতে থাকবে। এভাবে কুদরতের নিদর্শন প্রকাশ পেতে থাকবে অবিরাম।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে অনেক বাণী আছে। এস্থলে আরও অনেক উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে, কিন্তু সত্য উপলব্ধির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ্বজগতে কুদরতের বহু গুপ্ত নিদর্শন আছে। গবেষণা, অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছা ও সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা দোষের কিছু নয়; বরং কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তা প্রশংসনীয় কাজ। নিয়ত যদি সহীহ থাকে, তবে এরূপ কাজ বহু কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই ইসলামে এরূপ কাজ দোষের তো নয়ই; বরং কাম্য ও প্রশংসনীয়। ইসলাম এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি; বরং উৎসাহ জুগিয়েছে। এ কারণেই সায়েন্সের ময়দানে অতীতের মুসলিমগণ নিজেদের জ্ঞান-গবেষণার এমন কীর্তি রেখে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে এপথে আলো দান করবে। মুসলিম জাতি তাদের এ অতীত ঐতিহ্য নিয়ে রীতিমত গর্বই করতে পারে।

---

৫. সূরা নাহ্ল, আয়াত ৮
৬. সূরা হা-মীম সাজদাঃ, আয়াত ৫৩

তবে স্মরণ রাখার বিষয় হল,জগতের বস্তুরাজি দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে ধারণা ইসলাম পেশ করেছে, তা পাশ্চাত্যের জড়বাদী ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্য এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছে এবং নিঃসন্দেহে এই শেষ যুগে তারা এ ক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু ইসলামের সাথে এ ব্যাপারে তাদের সর্বপ্রথম ও মৌলিক পার্থক্য হল যে, তাদের দৃষ্টি এ ব্যাপারে বড় সংকীর্ণ। তারা বস্তুর ওপাশে কিছু দেখতে পায় না। তা দেখার যোগ্যতা থেকেই তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কাজেই তাদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে নতুন যেসব বিষয় জানা যায় বা নতুন যা-কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাকে তারা কেবল নিজেদের বাহুবল ও নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির ফসল মনে করে। এর পিছনে সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত মালিকেরও যে হাত আছে, সেদিকে তাদের নজর যায় না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টি এসব শ্রম-সাধনা, অনুসন্ধান ও গবেষণা-অভিজ্ঞতাতেই থেমে থাকে না। তাদের দৃষ্টি চলে যায় আরও দূরে। তারা এসবের পিছনে সেই খালেক ও মালিকের অপার শক্তিকেই কার্যকর দেখতে পায়, যিনি একদিকে নিখিল সৃষ্টিকে মানুষের জন্য নিয়োজিত করে রেখেছেন এবং অন্যদিকে মানুষকে এমন ক্ষমতা ও বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে জগতের বড়-বড় শক্তিকে নিজ বশীভূত করে ফেলে। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা হল, বস্তুর কল্যাণ আহরণের প্রচেষ্টায় কোনও সফলতা লাভ হলে মানুষ তাকে নিজ কৃতিত্ব মনে করবে না এবং সেজন্য অহংকারে লিপ্ত হবে না; বরং নিজ খালেক ও মালিকের সামনে বিনয়াবনত হবে, প্রাণভরে তাঁর শুক্র আদায় করবে, যেহেতু তিনিই তাকে সৃষ্টিনিচয়ের উপর রাজত্ব করার ক্ষমতা দান করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের শিক্ষানুযায়ী একজন মু'মিনের প্রাণের কথা হবে–

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

অর্থ : 'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বস্তুকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। নিশ্চয়ই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।'[৭]

বস্তুর কল্যাণ আহরণের ধারণায় ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী চিন্তা-চেতনায় বস্তুকে আয়ত্তকরতে পারাটাই পরম লক্ষবস্তু। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মানব-জীবনের এছাড়া আর

---

৭. সূরা যুখরুফ, আয়াত ১৩-১৪

কোনও উদ্দেশ্য নেই যে, সে জগতের উপকারী বস্তুরাজি দ্বারা যতবেশি সম্ভব উপকৃত হবে এবং তার ভোগ-উপভোগে লিপ্ত থেকেই জীবন শেষ করে দেবে। এর বাইরে তার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে বস্তু কোনও লক্ষবস্তু নয়; বরং এটা মূল লক্ষার্জনের একটা মাধ্যমমাত্র। এর উপকার ও কল্যাণ সন্ধান মানুষের গন্তব্যপথের একটা মঞ্জিলের বেশি কিছু নয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী হল, সে মানুষ আল্লাহর এক বান্দা। সর্বাবস্থায় সবকিছু দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই থাকবে তার পরম লক্ষ। বিশ্বজগতের বস্তুরাজি দ্বারা উপকারগ্রহণের অধিকার তার কেবল তখনই লাভ হয়, যখন সে নিজ সৃষ্টির লক্ষ এবং নিজের মানবীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিক-ঠিক আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা এই জগতকে অকারণেই মানুষের কর্তৃত্বাধীন করে দেননি। তা করে দিয়েছেন কেবল এই জন্যই যে, এর মাধ্যমে সে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ আদায় করবে। তার দায়িত্ব-কর্তব্য হল আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করা এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

অর্থ : 'আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার 'ইবাদত-বন্দেগী করবে।'[৮]

এ প্রসঙ্গে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের তৃতীয় মৌলিক পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে বস্তুগত গবেষণার মাধ্যমে যে নতুন শক্তি মানুষের হস্তগত হয়, তা ব্যবহারের নিয়ম-নীতিও মানুষ নিজ বুদ্ধি-বিবেক দ্বারাই নিরূপণ করবে। এ ব্যাপারে অন্যকিছুর উপরে সে নির্ভরশীল থাকবে না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হল, যেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এই শক্তি দান করেছেন, একে ব্যবহার করার নীতি-নিয়মও তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা এর বাস্তবসম্মত ও যথোপযুক্ত নিয়ম কেবল তিনিই বলে দিতে পারেন। সুতরাং আধুনিক আবিষ্কারসমূহ কেবল এমনসব কাজে এবং এমন পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা যাবে, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমোদিত। মানুষ যখন ওহীর নির্দেশনা ব্যতিরেকে আধুনিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারের পদ্ধতি নিজেই স্থির করে নেয়, তখন এসব আবিষ্কার মানুষের কোনও কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং জগতের এই উৎকৃষ্ট নি'আমতসমূহ

---

৮. সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

মানবতার কল্যাণসাধনের বিপরীতে কেবল তার ক্ষতিই বয়ে আনতে পারে, অনেক সময় তা মানুষকে ধ্বংস-গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, চন্দ্র ও মঙ্গলে বিজয়-পতাকা উড়ানো সত্ত্বেও মানুষের নিজের জীবন উত্তরোত্তর কেবল অন্ধকারের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। এভাবে ইসলামের বস্তু সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ ও সুদূরপ্রসারী এবং মানবতার পক্ষে অনেক বেশি কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর প্রকৃত মূল্য অনুধাবনের এবং এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

সূত্র : নাশরী তাকরীরেঁ

ইসলামে বিচারক-পদ গ্রহণ সম্পর্কিত নির্দেশনা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اِذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ اَوْ تُعَافِيْنِيْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَالِكَ ؟ وَ قَدْ كَانَ اَبُوْكَ يَقْضِيْ ؟ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ اَنْ يَّنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا" فَمَا اَرْجُوْ بَعْدَ ذَالِكَ ؟

‘আব্দুল্লাহ ইবন মাওহাব (রহ.) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ‘উছমান গণী (রাযি.) হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমর (রাযি.)-কে বললেন, যাও, মানুষের মধ্যে বিচার-আচার কর (অর্থাৎ আমি তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করলাম)। হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমর (রাযি.) বললেন, আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন? তিনি বললেন, কেন, তুমি এটা অপসন্দ করছ কেন? তোমার পিতা ‘উমর ফারূক (রাযি.)-ও তো বিচার করতেন। হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমর (রাযি.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিচারক হবে, অতঃপর ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচারকার্য করবে, সে এর উপযুক্ত হবে যে, সমান-সমানভাবে এর দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবে (অর্থাৎ তার গুনাহ হবে না এবং কোনও ছওয়াবও হবে না আর এটাও তার জন্য অনেক বড় কিছু)। সুতরাং এ হাদীছ শোনার পর আমি আর কিসের আশা করতে পারি (অর্থাৎ বিচারক হিসেবে আমি যে কৃতকার্য হব, সেই আশা বড় কঠিন)?’[১]

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ‘আহকাম’ অধ্যায়ে এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। অধ্যায়টির সূচনাই হয়েছে এ হাদীছটি দ্বারা। আহকাম (احکام) শব্দটি হুকুম (حکم)-এর বহুবচন। হুকুম অর্থ বিচার করা, ফয়সালা করা। কাজী বা বিচারক কর্তৃক ফয়সালাদান সম্পর্কে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) এই অধ্যায়ে তা উদ্ধৃত করেছেন। কোনও কোনও হাদীছ-

---

১. তিরমিযী, হাদীছ নং ১২৪৩

গ্রন্থে এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'আল-আকযিয়াঃ'। আহকাম ও আকযিয়াঃ দ্বারা একই কথা বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিচারকালে বিচারক কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখবে এবং এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধানাবলী কী, তা বর্ণনা করাই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

বিচারকের পদ গ্রহণ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা

ইমাম তিরমিযী (রহ.) এ সম্পর্কে সামনে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ اَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ

'যে ব্যক্তি বিচারকের পদ গ্রহণ করে কিংবা যাকে মানুষের মধ্যে বিচারক নিযুক্ত করা হয়, তাকে যেন বিনা ছুরিতে জবাহ করে দেওয়া হল।'[১০]

এসব হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, বিচারকের পদ কতটা স্পর্শকাতর এবং এটা কত গুরুভার দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা যাকে হেফাজত করেন, তার পক্ষেই এ দায়িত্ব যথাযথ পালন সম্ভব, অন্যথায় এ পদের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে বরবাদ হয়ে যায়। এসব হাদীছের প্রতি লক্ষ করেই পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন বিচারকের পদ গ্রহণ করতে রাজি হতেন না। তাঁরা সর্বদাই এ পদ অগ্রাহ্য করে চলতেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ঘটনা তো প্রসিদ্ধ যে, তাঁকে যখন বিচারপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, তিনি কোনওক্রমেই তা গ্রহণ করতে রাজি হননি। এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তাকে কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ পদ গ্রহণ করেননি। এরকম আরও বহু 'উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা এ পদকে যে-কোনও মূল্যে এড়িয়ে গেছেন।

'উলামায়ে কিরামের অনেকে যে কারণে এ পদ গ্রহণ করেছিলেন

অপরদিকে অনেক 'আলেম সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা বিচারকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) তো সারা মুসলিম জাহানের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তাছাড়া আরও অনেকেই এ পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিষয়টাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তাদের সামনে ছিল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছ–

---

১০. তিরমিযী, হাদীছ নং ১২৪৭; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩১০০; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২২৯৯; আহমাদ, হাদীছ নং ৬৮৪৮

"যে ব্যক্তি দু'জন লোকের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার করে দেয়, তার এ বিচারকার্য সত্তর বছর 'ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।"[১১]

দৃশ্যত উভয় প্রকার হাদীছ পরস্পর বিরোধী মনে হয়,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কেননা উভয়ের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় যে, যে ব্যক্তি বিচারক পদে নিয়োগলাভের উপযুক্ত এবং সে নিজের পক্ষ থেকে এ পদের আকাঙ্ক্ষী না হয় এবং এ পদ লাভের জন্য কোনও চেষ্টা-তদবিরও না করে; বরং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্বক তাকে এ পদে বসিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে আল্লাহর ভয়ে ভীত থেকে শরী'আতের বিধান মোতাবেক ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার-আচার করে, তার জন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছ প্রযোজ্য যে– "ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার করা সত্তর বছর 'ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।"

অপরদিকে যে ব্যক্তি বিচারক হওয়ার উপযুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও এ পদ গ্রহণ করে নেয়, কিংবা যে ব্যক্তি বিচারক পদের জন্য উপযুক্ত, কিন্তু পদটি সে গ্রহণ করে নিজ আকাঙ্ক্ষায় এবং এর জন্য সে চেষ্টা-তদবিরও করে থাকে, তবে তার ক্ষেত্রেই প্রথমোক্ত হাদীছ প্রযোজ্য। যাতে বলা হয়েছে– "বিচারককে যেন বিনা ছুরিতে জবাহ করে দেওয়া হলো।"

বিচারকের পদগ্রহণ সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা

'উলামায়ে কিরাম বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিচারক-পদের জন্য যদি অন্য কোনও উপযুক্ত লোক থাকে এবং অন্য কারও পক্ষে বিচারপতি হওয়া সম্ভব হয়, তবে এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব নিজেকে এ পদ থেকে দূরে রাখা উচিত। আর যদি অন্য কোনও উপযুক্ত লোক না থাকে এবং নিজে এ পদের জন্য লালায়িত না হয়, কোনও রকম চেষ্টা-তদবিরও না করে; বরং তাকে পদগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়, তবে এ অবস্থায় এ পদ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং আশা করা যায়, যথাযথভাবে দায়িত্বপালনের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও লাভ হবে। যেমন কোনও কোনও হাদীছে আছে–

"এরূপ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেন, যে তাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখে।"

---

১১. ইতহাফুল-খিয়ারতিল মাহারাঃ বি-যাওয়াইদিল মাসানীদিল 'আশারাঃ ২খ, ৪১৯৮পৃ.; তাফসীরে হাক্কী ৮খ, ৪১৫পৃ.; বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাঃ ফী শারহি তরীকাতিন মুহাম্মাদিয়্যাঃ ২খ, ৩৫৮পৃ.

কিন্তু কেউ যদি নিজেই চেষ্টা-তদবির করে এ পদ অর্জন করে, তবে তার সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে–

وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কোনও সাহায্য লাভ হয় না।

সারকথা যথাসম্ভব নিজেকে বিচারক-পদ থেকে দূরে রাখতে হবে। এই পদ লাভের জন্য নিজে প্রার্থী হওয়া যাবে না, মনে মনে আশা করা যাবে না এবং কোনওরূপ চেষ্টা-তদবিরতো নয়ই। অবশ্য যদি জোরপূর্বক এ দায়িত্বে বসিয়ে দেওয়া হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এ অবস্থায় যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাতে বিচারকার্য ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সম্পন্ন হয়, কোনওরূপ অন্যায় আচরণ ও পক্ষপাত না হয়ে যায় এবং শরী'আতের সীমারেখা পুরোপুরি রক্ষা হয়। সেইসংগে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করতে হবে। এ অবস্থায় ইনশাআল্লাহ যথাযথ দায়িত্বপালনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হবে।

হযরত ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক পদ প্রার্থনা

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তো পদ প্রার্থনা করেছিলেন, যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : 'ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন, আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি।'[১২]

প্রশ্ন হল, পদপ্রার্থনা যদি নিষেধই হয়, হযরত ইউসুফ (আঃ) তা কেন চেয়েছিলেন?

উত্তর হল, তিনি যে পদ চেয়েছিলেন, সেটা না ছিল বিচারপতির পদ এবং না মুফতীর পদ; বরং তা ছিল একরকম মন্ত্রীত্ব ও ব্যবস্থাপনার পদ। যদিও ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারেও বিধান এটাই যে, কেউ তা লাভের আকাঙ্ক্ষী হবে না, আশা করবে না, নিজের পক্ষ থেকে তা প্রার্থনা করবে না এবং কোনওরকম চেষ্টা-তদবিরও করবে না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম

১২. সূরা ইয়ূসুফ, আয়াত ৫৫

হতে পারে। ব্যতিক্রম অবস্থায় নিজের পক্ষ থেকে পদ চাওয়া জায়েয। সে ব্যতিক্রম অবস্থা হতে পারে এরকম যে, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উপযুক্ত কোনও লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যাদেরকে পাওয়া যায়, তাদের ব্যাপারে আশংকা– তারা ইনসাফ রক্ষা করবে না, তারা মানুষকে পেরেশান করবে এবং লোকে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে এরকম কোনও আশংকা নেই, ব্যস এ অবস্থায় নিজে পদপ্রার্থী হওয়া জায়েয। যে-কোনও রকমের পদ এ ব্যতিক্রম অবস্থার অন্তর্ভুক্ত, তা রাষ্ট্রনায়কের পদ হোক, মন্ত্রীত্ব হোক, কোনও ব্যবস্থাপনাগত বিষয় হোক কিংবা বিচারপতিত্ব ও মুফতীর পদ হোক। এসব পদের জন্য যদি কোনও উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ন্যায় ও ইনসাফ রক্ষা করবে এমন কোনও লোক চোখে না পড়ে আর নিজের প্রতি এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা থাকে, তবে সে অবস্থায় পদ চাওয়া জায়েয। হযরত ইউসুফ (আঃ) যে বলেছিলেন–

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ

'আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন।'

তখনও সুরতহাল এরকমই ছিল। বাদশা তাকে একটা পদ দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কোন্ পদ দেওয়া হবে, তখনও তা স্থির হয়নি। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ) যে পদের ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থা ছিল, তা চেয়ে নেন। তিনি মনে করেছিলেন– আমি যদি এ পদ গ্রহণ না করি, তবে অন্য কোনও অযোগ্য লোক এতে চেপে বসবে, ফলে মানুষ তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষকে সেই ক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষেই তিনি সেই পদটি চেয়ে নিয়েছিলেন।

কোনও নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রচলিত নির্বাচনসমূহের বিধানও বের হয়ে আসে। এসব নির্বাচনে ব্যক্তি নিজেই প্রার্থী হয় এবং মানুষের কাছে তাকে নির্বাচিত করার আবেদন জানায়। কেবল প্রার্থী হয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং নিজের গুণাবলী, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদিও গেয়ে বেড়ায়। 'আমার এই গুণ আছে', 'আমি এরকম-সেরকম', 'নির্বাচিত হলে আমি এই-এই করব', 'কাজেই আমি ভোট পাওয়ার বেশি অধিকার রাখি', 'আপনাদের উচিত আমাকেই নির্বাচিত করা'– এ জাতীয় আরও নানা দাবি-দাওয়া প্রচার করে বেড়ায়। কেবল তাই নয়; এর সাথে তার বিপরীতে যারা যারা প্রার্থী হয়েছে

তাদের কুৎসা গেয়ে বেড়ায়, যেমন তাদের এই-এই দোষ আছে, ওদের কোনও যোগ্যতা-দক্ষতা নেই, ওদের কাউকে ভোট দেওয়া উচিত নয় ইত্যাদি। এ নীতি সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী। হাঁ অন্য কোনও উপযুক্ত লোক যদি না থাকে এবং যারা প্রার্থী হয়েছে তাদের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তবে সে অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নীতি অনুযায়ী প্রার্থী হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও নিজের গুণাগুণ প্রচার করে বেড়ানো কিছুতেই জায়েয নয়, যেমনটা প্রচলিত নির্বাচনে করা হয়ে থাকে।

আজকাল দুনিয়ার সব নিয়মই উল্টো হয়ে গেছে। অতীতে কেউ যদি নিজের সম্পর্কে বলত– আমি এই পদের উপযুক্ত, আমার প্রতিপক্ষ এ পদের উপযুক্ত নয়; তবে নৈতিকভাবে এটাকে খুবই দূষণীয় মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানকালে সেই দোষের কাজই প্রশংসনীয় হয়ে গেছে। এরূপ করতে পারাকে দক্ষতা মনে করা হয় এবং যে যত বেশি করতে পারে, তাকেই বেশি উপযুক্ত মনে করা হয়। যে কারণে আজকাল প্রার্থী হয়ে মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নিজের গুণ-গরিমা বয়ান করা হয়। অথচ দ্বীন ও শরী'আতে এটা মোটেই পসন্দনীয় নয়। [জনৈক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিল, আপনি (অর্থাৎ জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী সাহেব) তো বিচারপতি-পদ গ্রহণ করেছিলেন, তা গ্রহণ করার কী কারণ হয়েছিল? অনেকের কাছে শুনেছি– আপনি এ পদ থেকে ইস্তফাও দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে বুযুর্গদের পীড়াপীড়িতে তা আবার প্রত্যাহার করে নেন। আসলে বিষয়টা কী হয়েছিল?]

আমার বিচারপতি-পদ গ্রহণের ঘটনা

আমাকে যখন বিচারপতি-পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আমি নিজেকে রক্ষার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু হাজারও পলায়ন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এ ফাঁস গলায় লেগেই যায়। ঘটনার সংক্ষেপ এরকম–

> "পাকিস্তানে 'উলামায়ে কিরামের দাবিতে এক পর্যায়ে শরী'আ আদালত গঠিত হয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এ আদালত কায়েম করেছিলেন। সারাদেশের বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রায় পঁয়তাল্লিশটি গ্রুপের 'উলামায়ে কিরাম সম্মিলিতভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সংগে সাক্ষাত করে দাবি জানিয়েছিলেন যে, এদেশের প্রচলিত বহু আইন শরী'আতবিরোধী। সে আইনের আওতায় যেসব বিচার-

আচার হয়ে থাকে, তাতে মানুষের বহু দ্বীনী অধিকার খর্ব হয়। এর প্রতিকারকল্পে 'শরী'আতী আদালত' গঠন করা এখন সময়ের দাবি। আমরা আশা করব, আপনি এই দাবি পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এ দেশে বহু যোগ্য 'উলমায়ে কিরাম আছেন, তাদের মাধ্যমে এ আদালত সুচারুরূপে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক তাদের এ অনুরোধ গুরুত্বের সংগে বিবেচনায় নেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি অবশ্যই এ আদালত গঠন করব। এজন্য আপনারা উপযুক্ত 'উলামায়ে কিরামের নাম পেশ করুন।

জিয়াউল হক সাহেবের সাথে মুলাকাত করার পর সকল শ্রেণীর 'উলামায়ে কিরাম রাওয়ালপিন্ডিতে একত্র হন। আমার আশংকা ছিল 'উলামায়ে কিরামের যে তালিকা প্রণিত হবে, পাছে আমার নামও তাদের তালিকায় এসে যায়। তা থেকে বাঁচার জন্য আমি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করি যে, আমার বিবেচনায় যোগ্য এরকম দু'জন 'আলেমের নাম একটি কাগজে লিখে 'উলামায়ে কিরামের সেই সভায় পেশ করি এবং তাদেরকে জানাই যে, আমার দৃষ্টিতে এ দুই হযরত এই কাজের উপযুক্ত। আপনারা পরামর্শক্রমে যা ভালো মনে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তারপর আমি অতিদ্রুত পালিয়ে করাচি চলে যাই। আমার ভয় ছিল সভাস্থলে থাকলে তারা আমাকে এ পদের জন্য বাধ্য করবেন। তিনদিন পর্যন্ত 'উলামায়ে কিরামের সেই সভা চলতে থাকে। তাতে বিশেষভাবে আলোচনা চলতে থাকে যে, শরী'আতী আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে কার নাম পেশ করা যায়।

তিনদিন পর 'উলামায়ে কিরাম তাদের তিনজন প্রতিনিধি করাচিতে আমার কাছে প্রেরণ করেন। তাদের একজন হলেন হযরত মুফতী যাইনুল 'আবেদীন সাহেব, আরেকজন হাকীম 'আব্দুর-রাহীম আশরাফ এবং তৃতীয় আরেকজন তাদের সংগে ছিলেন। তারা আমাকে জানালেন যে, তিনদিনের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে 'উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তোমাকে এ পদ

গ্রহণ করতে হবে। আমি তাদের কাছে এই বলে ক্ষমা চাইলাম যে, এক তো আমি এই পদের যোগ্য নই, দ্বিতীয়ত বর্তমানে যেসব দায়-দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হচ্ছে সে অবস্থায় এরকম কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বগ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আমি দারুল-'উলূম করাচি ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। অথচ ওই দায়িত্ব নিলে আমাকে দারুল-'উলূম ছাড়তে হবে। কারণ ওই দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাকে স্থায়ীভাবেই রাওয়ালপিন্ডি থাকতে হবে। সুতরাং আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এমনকি আমি করজোড়ে নিবেদন করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই দায়িত্বগ্রহণ থেকে রেহাই দেবেন। তারা অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু আমি বললাম, আমি আপনাদের যে-কোনও কথা মানতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই একটি কথা মানা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। শেষে তারা বললেন, তুমি যদি এই পদ গ্রহণ না কর তবে গুনাহগার হবে। এখন ইচ্ছা হয় মান আর ইচ্ছা হয় না মান। ব্যস আমরা তোমার নামই দিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, আপনারা আমার নাম দিলে নিজ দায়িত্বেই দেবেন। পরে যখন আমার নাম ঘোষিত হবে, তখন আমি পত্র-পত্রিকা মারফত প্রচার করে দেব যে, আমার সম্মতি ছাড়াই আমার নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমরা কেবল তোমাকে ইত্তিলা' দিতেই এসেছি, পরামর্শ করার জন্য আসিনি।

এই ঘটনার আগে জিয়াউল হক সাহেব আমার সামনে উল্লেখ করেছিলেন যে, আমি এরকমের একটি আদালত কায়েম করতে যাচ্ছি। আমি আপনাকে তাতে রাখতে চাই। আমি তাকেও স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, আমি এ কাজের জন্য মোটেই প্রস্তুত নই।

যাহোক ওই তিন ব্যক্তি তো ওই কথা বলে চলে গেলেন। পরে তাদের একজন আমার সংগে আবার যোগাযোগ করলেন এবং আমাকে বললেন, আমরা শেষবারের মত

জানাচ্ছি যে, ওই পদের জন্য আপনার নাম দিয়ে দিচ্ছি। আমি বললাম, আমিও শেষবারের মত বলছি এ পদ আমি কিছুতেই গ্রহণ করব না। কিন্তু তারপর জিয়াউল হক সাহেব হঠাৎ করেই আমার নাম ঘোষণা করে দিলেন। তারপর ফোন করে আমাকে বললেন, আমরা এরকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমার জানা আছে আপনি এটা কবুল করার জন্য প্রস্তুত নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুরোধ করছি এই মুহূর্তে আমার ইজ্জত রক্ষার্থে কিছুদিনের জন্য এটা গ্রহণ করে নিন। তারপর যখন ইচ্ছা ইস্তফা দিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি আমার শায়খ হযরত ডাক্তার 'আব্দুল-হাই সাহেব (রহ.)-এর কাছে গিয়ে মাশওয়ারা করলাম। সময়টা ছিল শা'বান মাস। দারুল-'উলূমের ছুটি হতে যাচ্ছিল। হযরত বললেন, মাদরাসা যতদিন ছুটি থাকবে ততদিন সেখানে গিয়ে কাজ কর, ছুটি শেষে ইস্তফা দিয়ে দিও। সুতরাং হযরত (রহ.)-এর নির্দেশ মোতাবেক দারুল-'উলূমের ছুটিতে সেখানে চলে যাই এবং আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দিই। দু'মাস পর যখন শাওয়াল মাস শুরু হল, আমি ইস্তফা দেওয়ার জন্য জিয়াউল হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলাম। জিয়াউল হক সাহেব বললেন, ইস্তফা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া কিসের? আপনি ইস্তফা না দিয়ে বরং ছুটি নিয়ে নিন। ছুটি নিয়ে দারুল-'উলূম চলে যান এবং সবক পড়াতে থাকুন। আমার ইচ্ছা পরবর্তীতে আপনাকে সুপ্রীমকোর্টে পাঠিয়ে দেব। সেখানে কাজের চাপ কম পড়বে, ফলে ইসলামাবাদে অবস্থান করার দরকার হবে না। আমি আবার আমার শায়খ হযরত ডাক্তার 'আব্দুল-হাই (রহ.)-এর কাছে চলে গেলাম। তিনিও বললেন, হাঁ এরকমই কর। সুতরাং যতদিন আমি শরী'আতী আদালতে থাকলাম, বেশিরভাগ সময় ছুটি কাটালাম এবং দারুল-'উলূমে সবক পড়াতে থাকলাম। যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ মোকাদ্দামা আসত তখন চলে যেতাম। পরিশেষে জিয়াউল হক সাহেব আমাকে সুপ্রীমকোর্টে পাঠিয়ে দেন। আমি আবারও আমার শায়খ

(রহ.)-এর সাথে মাশওয়ারা করলাম। তিনি বললেন, 'যখন তোমার ব্যাপারে সমস্ত 'উলামায়ে কেরাম একমত এবং দেওবন্দী, ব্রেলভী ও আহ্‌লে হাদীছ– এ তিনও চিন্তাধারার 'আলেমগণ তোমাকে চাচ্ছেন, আবার কাজটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লোকে মনে করে তুমি এ কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে, তখন আর তোমার পিছিয়ে থাকা উচিত হবে না, এরূপ অবস্থায় অস্বীকৃতি জানানো সমীচীন নয়। তাছাড়া তোমাকে যখন সুপ্রীমকোর্টে পাঠানো হচ্ছে তখন দারুল-'উলূমের দায়িত্বপালনেও কোনও সমস্যা হবে না। এখানকার কাজও ঠিক-ঠিক আঞ্জাম দিতে পারবে আবার একই সাথে ওখানকার কাজও চালিয়ে যেতে পারবে। কাজেই আল্লাহর নাম নিয়ে কবুল করে নাও'। ব্যস এই হল আমার বিচারক-পদ গ্রহণের ইতিবৃত্ত।"

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী ১ম খণ্ড, ২৫৭-২৬৩

ইসলাম ও আধুনিকতা

নতুনের প্রতি টান বা নতুনকে ভালোবাসা এমনিতে একটি প্রশংসনীয় আবেগ। এটা মানুষের এক স্বভাবজাত চাহিদা। এই আবেগ ও চাহিদা না হলে মানুষ পাথরের যুগ থেকে আনবিকের যুগে পৌঁছাতে পারত না। উট ও গরুর গাড়ি ছেড়ে উড়োজাহাজে চড়া তার পক্ষে সম্ভব হত না। মোমবাতি ও মাটির প্রদীপ থেকে বৈদ্যুতিক বাতি ও সার্চলাইট পর্যন্ত তার উন্নতি সাধিত হত না। মানুষের এই যাবতীয় বস্তুগত উন্নতি ও সায়েন্টেফিক বিজয় এই আধুনিকপ্রিয়তারই সুফল। আজ মানুষ একদিকে গ্রহ-নক্ষত্রে নিজ বিজয়পতাকা উড্ডীন করছে, অন্যদিকে সাগরের তলদেশে মণিমুক্তা কুড়াচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই বিস্ময়কর উন্নতি তার স্বভাবগত এই স্পৃহারই দান যে, সে নতুনকে ভালোবাসে এবং নতুন থেকে নতুনতর কিছু প্রাপ্তির লালসাবোধ করে।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবধর্ম, তাই কেবল নুতনত্বের কারণে কোনও নতুনের প্রতি সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি; বরং ক্ষেত্রবিশেষে সে তাকে উত্তম সাব্যস্ত করেছে এবং তার প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছে। বিশেষত শিল্প-কারখানা, রণসামগ্রী, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন-নতুন পন্থাকে ইসলাম স্বাগত জানিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নতুন পন্থার ব্যবহার খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও প্রমাণিত আছে। আহযাবের যুদ্ধকালে আরবের বিভিন্ন গোত্র একাট্টা হয়ে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিরোধকল্পে হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) একটি নতুন কৌশলের প্রস্তাবনা পেশ করেন। আরব ইতিপূর্বে সে কৌশলের সংগে পরিচিত ছিল না। কৌশলটি ছিল এই যে, নগরের চারদিকে গভীর পরিখা খনন করা হোক, যাতে শত্রুসৈন্য তা অতিক্রম করে শহরের ভেতর হামলা চালাতে না পারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কৌশলকে পসন্দ করেন। সুতরাং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে পরিখা খননের নির্দেশ দান করেন এবং নিজেও খননকার্যে শরীক থাকেন।[১৩]

---

১৩. আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ ৪খ, ৯৫পৃ.

হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)-এরই পরামর্শক্রমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের যুদ্ধে দু'টি নতুন অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। কোনও কোনও বর্ণনা মোতাবেক হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) নিজ হাতে তা তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল 'মিনজানীক'– আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী তাকে কামান বলা চলে। আর ছিল দু'টি 'দাব্বাবাঃ'–এ যুগের পরিভাষায় তাকে 'ট্যাঙ্ক' বলা যায়।[১৪]

কেবল এতটুকুই নয়, অর্থাৎ অন্যের তৈরি নতুন দ্রব্য ব্যবহার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন-নতুন সমরাস্ত্র তৈরিরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। হাফেজ ইবন কাছীর (রহ.) উদ্ধৃত করেন–

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'উরওয়াহ ইবন মাস'উদ (রাযি.) ও হযরত গায়লান ইবন সালামাঃ (রাযি.)– এ দু'জন সাহাবীকে শামের 'জারাশ' নগরে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তারা সেখানে গিয়ে 'দাব্বাবাঃ', 'মিনজানীক' ও 'দাবূর' তৈরির কলাকৌশল শিখে নেন। 'জারাশ' শামের একটি প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী ছিল। 'দাবূর' ছিল 'দাব্বাবাঃ'-এর মতই একটি সমরাস্ত্র। রোমানগণ তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহে এটি ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক ওই দুই সাহাবী জারাশ নগরে চলে যান এবং যথারীতি এসব অস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। যে কারণে তারা তায়েফের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি।"[১৫]

ইবন জারীর তাবারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, কৃষি উন্নয়নের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীকে বেশি বেশি চাষাবাদ করার নির্দেশ দান করেন। জমির উর্বরশক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি উটেরহাড়গোড় ব্যবহার করতে বলেন।

এক হাদীছে আছে–

"ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে পরামর্শ দান করেন, তারা যেন কাপড়ের ব্যবসা করেন। কারণ কাপড় ব্যবসায়ী মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে।"[১৬]

---

১৪. আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ ৪খ, ৩৪৮পৃ.

১৫. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা ২খ, ২২১পৃ.; আত-তাবারী ২খ, ৩৫৩পৃ.; আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ ৪খ, ৩৪৫পৃ.

১৬. কানযুল-উম্মাল ২খ, ১৯৯পৃ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশে সফর করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেমন তিনি অনেককে ওমান ও মিশরে যেতে উৎসাহ দান করেন।[১৭]

চাষাবাদ ও খনিজসম্পদের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বহু হাদীছেই এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশনা পাওয়া যায়। এক হাদীছে তিনি আদেশ দান করেন–

اُطْلُبُ الرِّزْقَ فِيْ خَبَايَا الْاَرْضِ

'তোমরা মাটির ভেতরে গুপ্ত সম্পদের ভেতর জীবিকা সন্ধান কর।'[১৮]

আরবজাতি নৌবাহিনী ও নৌ-যুদ্ধের সাথে পরিচিত ছিল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যদিও নৌবাহিনী গঠনের অবকাশ আসেনি, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, যা পরবর্তীকালে মুসলিম জাতিকে নৌবাহিনী গঠনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ দান করে। একদা তিনি অত্যন্ত আনন্দের সংগে তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে–

"আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সাগরের ঢেউয়ের ভেতর এমনভাবে সফর করবে যে, তাদেরকে দেখতে সিংহাসন-আসীন রাজা-বাদশার মত মনে হবে।"[১৯]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে প্রথম নৌ-যোদ্ধাদের অনেক বড় ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত 'উছমান (রাযি.)-এর খেলাফতকালে পূরণ হয়েছিল। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) খলীফার অনুমতিক্রমে প্রথম নৌবহর গঠন করেন। এর ফলে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কুবরুস, রোডিস, ক্রেট ও সিকলিয়া পর্যন্ত পৌছে যায়। এমনকি সম্পূর্ণ ভূমধ্য সাগর তাদের করতলগত হয়ে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মরহুম কবি ইকবাল বলেন–

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی

بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی

'এখানে ছিল একদা ওই মরুচারীদের কোলাহল
তাদের নৌবহরের মহড়ায় মুখর ছিল একদা দরিয়া।'

---

১৭. কানযুল-উম্মাল ২খ, ১৯৭পৃ.
১৮. কানযুল-উম্মাল ২খ, ১৯৭পৃ.
১৯. বুখারী, হাদীছ নং ২৫৮০; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৫৩৫; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫৬৯; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩১২০

হযরত 'আমর ইবনুল-'আস (রাযি.) হিজরী অষ্টম সালে 'বনূ লুখাম' ও 'বনূ জুযাম'–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যা 'যাতুস-সালাসিল'-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। তিনিই সর্বপ্রথম এ যুদ্ধে 'ব্লাকআউট'-এর পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন– তিনদিন পর্যন্ত কেউ সেনাশিবিরে কোনও আলো জ্বালাবে না এবং আগুন ধরাবে না। সকল সৈন্য তাঁর এই নির্দেশ পালন করেছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছার পর তাঁর এই কৌশল সম্পর্কে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন তুমি এটা কেন করেছিলে? হযরত 'আমর ইবনুল-'আস (রাযি.) উত্তর দেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শত্রুসৈন্যের বিপরীতে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা অনেক কম ছিল। তাই আমি রাতের বেলা কোনওরকম আলো জ্বালাতে নিষেধ করে দিই, যাতে শত্রুগণ আমাদের সংখ্যা-স্বল্পতার কথা টের না পেয়ে যায়। কেননা তা টের পেলে তাদের মনোবল অনেক বেড়ে যেত এবং বিপুল, বিক্রমে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই রণকৌশলকে অনেক পসন্দ করেন এবং এই জন্য আল্লাহ তা'আলার শুক্র আদায় করেন।'[২০]

এগুলো নবীযুগের কয়েকটি উদাহরণ। উপস্থিতভাবে এসব মনে পড়ে গেল। এগুলো পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, ইসলাম কেবল নতুনত্বের কারণে কোনও নতুন বিষয়কে অপসন্দ করেনি এবং কোনও নতুন পদক্ষেপে আপত্তি জানায়নি; বরং যে-কোনও নতুন পদক্ষেপ যদি সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় এবং তাতে শরী'আতের সীমারেখা রক্ষা করা হয়, তবে ইসলামে তা মোটেই দূষণীয় নয়; বরং ইসলাম তাকে স্বাগত জানিয়েছে ও তাতে উৎসাহ দান করেছে।

তবে এটাও এক অনস্বীকার্য সত্য যে, নতুনের প্রতি আকর্ষণ যেভাবে মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিয়েছে, তাকে নতুন-নতুন আবিষ্কার দান করেছে এবং সুখ ও আরামের নতুন-নতুন উপকরণ ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দান করেছে, তেমনি তা মানুষকে নানা রকম আত্মিক রোগ-ব্যাধিতেও আক্রান্ত করেছে এবং মানুষের অনেক ধ্বংসাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে।

এই আধুনিকতাপ্রীতির বদৌলতে মানুষের ইতিহাস ফির'আউন ও শাদ্দাদদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, যারা ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যলিপ্সার কোনও স্তরে পরিতুষ্ট হতে পারেনি; বরং তারা ক্ষমতা বিস্তারের উদ্দীপনায় রাজত্ব ও

---

২০. জাম'উল-ফাওয়ায়েদ ২খ, ২৭পৃ.

বাদশাহির স্তর অতিক্রম করে ঈশ্বর হওয়ার দাবিদার বনে বসে। এই আধুনিকতাপ্রীতিই একদা হিটলার ও মুসোলিনির জন্ম দিয়েছে, যাদের সাম্রাজ্যলিপ্সা নিত্য-নতুন ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব কামনা করত। এ আধুনিকতাপ্রীতিই আজ সমগ্র বিশ্বকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সয়লাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই আধুনিকতাপ্রীতি আজ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যভিচারকে বৈধ করে দিয়েছে; বরং সাম্প্রতিক বৃটেনের জাতীয় পরিষদে বিপুল করতালির ডামাডোলের ভেতর সমকামের মত বিকৃত রুচিরবিলও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই আধুনিকতাপ্রীতির ছত্রচ্ছায়ায় পাশ্চাত্যের নারীরা আজ গর্ভপাত বৈধ করার দাবিতে প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করছে। এমনকি এই আধুনিকতাপ্রীতিই সেই বস্তু, যাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে আজ মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ পাতানোর দাবি তোলা হচ্ছে। সুতরাং বোঝা গেল আধুনিকতাপ্রীতি এক দোধারী তরবারি, যা মানুষের কল্যাণেও কাজে আসতে পারে আবার তার চূড়ান্ত সর্বনাশও ঘটাতে পারে।

সুতরাং একটি নতুন জিনিস কেবল নতুন হওয়ার ভিত্তিতে যেমন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তেমনি কেবল নতুন হওয়ার কারণে বর্জনীয়ও হতে পারে না। এতটুকু পর্যন্ত কথা পরিষ্কার, কিন্তু এরপর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই মাপকাঠি, যার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে কোন্ নতুন ভালো ও গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টি মন্দ ও বর্জনীয়?

এ মানদণ্ড নির্ণয়ের একটা পন্থা তো এই হতে পারে যে, বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে বিবেক-বুদ্ধির হাতে সমর্পণ করা হবে। সুতরাং সেক্যুলার-সমাজে এই মীমাংসা বিবেক-বুদ্ধির উপরেই ন্যস্ত আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সমস্যা হল, আধুনিকতাপ্রীতির নামে যারা মানবতা থেকে নীতি-নৈতিকতা ও সম্ভ্রম-শালীনতার যাবতীয় সদগুণ কেড়ে নিয়ে তাকে পশুত্ব ও হিংস্রতার অন্ধগলিতে নিক্ষেপ করেছে,তারা সকলে বুদ্ধি-বিবেক ও জ্ঞান-বিদ্যারই দাবিদার ছিল। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিরেট বুদ্ধি-বিবেককে নিজের পথপ্রদর্শক বানায়নি।

এর কারণ এই যে, ওহীর পথপ্রদর্শন থেকে মুক্ত হওয়ার পর বুদ্ধির সত্যিকারের কোনও শূচীতা থাকে না। সে হয়ে পড়ে এমন সর্বত্রগামী প্রেমিকার মত, যাকে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রতিটি পক্ষ নিজের মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে কারও নয়। সুতরাং এরকম বুদ্ধির কাছে প্রতিটি মন্দ থেকে মন্দতর দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কাজের পক্ষেও অতি চমৎকার যুক্তি এবং অতি আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা মিলে যায়।

উদাহরণত হিরোশিমা ও নাগাসাকির নাম শোনামাত্র মানবিকতাবোধসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ আজও ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে, অথচ ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মত আন্তর্জাতিক জ্ঞানকোষে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটমবোমা নিক্ষেপের ফলে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল, সে কথা তো লেখা হয়েছে শেষদিকে, কিন্তু নিবন্ধের শুরুতে অ্যাটমবোমার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে–

> "Former Prime Minister Winston Churchill estimated that by shortening the war The atomic bomb had saved the lives of 1000,000 U.S. soldiers 250,000 British soldiers"
>
> 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল অনুমান করেন, অ্যাটমবোমা যুদ্ধ সংক্ষেপ করে ১০ লাখ মার্কিন সৈন্য এবং ২৫০,০০০ লাখ বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ রক্ষা করেছে।'[২১]

এবারে ভাবুন তো, এ ধরনের যুক্তির আলোকে এমন কোন্ জুলুম-নির্যাতন এবং কোন্ নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা আছে, যাকে বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলা যেতে পারে?

যুক্তি-বুদ্ধিভিত্তিক এ জাতীয় ব্যাখ্যার আরও বহু উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আমি লজ্জা-শরমের ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আরেকটি উদাহরণ পেশ করতে চাই, যা দ্বারা নিরেট বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থান ভালোভাবে স্পষ্ট হতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে 'বাতিনি' নামে একটি ফেরকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ফেরকার এক প্রসিদ্ধ নেতা হল 'আব্দুল্লাহ কাইরোয়ানি'। তিনি তার এক চিঠিতে লেখেন–

وَ مَا الْعَجَبُ مِنْ شَيْئٍ كَالْعَجَبِ مِنْ رَجُلٍ يَدَّعِىْ الْعَقْلَ ثُمَّ يَكُوْنُ لَهٗ اُخْتٌ اَوْ بِنْتٌ حَسْنَاءُ وَ لَيْسَتْ لَهٗ زَوْجَةٌ فِىْ حُسْنِهَا فَيُحَرِّمُهَا عَلٰى نَفْسِهٖ وَ يُنْكِحُهَا مِنْ اَجْنَبِىٍّ وَ لَوْ عَقَلَ الْجَاهِلُ لَعَلِمَ اَنَّهٗ اَحَقُّ بِاُخْتِهٖ وَ بِنْتِهٖ مِنَ الْاَجْنَبِىِّ وَ مَا وَجْهُ ذَالِكَ اِلَّا اَنَّ صَاحِبَهُمْ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ الخ

'এরচে' বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, এক ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধির দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এমন আহাম্মকী করে যে, তার ঘরে এক সুন্দরী বোন বা কন্যা আছে আর তার নিজের স্ত্রী সেরকমের সুন্দরী নয়, অথচ

২১. ব্রিটানিকা ২খণ্ড, ৬৪৭ পৃ., মুদ্রণ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ, নিবন্ধ 'অ্যাটমবোম'।

এই সুন্দরী বোন বা কন্যাকে নিজের জন্য সে হারাম সাব্যস্ত করে অপর কোনও ব্যক্তির সংগে তার বিবাহ দিয়ে দেয়! এই মুর্খদের যদি আকল-বুদ্ধি থাকত, তবে বুঝতে পারত, অপর কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা সে নিজেই তার রূপসী কন্যা বা বোনকে বিবাহ করার অগ্রাধিকার রাখে। তাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণ কেবল এই যে, তাদের নবী উত্তম উত্তম বস্তু তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।'[২২]

এই ন্যাক্কারজনক কথার ঘৃণ্যতা ও কদর্যতার প্রতি আপনি যতখুশি অভিসম্পাত করুন, কিন্তু বুকের উপর হাত রেখে একটু চিন্তা করুন তো– যেই বুদ্ধি আল্লাহপ্রদত্ত ওহীর নির্দেশনা থেকে মুক্ত, তার কাছে এই যুক্তির খালেস বুদ্ধিপ্রসূত কোনও উত্তর আছে কি? এটা একটা বাস্তবতা যে, মুক্ত ও লিবারেল বুদ্ধির কাছে এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই আর তা নেই বলেই শতশত বছর পর আজ 'উবায়দুল্লাহ কাইরোয়ানির দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আজ কোনও কোনও পশ্চিমা দেশে বোনকে বিবাহ করার দাবি উঠতে শুরু করেছে।

সারকথা, প্রগতিবাদের দৃষ্টিতে যদি ভালো-মন্দের ফয়সালার ভার নিরেট বুদ্ধির উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে একদিকে তার আক্রমণ থেকে জীবনের কোনও মূল্যবোধ নিরাপদ থাকে না, অন্যদিকে প্রত্যেকের বুদ্ধি যেহেতু অন্যের থেকে আলাদা, সে কারণে মানুষ পরস্পরবিরোধী মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর এমন গোলকধাঁধায় আটকে পড়বে, যা থেকে মুক্তির কোনও পথ পরিলক্ষিত হয় না।

এর মূল কারণ– যে বুদ্ধি আল্লাহপ্রদত্ত ওহীর নির্দেশনা থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত, মানুষ তাকে মুক্তবুদ্ধি মনে করে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে বুদ্ধি পাশবিক চাহিদা ও জৈবিক কামনা-বাসনার দাস বনে যায় আর এটা দাসত্বের সর্বনিকৃষ্ট রূপ। এ কারণেই কুরআন মাজীদের পরিভাষায় এরূপ বুদ্ধিকে 'হাওয়া' (ইন্দ্রিয়পরবশতা) বলা হয়েছে।এ সম্পর্কেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ

অর্থ : 'সত্য যদি ওইসব লোকের 'হাওয়া' (খেয়াল-খুশি)-এর অনুগামী হত, তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত।'[২৩]

---

২২. আব্দুল কাহির বাগদাদী, আল-ফারক বাইনাল-ফিরাক ২৯৭ পৃ., মুদ্রণ- মিশর
২৩. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ৭১

'আইনের দর্শন' বিষয়ক আলোচনায় একদল দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের নীতি-দর্শনকে Cognitvist Theory বলা হয়। বিখ্যাত আইনবিদ ড. ফ্রয়েডম্যান 'লিগ্যাল থিওরি' নামক গ্রন্থে দর্শনটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন–

> "Reason is and ought only to be the slave of the passion and can never pretend to any other office than to serve and obey them."
>
> 'বুদ্ধি কেবল মানবীয় আবেগ ও প্রবৃত্তির দাস। তার তো প্রবৃত্তির দাসই হওয়া উচিত। বুদ্ধির কাজ এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, সে কেবল তার আবেগ-অনুভূতির দাসত্ব ও আনুগত্য করবে।'[২৪]

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণতি কী হতে পারে, ড. ফ্রয়েডম্যান সে সম্পর্কে বলেন–

> "Every thing else but also words like 'good' 'bad' 'ought' 'worthy' are purely emotive and there cannot be such a thing as ethical or moral science."
>
> 'প্রতিটি জিনিস এমনকি ভালো-মন্দের ধারণা এবং অমুক কাজ হওয়া উচিত ও অমুক কাজ হওয়ার উপযুক্ত, এসবই সম্পূর্ণরূপে আবেগপ্রসূত কথা। জগতে 'নীতিশাস্ত্র' বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।'[২৫]

এ দৃষ্টিভঙ্গী আইনদর্শনের ভিত্তি হওয়ার জন্য যতই ভ্রান্ত ও মন্দ হোক না কেন, এটা এক ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধি-বিবেকের বড়ই বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ। সত্যিকথা হল, সেক্যুলার বুদ্ধির অনুসরণ করার অপরিহার্য পরিণাম এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না যে, জগতে আখলাক ও নৈতিকতা নামের কোনও জিনিসের অস্তিত্ব থাকবে না এবং মানুষের কথা ও কাজের উপর তার জৈবিক চাহিদা ছাড়া অন্যকিছুর কর্তৃত্ব চলবে না। সেক্যুলার বুদ্ধি ও নীতি-নৈতিকতা কিছুতেই সহাবস্থান করতে পারে না। কেননা প্রগতিবাদের ধারায় এমন একটা পর্যায় এসে যায়, যখন মানুষের অন্তর একটা কাজকে মন্দজ্ঞান করে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা এ কারণে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে যায় যে, প্রগতিবাদ ও সেক্যুলার বুদ্ধির কাছে তা প্রত্যাখ্যান করার কোনও দলীল থাকে না। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ আজ এই করুণ অসহায়ত্বের হাতে বিপর্যস্ত।

---

২৪. লিগ্যাল থিওরি ৩৬ পৃ.
২৫. প্রাগুক্ত ৩৬-৩৭ পৃ.

বছর কয়েক আগে বৃটিশ পার্লামেন্ট যে সমকামের আইন পাশ করেছে, বৃটিশ চিন্তাবিদদের একটা বড় অংশ তা পসন্দ করছিল না, কিন্তু তারা তা এ কারণে মেনে নিতে বাধ্য ছিল যে, নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক প্রগতিবাদের ধর্মে যেসব মন্দ বিষয় ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায়, তাকে আইনি বৈধতাদান ছাড়া উপায় থাকে না। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য গঠিত 'উলফিণ্ডান কমিটি'-এর মতামত কতই না শিক্ষাদায়ী। তারা বলেছিল–

> "Unless a deliberate attempt is made by society acting through the agency of the law to equate this fear of crime with that of sin, there must remain a realm of private morality and immorality which in brief and crude terms, not the laws business."
>
> 'আইনের প্রভাবাধীন চলা সমাজের পক্ষ হতে যতক্ষণ পর্যন্ত সুচিন্তিতভাবে চেষ্টা চালানো না হবে, যাতে করে অপরাধভীতি গুনাহের সমপর্যায়ে বিবেচিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনৈতিকতার ধারণা আধিপত্য বিস্তার করেই থাকবে, যা সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণ আইনের আওতাবহির্ভূত।'[২৬]

বাস্তবসত্য হল, ভালো-মন্দ নিরূপণের যাবতীয় সিদ্ধান্ত যদি নিরেট বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করা হয়, তবে মানুষের কাছে এমন কোনও মানদণ্ড থাকে না, যার উপর ভিত্তি করে কোনও নতুন কথাকে বাধা দেওয়া যেতে পারে; বরং সে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব নৈতিক মূল্যবোধ প্রগতিবাদের সয়লাবে ভেসে যেতে বাধ্য। আজ আইনবিদগণ এ বিষয়ে বড় পেরেশান যে, প্রগতিবাদের সর্বগ্রাসী থাবার সামনে এমন কী পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, যদ্দরা অন্তত পক্ষে উন্নত কিছু মানবিক গুণ সংরক্ষিত ও অক্ষত থাকতে পারে। সুতরাং জনৈক মার্কিন জজ জাস্টিস কার্ডুজো (Carduzo)লেখেন–

> "আজ আইনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হল এমন এক আইনদর্শন তৈরি করা, যা পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের বিপ্রতীপ ও সাংঘর্ষিক চাহিদার মাঝখানে সমন্বয়সাধন করতে পারে।"[২৭]

---

২৬. প্রাগুক্ত

[২৭]. প্রাগুক্ত

কিন্তু সত্যিকথা হল, এটা কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যাবতীয় অনিষ্টের উদ্ভব হয়েছেই এখান থেকে যে, আল্লাহপ্রদত্ত ওহীর কাজ নিরেট বুদ্ধির উপর সমর্পণ করে এক দুর্বহ ভার তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, কোনও আইন সম্পর্কে এ কথা বলা যে, তা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়, কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানববুদ্ধি এমন কোনও দলীল পেশ করতে সক্ষম নয়। আজ একদল লোক একটা আইনকে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী অপরিবর্তনীয় সাব্যস্ত করছে, কিন্তু আগামীকাল অন্যলোক এসে চিন্তা করবে– এটা স্থায়ী আইন হওয়ার উপযুক্তই ছিল না, ফলে তারা সেটিকে পরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করে দেবে।

সুতরাং এ বিষয়টির কোনও সমাধান যদি থেকে থাকে, তবে তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, মানুষ নিজ বুদ্ধিকে জৈবিক চাহিদার দাস না বানিয়ে সেই সত্তার গোলাম বানাবে, যিনি তাকেসহ সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেহেতু জগতে ঘটিতব্য সর্বপ্রকার পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত, তাই কোন্ আইন পরিবর্তনীয় এবং কোন্‌টি পরিবর্তনীয় নয় তা কেবল তিনিই বলতে পারেন, অন্য কেউ নয়। আইনের মূলনীতি বিষয়ক বিখ্যাত লেখক জর্জ পেটন বিলকুল সত্য বলেছেন যে–

> "What interests should the real legal system protect? This is a question of values, in which legal philosophy plays its part... But however much we desire the help of philosophy, it is difficult to obtain. No agreed scale of values has ever been reached indeed, it is only in religion that we can find a basis, and the truths of religion must be accepted by faith or intuiton and not purely as the result of logical argument."
>
> 'আইনের শাসনাধীন আদর্শ সমাজের কোন্ কোন্ স্বার্থ সংরক্ষণ করা উচিত? এটি মূল্যবোধ সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন, যে ব্যাপারে আইনদর্শন কোনও ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা দর্শনের কাছে যতই সাহায্য চাই, প্রশ্নের উত্তর ততই জটিল আকার ধারণ করে, কেননা

> মূল্যবোধ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত অবিসংবাদিত কোনও মানদণ্ড জানা যায়নি। বাস্তবতা হল, কেবল ধর্মই এমন এক জিনিস, যার ভেতর আমরা কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই। অবশ্য ধর্মীয় বিষয়াবলীকেও কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই গ্রহণ করতে হবে, নিরেট যুক্তি-প্রমাণের আলোকে নয়।'[২৮]

সারকথা, যুগের যে-কোনও নতুনত্ব সম্পর্কে ভালো-মন্দের মীমাংসাদানে সেক্যুলার বুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এ মাসআলা সমাধানের জন্য একটামাত্র পথই খোলা আছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের নিদর্শনা গ্রহণ করা। মানবতার মুক্তির জন্য এছাড়া কোনও গত্যান্তর নেই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ۝

অর্থ : 'সুতরাং (বল তো,) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সে কি তাদের মতো হতে পারে, যাদের দুষ্কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে?'[২৯]

সুতরাং বিষয়টার একমাত্র সমাধান হল, যুগের প্রতিটি নতুন পথ ও পন্থা এবং প্রতিটি রসম-রেওয়াজকে তার বাহ্যিক চাকচিক্যের ভিত্তিতে নয়; বরং তা পরখ করতে হবে এর ভিত্তিতে যে, তা 'প্রতিপালকের দেখানো পথ' মোতাবেক কি না। যদি সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে কোনও হুকুম থেকে থাকে, তবে দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নিতে হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

অর্থ : 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন, তখন কোনও মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনও এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।'[৩০]

---

২৮. Paton, Jurisprudence, P. 121

২৯. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৪

৩০. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬

আরও ইরশাদ–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

অর্থ : 'না (হে নবী), তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনওরূপ কুণ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে।'[৩১]

আল্লাহ তা'আলা নিজ কিতাব বা নিজ রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে যেসকল বিধান দিয়েছেন, তা এমনসব বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট, যা নিরেট বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করা হলে তা মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারত। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ভূত-ভবিষ্যতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, তাই প্রতিটি যুগে তাঁর দেওয়া বিধানই অবশ্যপালনীয় হতে পারে। সুতরাং ইরশাদ–

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۠

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাদের কাছে (তাঁর বিধানাবলী) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।'[৩২]

এর দ্বারা আধুনিকতা সম্পর্কে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা এই যে, যেহেতু আল্লাহপ্রদত্ত ওহী ও তাঁর দেওয়া শরী'আতের প্রয়োজন এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, সে ব্যাপারে নিরেট বুদ্ধির মাধ্যমে সঠিক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব ছিল না, সেহেতু হিদায়াতের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত বিধানাবলীর হুবহু অনুসরণ জরুরি। যুগের প্রচলন হিসেবে তাতে কোনও রকমের কাটাছেঁড়া করার অবকাশ নেই। এ কর্মপন্থা মোটেই বৈধ নয় যে, প্রথমত যমানার কোনও প্রচলকে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা সঠিক ও উত্তম সাব্যস্ত করা হবে, অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহকে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক ফয়সালার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তা কাটাছেঁড়া করা হবে বা দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যাদান করা হবে। কেননা এ কর্মপন্থাকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের অনুসরণ বলা যায় না

---

৩১. সূরা নিসা, আয়াত ৬৫
৩২. সূরা নিসা, আয়াত ১৭৬

কিছুতেই। অনুসরণের বদলে এটা কেবলই রদবদল ও সংযোজন-বিয়োজন, যার এখতিয়ার কোনও মানুষের নেই। কেননা এর ফলে ঐশী বিধান নাযিলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বস্তুত ইত্তিবা' ও অনুসরণ বলা হয় কোনও রকমের রদবদল ছাড়া এই বিশ্বাসের সাথে ঐশী বিধান মেনে চলাকে যে, কেবল তা-ই কামিল ও মুকাম্মাল– পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর। এ ব্যাপারে ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা হবে এ পর্যায়ের যে, সারা জাহানের মানুষ মিলেও যদি সে বিধান থেকে তাকে দূরে সরাতে চায়,কখনওই তাতে সক্ষম হবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۱۵﴾ وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِی الْاَرْضِ یُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ یَّضِلُّ عَنْ سَبِیْلِهٖ ۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ ﴿۱۱۷﴾

অর্থ : 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার কোনও পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দার পিছনে চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো ধারণা ও অনুমান ছাড়া অন্যকিছুর অনুগমন করে না এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাই বলে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালো করে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই ভালো করে জানেন কারা সৎপথে আছে।'[৩৩]

অন্যত্র ইরশাদ–

وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ اٰیَاتُنَا بَیِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَیْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِیْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰۤی اِلَیَّ ۚ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۵﴾

অর্থ : 'যারা (আখিরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে– এটা নয়, অন্য কোনও কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতে পরিবর্তন আনো। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, আমার এই অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনও পরিবর্তন আনব। আমি তো অন্যকিছুর নয়, কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়।

---

৩৩. সূরা আন'আম, আয়াত ১১৫-১১৭

আমি যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করে বসি, তবে আমার এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় আছে।'[৩৪]

এ জাতীয় অনুসরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় যুগ ও কালের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সে কারণে নানা কঠিন পরিস্থিতিরও স্বীকার হতে হয়। কিন্তু যারা সেই কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলা করে আপন কর্তব্যে অবিচল থাকে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আল্লাহর পক্ষ হতে তারা হিদায়াত পেয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

অর্থ : 'যারা আমার পথে কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করে, আমি তাদেরকে নিজ পথের হিদায়াত দান করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সংগে আছেন।'[৩৫]

সুতরাং শরী'আতের যে বিধানে বাহ্যিক কোনও লাভ দৃষ্টিগোচর হয় তা গ্রহণ করা আর যাতে কিছুটা কষ্ট-ক্লেশ ও প্রতিবন্ধকতা থাকে তা এড়িয়ে যাওয়া বা দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গা বাঁচানোর নীতি আবলম্বন করা কোনওক্রমেই বৈধ নয়। কুরআন মাজীদের ইরশাদ মোতাবেক এ নীতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের পক্ষেই ক্ষতিকর। ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

অর্থ :'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর 'ইবাদত করে একপ্রান্ত থেকে। যদি (দুনিয়ায়) তার কোনও কল্যাণ লাভ হয়, তবে সে তাতে আশ্বস্ত হয়ে যায় আর যদি সে কোনও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে মুখ ফিরিয়ে (কুফ্রীর দিকে) চলে যায়। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াও হারায়, এবং আখিরাতও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।'[৩৬]

মোটকথা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার ভালো-মন্দ যাচাই করার মানদণ্ড কেবলই শরী'আত। আল্লাহ্প্রদত্ত শরী'আত সে ব্যাপারে কী বিধান দেয় তাই লক্ষণীয়। যদি তা শরী'আতের বিধান মোতাবেক হয়, তবে গ্রহণ

---

৩৪. সূরা ইউনুস, আয়াত ১৫

৩৫. সূরা 'আনকাবূত, আয়াত ৬৯

৩৬. সূরা হজ্জ, আয়াত ২২

করা হবে, যদি শরীআতের বিধান মোতাবেক না হয়; বরং তার পরিপন্থী হয় তবে শরী'আতের দূর-দূরান্ত ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে সেই নতুনকেই পরিহার করতে হবে, তাতে যুগ ও সমাজ যাই বলুক না কেন, মানুষ যতই নিন্দা করুক না কেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যত তীরই বর্ষিত হোক না কেন। একজন মুসলিমের কাছে এসব ব্যঙ্গ, নিন্দা ও আপত্তির জবাব কেবল এই-

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

অর্থ: 'আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা (-এর আচরণ) করেন এবং তাদেরকে ঢিল দেন, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে থাকে।'[৩৭]

অবশ্য এ নীতি জীবনের সেইসব বিষয়ে প্রযোজ্য, কুরআন ও সুন্নাহ যাকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব অথবা হারাম ও মাকরূহ সাব্যস্ত করেছে। এসকল বিধান প্রতিটি যুগেই অপরিবর্তনীয়। এতে রদবদলের কোনও সুযোগ নেই। তবে যেসকল বিষয় মুবাহ ও বৈধ বিষয়ের তালিকায় আসে, তাতে মানুষকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সময়কালের উপযোগিতা বিবেচনায় তারা তা গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শরী'আত যেসকল বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা হারাম ও মাকরূহ সাব্যস্ত করেছে এবং যা চির অপরিবর্তনীয়, লক্ষ করলে দেখা যায় তার পরিমাণ খুবই কম। পক্ষান্তরে যেসকল বিষয় মুবাহের তালিকাভুক্ত, তার পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। তা গ্রহণ ও বর্জনের ফয়সালা মানুষের এখতিয়ারাধীন এবং যুগ-কাল অনুযায়ী তার মধ্যে রদবদলের অবকাশ আছে।

সুতরাং ইসলাম আধুনিকতাপ্রীতির যে ক্ষেত্র ও পরিমণ্ডল দান করেছে, তা অতি বিস্তৃত। এতে মানুষ তার দৌড়ঝাঁপের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে, সে তার প্রতিভা খাটিয়ে জ্ঞান-গবেষণা এবং সায়েন্স ও টেকনোলজির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে আর এভাবে সে তার জ্ঞান-বিদ্যার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষের পথ সুগম করতে পারে।

আজ মুসলিমবিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হল, আধুনিকতার উপরিউক্ত সীমারেখা উপলব্ধি করা এবং ইসলাম আধুনিকতার যে প্রশস্ত পরিমণ্ডল মানুষকে দান করেছে, তা ছেড়ে দিয়ে সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনুপ্রবেশ না করা, শরী'আত যার বিধানাবলী নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছে,

---

৩৭. সূরাবাকারা, আয়াত ১৫

যে বিধানে রদবদলের কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু আফসোস, আজ মুসলিমবিশ্বের কর্মপন্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেই পরিমণ্ডলে তার নতুন চিন্তা-ভাবনায় ব্রতী হয়ে গবেষণা, উদ্ভাবনা ও নবআবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রত হওয়া দরকার ছিল, সেখানে তো সে চরম উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করছে, ফলে সে ক্ষেত্রে তার অর্জন ও অবদান প্রায় শূন্যের কোঠায়। অন্যদিকে যেসকল শর'ঈ বিধান চির অপরিবর্তনীয়, সে তার প্রগতিবাদী যাবতীয় প্রচেষ্টা সেইদিকে নিবদ্ধ রেখেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আধুনিককাল ভালো যা-কিছু মানবতাকে দান করেছে, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে আর যেসব মন্দের উদ্ভব সে ঘটিয়েছে, অত্যন্ত দ্রুতবেগে তা আমাদের সমাজে সংক্রমিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, যাতে আমরা এই আধুনিককালে নিজ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করত যথাযথভাবে তা পালনে যত্নবান থাকতে পারি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাম আওর জিদ্দাত পাসান্দী ৭-১৯ পৃ.

ইসলাম ও শিল্পবিপ্লব

এমনিতে তো জীবন সদা গতিশীল, সতত সচল। প্রতিটি নতুন যুগ সংগে নিয়ে আসে নতুন অবস্থা ও নতুন জিজ্ঞাসা। কিন্তু বিশেষভাবে যন্ত্র আবিষ্কারের পর গোটা বিশ্বে যে মহাপরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার স্পর্শ লেগেছে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবনের কোনও দিকই তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এ মহাবিপ্লব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণা-অনুসন্ধানের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা জন্ম দিয়েছে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মূল শিক্ষামালার প্রতি দৃষ্টি বুলান, এই মহাবিপ্লবকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নেওয়ার মত কোনও যোগ্যতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। এর কারণ ওইসব ধর্মের শিক্ষার মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী নয়; বরং তা ছিল সম্পূর্ণই মানুষের মন-মস্তিষ্ক। সঙ্গত কারণেই সে শিক্ষায় মানবপ্রকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়নি এবং করা হয়নি যুগ ও কালের পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যত-সম্ভাবনার প্রাজ্ঞোচিত পর্যবেক্ষণ। এই ফলশ্রুতিতে সেসকল ধর্মের অধিকাংশ মৌলিক শিক্ষা আজ যন্ত্রের নিচে চাপা পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সেসব ধর্মের অনুসারীদের সামনে আজ কেবল দু'টি পথই খোলা আছে। তারা যদি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায়, তবে নিজ ধর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে আর যদি ধর্মই বেশি প্রিয় হয়, তবে চিন্তা-চেতনার আলো থেকে বিমুখ হয়ে অপরিহার্যভাবে ভাবতে হবে যে, তারা এই বিংশ শতাব্দির মানুষ নয়। অবশ্য সতর্ক কিছু মানুষ নিজেদের জন্য একটি মধ্যপন্থা খুঁজে বের করেছে। তারা অনেক সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে আপন আপন ধর্মে কাঁচি চালায় এবং যথেষ্ট কাটাছেঁড়া করে আধুনিকযুগে চলার উপযোগী বানিয়ে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অস্ত্রোপচারের পর সেই ধর্মকে নিজেদের আদি-আসল ধর্ম মনে করা নিজ মনকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা সত্যিকথা হল, এভাবে কাটাছেঁড়া করার ফলে তাদের আসল ধর্ম আপন

অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাদের কাছে সেই ধর্মের বাহ্যিক খোলস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভেতরে যা আছে, তা কেবলই এক মনগড়া নতুন ধর্মের আত্মাবিশেষ।

কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জগতে ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যার শিক্ষা সদা সজীব। যুগ ও কালের যতই পরিবর্তন ঘটুক, পরিবেশ-পরিমণ্ডলে যতই বদল আসুক, এ ধর্ম কখনও পুরোনো হয় না। অতীতের মত আজও এ ধর্ম সম্পূর্ণ তরতাজা। এ জগত যতদিন তার পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকবে, দ্বীনে ইসলাম ততদিন চিরনতুনই থেকে যাবে। এর কারণ সুস্পষ্ট। সকলেরই জানা এ ধর্মের মূলনীতি কোনও মানব-মস্তিষ্কের উদ্ভাবন নয়, যা কিনা ভবিষ্যত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। এর শিক্ষামালা ওহীর উৎসমূল থেকে উদ্ভূত। যেই সত্তা এ দ্বীনকে মানুষের জীবনব্যবস্থা বানিয়েছেন, তিনিই মানুষের এবং বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর স্রষ্টা। তিনি মানবপ্রকৃতির সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। তিনি তার প্রয়োজন ভালোভাবেই জানেন। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি বেশ জানেন কখন কোথায় কী ঘটার আছে।

এটা তাঁর কালামেরই অলৌকিকত্ব যে, ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি এ কালামে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সর্বশেষ নবী মানুষকে এ কালামের শিক্ষাদান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় যুগজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব এর ভেতর উপস্থিত। এ জগত লাখও বার পার্শ্বপরিবর্তন করুক, কখনও এর শিক্ষায় কিছুমাত্র পরিবর্তনের দরকার হবে না। ইসলামের মূলনীতি ও এর শিক্ষামালা প্রতিযুগে মানুষের পথনির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু আফসোস, মুসলিমবিশ্বের একটি মহল, যারা নব্যপন্থী ও প্রগতিবাদী নামে পরিচিত, এই সত্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা অন্যধর্মের দেখাদেখি ইসলামেও সংযোজন-বিয়োজন ও রদবদলের কাজ শুরু করে দিয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রতিটি ঠিক-বেঠিক প্রকাশকে ইসলামসম্মত প্রমাণ করাকে তারা নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করে। এই মহলটি তাদের প্রতিটি সংযোজন-বিয়োজন কাজের সপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দলীল এই দিয়ে থাকে যে, শিল্পবিপ্লবের পর গোটা বিশ্ব অনেক বদলে গেছে, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছে আমূল পরিবর্তন, এ কারণে ইসলামী বিধানাবলীকেও পরিবর্তন করা অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরয করতে চাই, ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবনের সর্বশাখায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা দু'প্রকার। কিছু পরিবর্তন

এমন, যা বর্তমান উন্নতির জন্য অপরিহার্য ছিল। সে পরিবর্তন ছাড়া সায়েন্স ও টেকনোলজির পক্ষে বর্তমান মানে উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না। এরই বদৌলতে জগত নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হয়েছে, বড় বড় শিল্প-কারখানা তৈরি হয়েছে, নির্মিত হয়েছে সেতু, তৈরি করা হয়েছে বড় বড় বাঁধ এবং মানবীয় জ্ঞান-বিদ্যায় ঘটেছে প্রভূত সমৃদ্ধি।

শিল্পবিপ্লবের এই দিক নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মুসলিমবিশ্বের উচিত এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া। ইসলাম এ পথে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তো করেইনি; বরং সে এই শক্তিসঞ্চয়কে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে।

কিন্তু একইসাথে কিছু পরিবর্তন এমনও ঘটেছে, যা শৈল্পিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য আদৌ প্রয়োজন ছিল না। পাশ্চাত্য সে পরিবর্তনকে অযথাই শিল্পবিপ্লবের কাঁধে চাপিয়েছে। সেই চাপানোর কুফল আজ তারা নিজেরাও উপলব্ধি করছে। আজ তারা সেজন্য আক্ষেপ করছে এবং চোখের পানি ফেলছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গান-বাদ্য ও নৃত্যকলা, সুদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়সমূহের তো শৈল্পিক উন্নতির সাথে দূরবর্তী কোনও সম্পর্ক ছিল না; বরং অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এসব জিনিস উন্নতির পথে কোনওরকম সাহায্য তো করেই না, উল্টো নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এসব পরিবর্তনই এমন জিনিস, মুসলিমবিশ্বের উচিত পূর্ণ সতর্কতার সাথে এর থেকে আত্মরক্ষা করা। মুসলিমবিশ্বেও শিল্পবিপ্লব অবশ্যই আসা দরকার। কিন্তু সে বিপ্লব হতে হবে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সকল অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কারণ সে অভিশাপ আজ পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

পরিতাপের বিষয় হল, আমাদের সংস্কারপন্থী আধুনিকমহলের কামনা– আমরা যেন পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবকে কোনওরকম রদবদল ছাড়া হুবহু গ্রহণ করে নেই। বস্তুত আমাদের সমাজে যন্ত্রের কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে, বরং তারও আগেই আমরা ওইসকল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গোমরাহীর ভেতর আকণ্ঠ ডুবে গেছি আর এ কারণেই ওই মহলটি সায়েন্স ও টেকনোলজির উন্নতিসাধন অপেক্ষা ইসলামকে কোনওক্রমে টেনে-কষে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানোর কাজে নিজেদের শক্তি-ক্ষমতা বেশি ব্যয় করছে। 'ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলাম'-এর মুখপত্র মাসিক 'ফিক্‌র ওয়া নাজ্‌র' তার এ নীতির সপক্ষে দলীল দিতে গিয়ে লেখে–

> "চতুর্থ-পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানে সামগ্রিক জীবন পুরোপুরি বদলে যাবে। এখানে যান্ত্রিক যুগের জয়-জয়কার হবে, ফলে বদলে যাবে পারিবারিক জীবন, পরিবর্তন আসবে অর্থনীতি ও সমাজধারায়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে। বলা বাহুল্য, এর ফলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চিন্তা-চেতনাও প্রভাবিত হবে এবং মানুষ নতুন ধারায় ভাবতে শুরু করবে।"[৩৮]

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় তারা মুসলিমবিশ্বের শিল্পবিপ্লব ও পাশ্চাত্য শিল্পবিপ্লবের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে চান না। আমাদের বক্তব্য এটাই যে, আমাদের নিকট যন্ত্রের প্রচলন দোষের কিছু নয়, কিন্তু সে কারণে পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি, সমাজ-সভ্যতা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং মানুষের চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তনের নিশানদিহি আপনারা করছেন, সেগুলোকে আমরা মুসলিমবিশ্বের পক্ষে ধ্বংসাত্মক মনে করি। এসব পরিবর্তন ইসলামী মেজাযের সংগে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। পশ্চিমা শিল্পবিপ্লবের পাঠই আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, আমরা যদি যন্ত্রের কার্যক্রম সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই এসব পরিবর্তন এড়িয়ে চলতে হবে। মরহুম ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীর অধ্যয়নের পর বলেছিলেন–

افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیہ پوش
ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت
احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

'ফিরিঙ্গীজাতি আজ যন্ত্রের ধোঁয়ায় কৃষ্ণবেশী
যন্ত্রের আধিপত্যে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে
মেশিনারি মানুষের মানবিক মূল্যবোধ করে চূর্ণ।'

এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌছা ঠিক হবে না যে, যন্ত্র ও মেশিনারির প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ ছিল এবং তিনি প্রযুক্তিগত উন্নতির বিরোধী ছিলেন; বরং তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, পাশ্চাত্য যন্ত্রের সাথে অহেতুক যে আপদ নিজের মাথায় চাপিয়েছে, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও ঘৃণার উপযুক্ত। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় আমাদের জন্য সঠিক কর্মপন্থা হল, শিল্পবিপ্লবের উদ্দীপনায় আমরা

---

৩৮. ফিক্‌র ওয়া নাজ্‌র, সংখ্যা ১২, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৩৩

অন্ধের মত সেই পথে চলব না, যে পথ পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে; বরং পূর্ণ বিচক্ষণতা ও সচেতনতার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এভাবে গ্রহণ করব, যাতে তা দ্বারা আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শিল্পবিপ্লব নিজ চমকের ভেতর দিয়ে নতুন যে জিজ্ঞাসা নিয়ে আসবে, ইসলামে তার এমন সমাধান উপস্থিত রয়েছে, যা ইউরোপীয় ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র ও সুরক্ষিত। ইসলাম বিধি-বিধান উদ্ভাবনের জন্য যে নীতিমালা স্থির করেছে, সে নীতিমালার আলোকে ইসলামের গবেষকগণকে সেসব জিজ্ঞাসার সমাধান তালাশ করতে হবে।

তা না করে যদি ইসলামকে টেনে-কষে পাশ্চাত্য-সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় আর সে লক্ষে খোদ ইসলামের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করা হয় এবং যেনতেনভাবে তাকে যুগচাহিদার অনুকূল বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে আপনারাই বলুন তাতে ইসলামের কী কৃতিত্ব হল? এভাবে তো ভেঙেচুরে যে-কোনও ধর্মকেই যুগচাহিদা মোতাবেক বানিয়ে দেওয়া যায়। অনেক ধর্মের কারিগরেরা তা বানিয়েও ফেলেছে। আমাদের দৃষ্টিতে এভাবে কোনও ধর্মকে যুগচাহিদা মোতাবেক বানিয়ে দেওয়াটা সেই কারিগরদের কৃতিত্ব হলেও হতে পারে, ধর্মের কোনও কৃতিত্ব তাতে আদৌ নেই। আমরা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে মনে করি ইসলামকে অন্যান্য মাযহাবের সাথে তুলনা করে একই রকমের আচরণ এর সাথে করার কোনও সুযোগ নেই। এরকম যে-কোনও প্রচেষ্টা দ্বীনবিকৃতির নামান্তর হবে এবং সে কারণে তা হবে চরম নিন্দিত ও গর্হিত কাজ।

নিঃসন্দেহে ইসলামে এমন অনেক স্থিতিস্থাপক বিধান আছে, যা যুগ ও কালের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনযোগ্য। সেই পরিবর্তনের কিছু মূলনীতিও আছে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ইসলামের প্রতিটি বিধানেই তা প্রযোজ্য হবে। মূলত কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা যেসকল বিধান সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে, তা চির অপরিবর্তনীয়। কোনও কালেই তাতে কোনওরকম রদবদলের সুযোগ নেই। হাঁ যেসব বিষয়ের উপর যুগ ও পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে পারে, সে ব্যাপারে খোদ কুরআন ও সুন্নাহ সুনির্দিষ্ট কোনও বিধান না দিয়ে কিছু মূলনীতি বলে দিয়েছে, সেই মূলনীতির আলোকে সবযুগেই বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা যায়। আমরাও তা করতে পারি।

কুরআন ও সুন্নাহ'র লক্ষ কখনও এরকম নয় যে, প্রত্যেক যুগে মুসলিমগণ নিজেদের অবস্থা মোতাবেক পূর্ববর্তীদের সমষ্টিগত ফয়সালার

বিপরীতে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনও বিধান তৈরি করবে এবং তাকে ইসলামী বিধান বলে ঘোষণা করবে। ইসলামের লক্ষ যদি তাই হত, তবে কুরআন ও সুন্নাহ'র ভেতর জীবনের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে এত বিস্তারিত বিধান দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? ব্যস, কেবল এতটুকুই বলে দেওয়া হত যে, তোমরা প্রত্যেক যুগে নিজেদের পরিবেশ-পরিমণ্ডল অনুযায়ী বিধি-বিধান তৈরি করে নিও। কিন্তু এমনটা তো বলা হয়নি; বরং এর বিপরীতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র মাধ্যমে জীবনের সব শাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এসকল বিধান কিয়ামতকাল পর্যন্ত চলবে, কোনও কালেই এতে কোনওরকম পরিবর্তন আনা যাবে না। সুতরাং যুগবদলের বাহানায় যারা রদবদলের কাজ করছে, তাদের এ কাজ কিছুতেই দ্বীনের লক্ষবস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়,তাই তাদের এ কাজের কোনও বৈধতা নেই। কুরআন-সুন্নাহে প্রদত্ত বিধান কিয়ামতকাল পর্যন্ত অবশ্যপালনীয় আর এরই মধ্যে মুসলিম জাতির বৈষয়িক উন্নতির রহস্যও নিহিত।

হাঁ, কুরআন-সুন্নাহ যেসব বিধান যুগ ও কালের হাতে সমর্পণ করেছে, তা অবশ্যই পরিবর্তনযোগ্য। প্রত্যেক যুগে আপন আপন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তাতে রদবদলের অবকাশ আছে এবং তা করাও হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সংস্কারপন্থী ও প্রগতিবাদী মহলটি যুগবদলের বাহানায় কেবল ওইসকল বিধানকেই বদলাতে চাচ্ছে, যা কুরআন-সুন্নাহে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং যা চৌদ্দশ' বছর যাবত স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। এমনকি তারা অনেক আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যেও এমন পরিবর্তন আনতে চায়, যা কুরআন-সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী এবং আজ পর্যন্ত উম্মতের উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যক্তি তা মেনে নেয়নি।

তাদের এ তারমীম ও সংস্কারকার্য যদি বাস্তবসম্মত হয়, তবে তো এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, যে দ্বীনের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস পর্যন্ত চৌদ্দশ' বছরের দীর্ঘ সময়ে কেউ সঠিকভাবে বুঝতে পারল না, সে দ্বীন কি এর উপযুক্ত যে, কোনও বিবেকবান লোক সত্য মনে করে সে দ্বীনের অনুসরণ করবে?

তার উপর মজার ব্যাপার হল, আমাদের সংস্কারবাদী মহল কেবল সেই ক্ষেত্রেই যুগের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে, যেখানে সংস্কারকার্য দ্বারা কোনও বৈধতা উদ্ভাবন করা বা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সাথে ইসলামকে খাপ

খাওয়ানো লক্ষবস্তু থাকে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের ফলাফল কোনও কষ্টকর কাজের আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে যুগ পরিবর্তনের কোনও চিন্তাই তাদের মনে জাগে না। এর একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল, সংস্কারবাদীদের পক্ষ থেকে এ কথা অনেকবারই শোনা গেছে যে, যুগ বদলে গেছে, অতএব সুদ হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা কোনও সংস্কারবাদীর কণ্ঠে একথা শুনতে পাইনি যে, যেহেতু যুগ বদলে গেছে, তাই এখন আর নামায কসর করার অনুমতি থাকা উচিত নয়। এ অনুমতি কেবল সেই সময়ের জন্যই ছিল, যখন সফরে অত্যধিক কষ্ট-ক্লেশ হত। এখন আর সেই কষ্ট নেই, এখন উড়োজাহাজে বা এয়ারকন্ডিশন গাড়িতে খুব আরামে সফর করা যায়, তাই এখন আর নামায কসর করার বা রোযা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি থাকতে পারে না। কর্মপন্থার এ প্রভেদ দ্বারা আপনি আধুনিকতাপ্রসূত বৈধতাপ্রিয় মানসিকতা সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে পারেন। বস্তুত এ মানসিকতার যাবতীয় দলীল-প্রমাণ নিজেদের পক্ষ হতে পূর্ব হতেই প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যথারীতি তৈরি করে নেওয়া হয়। তাদের লক্ষবস্তু যেহেতু পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করা, তাই যে ক্ষেত্রে তাদের এ লক্ষ অর্জিত হয়, সেখানে যে-কোনও রাস্তাঘাটের কথাও দলীল বনে যায়। আবার যে ক্ষেত্রে সেই দলীলই নিজেদের উদ্দেশ্য-পরিপন্থী মনে হয়, তখন আর সেদিকে ফিরেও তাকায় না। আহা, আমাদের সংস্কারবাদী মহলটি যদি এসব কথা ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখত এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসমূহ ইসলামকে বিকৃত করার পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে ব্যয় হত!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাম আওর জিদ্দাত পাসান্দী ২১-২৬ পৃ.

ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা

গেল কিস্তির আলোচনায় আমরা তথাকথিত প্রগতিবাদী চিন্তাধারার একটা দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। আর তা হল, এ চিন্তাধারা পাশ্চাত্যের জীবনদৃষ্টিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এর মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, দলীল-প্রমাণ সবই ইউরোপ থেকে ধার করা। এ চিন্তাধারার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে, তারা সবকিছু দেখে পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে এবং চিন্তাও করে পশ্চিমের মন-মস্তিষ্ক দিয়ে। আর এ কারণে সামগ্রিক মুসলিম-মানস তাদের চিন্তা ও গবেষণার ফলাফলকে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তা করা সম্ভব নয়।

এবারের আলোচনায় আমরা তাদের চিন্তাধারা ও প্রমাণপদ্ধতি সম্পর্কে এমন কিছু আরয করতে চাচ্ছি, আমাদের বিষয়বস্তুর পক্ষে যা বুনিয়াদী গুরুত্বের অধিকারী। সংক্ষেপে আমরা ওইসকল কারণ চিহ্নিত করব, যদ্দরুন আমাদের ওই আধুনিকপন্থী বন্ধুদের মেহনত তাহকীক (গবেষণা) না হয়ে তাহরীফ (অপব্যাখ্যা ও বিকৃতসাধন) হয়ে যাচ্ছে এবং যদ্দরুন তাদের চিন্তা-ফিকিরের প্রাচীর ক্রমান্বয়ে বেঁকে যাচ্ছে।

তাহকীক ও মুহাক্কিক কাকে বলে

একজন সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বোঝে যে, 'তাহকীক'-এর অর্থ সত্যসন্ধান এবং মুহাক্কিক যেন একজন জজ, যার পদমর্যাদাগত দায়িত্ব হল আগে থেকেই কোনও সিদ্ধান্ত মনে স্থির না করে, বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনার খুঁটিনাটি সবকিছু যাচাই-বাছাই করে দেখবে, সম্ভাব্য সকল দিক সম্পর্কে বিশ্বস্ততার সাথে চিন্তা-ভাবনা করবে, অতঃপর যে পক্ষের দলীল-প্রমাণ বেশি ওজনী সাব্যস্ত হবে, তার অনুকূলে রায় প্রদান করবে। পক্ষান্তরে জজ যদি আগে থেকেই মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করে রাখে, তারপর ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ সন্ধান করে, তবে তাকে কিছুতেই সত্যসন্ধানী এবং তার প্রচেষ্টাকে কিছুতেই তাহকীক বলা যাবে না আর সে যে রায় দেবে তাও হবে না নিরপেক্ষ ও ইনসাফসম্মত।

অন্যভাবে বলা যায়, একজন মুহাক্কিকের কাজ আগে থেকে কোনও মত স্থির করে তার সপক্ষে দলীল-প্রমাণ খোঁজা নয়; বরং তার কাজ হল দলীল-প্রমাণ দেখে মতস্থির করা। সে দলীল-প্রমাণকে নিজ সিদ্ধান্তের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করবে না; দলীল-প্রমাণই তাকে টেনে নিয়ে যাবে প্রকৃত সিদ্ধান্তের দিকে।

আধুনিকতাপন্থীদের নীতি

কিন্তু আমাদের আধুনিকতাপন্থীদের কর্মপন্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সিদ্ধান্তকে দলীল-প্রমাণের অনুগামী না বানিয়ে দলীল-প্রমাণকে সিদ্ধান্তের অনুগামী বানানোর চেষ্টা করে। এটা তাদের কেবল কর্মপন্থাই নয়; বরং তারা গবেষণার এই পন্থাকেই সঠিক মনে করে এবং এরই সপক্ষে প্রচারণা চালায়। আপনি তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ জাতীয় বাক্য বার বারই শুনে থাকবেন যে,

"আমরা কুরআন-সুন্নাহ'র এমন ব্যাখ্যাদান করতে চাই,
যাতে তা এ যুগের চাহিদা মোতাবেক হয়।"

এ বাক্যের সহজ-সরল অর্থ এটাই যে, বর্তমান যুগে কুরআন-সুন্নাহ'র আসল বিধান কী তা সন্ধান করতে যাব না; বরং প্রথমে নিজেরাই স্থির করে নেব যে, এ যুগের চাহিদা কী? তারপর কুরআন-সুন্নাহ'র মধ্যে তার সপক্ষে দলীল খুঁজব। তা না পাওয়া গেলে আয়াত ও হাদীছের এমন ব্যাখ্যা (Interpretation) দান করব, যাতে তা সমকালীন চাহিদা মোতাবেক হয়ে যায়।

স্পষ্টই বুঝতে পারছেন তারা কী বলতে চায়। কেমন খোলামেলা স্বীকারোক্তি যে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তকে কুরআন-সুন্নাহ'র অনুগামী ও শরী'আতের ভাষ্য মোতাবেক না করে বরং কুরআন-সুন্নাহকেই আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গড়ে তুলতে চাই। আমাদের তাহকীকের উদ্দেশ্য কুরআন-সুন্নাহ'র দলীলের আলোকে কোনও মতস্থির করা নয়; বরং যুগ-চাহিদা সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন-হাদীছের দলীল সন্ধান করা এবং টেনে-কষে তাকে আমাদের চিন্তাধারার সাথে খাপ খাওয়ানো।

বস্তুত তাদের এ জাতীয় কাজকেই তাহরীফে মা'নাবী বা 'অর্থগত বিকৃতিসাধন' বলে। এর দ্বারা কুরআনী আয়াত ও হাদীছের ভাব-মর্মের বিকৃতি ঘটানো হয়। জগতের কোনও সদ্বিবেক ও যুক্তিবাদী মানুষ তাদের এ কাজকে সমর্থন করতে পারে না। কেননা জ্ঞান-গবেষণার জগতে যদি এভাবে উল্টো স্রোত বইতে শুরু করে, তবে সত্য ও সততাকে রক্ষা করার কোনও

উপায় থাকবে না। আর সে ক্ষেত্রে তো দুনিয়ার এমন কোনও দাবি নেই, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, সে দাবি যত দুর্বলই হোক না কেন। তখন জগতের কোনও কথাই দলীলবিহীন থাকবে না। ইংরেজিতে প্রবচন আছে– 'প্রতিটি বিষয় প্রতিটি বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ করা যায়'। আপনি যখন একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, আমি অমুক বিষয়টা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করব, আর এটাও স্থির করে নিলেন যে, এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কুরআন-হাদীছের নতুন ব্যাখ্যা দান করবেন, তখন এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে বিষয়ের সমর্থনে যত দুর্বল ও দূরের কথাই আপনার নজরে আসবে, আপনি সেটাকেই দলীল হিসেবে পেশ করবেন। তার বিপরীতে যত শক্তিশালী দলীলই সামনে আসুক, তা প্রত্যাখ্যান করতে আপনার একটুও দ্বিধাবোধ হবে না। এ নীতি গ্রহণ করলে এমন কোন্ বিষয়টা বাকি থাকে, যাকে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না?

খৃষ্টান মিশনারিদের নীতিরই ওপিঠ

আপনার হয়ত জানা আছে, খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ (মিশনারি) মুসলিম-বিশ্বে তাদের ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ঠিক এ নীতিই অবলম্বন করেছে। তারা সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাদের সামনে কুরআন-হাদীছ দ্বারাই নিজেদের 'আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করে থাকে। যেমন তারা বলে, দেখ কুরআনেও হযরত 'ঈসাকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। তার মানে তিনি আল্লাহর 'কালাম গুণ' ছিলেন। আর ইওহোন্নার ইনজীলেও এ কথাই বলা হয়েছে। কুরআনেই তাকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় হযরত 'ঈসা আল্লাহর রূহ ও আত্মা এবং শরীর ও আত্মার মধ্যে যেমন সম্পর্ক, আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কও সেরকমই। পৌলও তো সে কথাই বলেন। কুরআনই তো বলছে, 'আমি রূহুল-কুদ্স দ্বারা 'ঈসাকে শক্তিশালী করেছিলাম'। এর দ্বারা সেই ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে, যা মথির ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, 'রূহুল-কুদ্স' হযরত 'ঈসার উপর কবুতর আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ব্যস 'ঈশ্বর' (পিতা), 'কালাম' (পুত্র) ও 'রূহুল-কুদ্স' (পাকরূহ)– ত্রিত্ববাদের এই তিনও সত্তা কুরআন দ্বারাই প্রমাণ হয়ে গেল। আর এভাবে যে কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ত্রিত্ববাদকে রদ করেছে, নতুন ব্যাখ্যার বদৌলতে সেই কুরআন দ্বারাই মাথামুণ্ডুহীন এ আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

বাকি থাকল কুরআন মাজীদের সেই আয়াত, যা ত্রিত্ববাদকে সরাসরি রদ করেছে, তো সেটা কোনও সমস্যা নয়। কেননা ত্রিত্ববাদকে যখন কুরআন দ্বারা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে, এর ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন কিছু নয়। বলে দেব এ আয়াতে 'প্রকৃত ত্রিত্ববাদ'-কে অস্বীকার করা হয়েছে। খৃষ্টসম্প্রদায় নিজেরাও বলে থাকে, মৌলিকভাবে ঈশ্বর তিনজন নন। বরং তিন সত্তা প্রকৃতপক্ষে একই। আর কুরআন যে বলেছে, 'যারা মাসীহ ইবন মারয়ামকে আল্লাহ বলে, তারা কাফের', তা দ্বারা মূলত মনূফিসী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে খৃষ্টসম্প্রদায়কে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে, তা দ্বারা ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা হল মনূফিসী সম্প্রদায়। আর কুরআন যে বলছে মাসীহকে শূলে চড়ানো হয়নি, সে কথাও সত্য। সাধারণ খৃষ্টসম্প্রদায়েরও বিশ্বাস 'মাসীহ সত্তা'-কে শূলে চড়ানো হয়নি, কেবল প্যাট্রিপিশিয়ান গ্রুপই মাসীহকে শূলে চড়ানোর কথা বিশ্বাস করত এবং কুরআন মাজীদ তাদেরকেই রদ করেছে। ক্যাথলিকদের দাবি হল, হযরত মাসীহের কেবল মানবীয় দেহকেই শূলে চড়ানো হয়েছিল, তার ঐশ্বরিক সত্তাকে (যা ঈশ্বরের তিন সত্তার একটি) শূলে চড়ানো হয়নি। আর কুরআন মাজীদও সরাসরি একথা বলেনি যে, মাসীহের মানবীয় দেহকে শূলবিদ্ধ করা হয়নি।

আপনারা 'আধুনিক ব্যাখ্যা'-এর মাহাত্ম্য দেখলেন। কিভাবে এ ব্যাখ্যা তামাম খৃষ্টীয় বিশ্বাসকে কুরআন মাজীদ দ্বারাই প্রমাণ করে দিল!

তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনাদের আধুনিক ব্যাখ্যা ও খৃষ্টসম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যে তফাৎ কী? কুরআন-সুন্নাহ'র নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের সর্ববাদীসম্মত বিধানাবলীর মধ্যে রদবদল করার অধিকার যদি আপনারা সংরক্ষণ করেন, তবে খৃষ্টানদের কেন সে অধিকার থাকবে না? আপনারা কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের 'নতুন ব্যাখ্যা'-কে প্রত্যাখ্যান করবেন?

কারও মনে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, আধুনিকতাবাদীদের 'নতুন ব্যাখ্যা'-এর রদকল্পে খৃষ্টানদের 'নতুন ব্যাখ্যা'-এর যে উদাহরণ টানা হয়েছে, আমরা তাতে অতিরঞ্জন করছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এ উদাহরণে আমরা কোনও রকম অতিশয়োক্তি করিনি। আমাদের আধুনিকতাপ্রিয় ভাইয়েরা যেসব দলীল-প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তার সিংহভাগ এ কিসিমের। বিশ্বাস না হলে তাদের রচনাবলী পড়ে দেখুন, অনুরূপ 'নতুন ব্যাখ্যা'-এর বিস্তর দৃষ্টান্ত তাতে পাবেন।

ড. ফজলুর রহমানের নতুন ব্যাখ্যার কারিশমা

'ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলাম'-এর ডিরেক্টর জনাব ড. ফজলুর রহমান সম্প্রতি 'ইসলাম' নামে একখানি বই লিখেছেন। তাতেও মজাদার সব 'নতুন ব্যাখ্যা' চোখে পড়ে। তার মতে ইসলামে মৌলিকভাবে তিন নামায ফরয করা হয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে দু'টি নামায অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। সে দৃষ্টিতে এখনও নামাযের সংখ্যায় পরিবর্তন সাধনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তিনি এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন–

"যাহোক, এটা এক বাস্তব সত্য যে, মৌলিকভাবে নামায ছিল তিন ওয়াক্ত, একটি ঘটনাও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। নবী 'আলাইহিস-সালাম কোনও কারণ ছাড়াই চার নামাযকে দু' নামাযে একীভূত করে দিয়েছিলেন। নামাযের সংখ্যাকে যে কঠোরভাবে অপরিবর্তনীয় পাঁচ সংখ্যকের মধ্যে নির্দিষ্ট করে ফেলা হয়েছে, এটা মূলত নবীযুগের পরের ঘটনা। আর মৌলিকভাবে নামায যে তিনটিই ছিল, এ সত্য ওই হাদীছসমূহের ক্রমবর্ধমান সয়লাবের নিচে চাপা পড়ে গেছে, যা কিনা পাঁচ নামাযের সমর্থনে প্রচার করা হয়েছে।"[৩৯]

নতুন ব্যাখ্যার কারিশমা দেখুন। একদিকে তো মুতাওয়াতির (সর্বযুগে বিপুল সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত) 'হাদীছসমূহের সয়লাব' মিথ্যা ও মনগড়া, যার ভেতর নামাযের সংখ্যা বলা হয়েছে পাঁচ, অন্যদিকে একটিমাত্র হাদীছই নির্ভরযোগ্য, যে হাদীছে চার নামাযকে দু'য়ের মধ্যে একীভূত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা সে হাদীছটির যে মর্ম ও নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছে, 'অর্থাৎ চার নামাযকে দু'য়ের মধ্যে একীভূত করে দুই নামাযই বানিয়ে ফেলা হয়েছিল', এটা নতুন ব্যাখ্যার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় উৎপাদন। আপনি 'দুই নামায একত্রীকরণ' সম্পর্কিত হাদীছ পড়ে থাকলে এর মজা উপলব্ধি করতে পারবেন (মূল ব্যাপার ছিল কেবল এই যে, কখনও কখনও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহর ও আসরের নামায এভাবে মিলিয়ে পড়েছেন যে, জোহরের নামায পড়েছেন ওয়াক্তের একদম শেষভাগে। তারপরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যেত এবং অমনি আসর পড়ে ফেলেন। একেই দুই নামায একত্রীকরণ বলা হয়)।

বস্তুত এ জাতীয় প্রমাণ-প্রদর্শন দেখেই কেউ বলে দিয়েছিল, 'তোমরা প্রতিটি জিনিস প্রতিটি জিনিসের দ্বারা প্রমাণ করতে পারবে'।

৩৯.মাহনামায়ে ফিক্‌র ওয়া নাজ্‌র, ২৫৯পৃ., ভলিউম ১৫, অক্টোবর ১৯৬৭খৃ.

তাদের উদ্ভট যত ব্যাখ্যা

আমরা তো একটা উদাহরণই আপনার সামনে পেশ করলাম, নয়ত বাস্তবতা হল নতুন ব্যাখ্যার তীর কোনও একটি শিকারকেও বিদ্ধ না করে ছাড়েনি।

নব্যপন্থীদের তাফসীর পড়ে দেখুন। তাতে নতুন ব্যাখ্যার বহু কীর্তি চোখে পড়বে।

তাদের মতে 'ওহী' হল খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। তারা 'ফিরিশতা' অর্থ করেছেন পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এমনিভাবে তাদের মতে 'ইবলীস' দ্বারা কল্পনাশক্তি, 'জিন্ন' দ্বারা অসভ্য গোত্রসমূহ, 'ইন্‌স' দ্বারা সভ্য লোক, 'মৃত্যু' দ্বারা অচৈতন্য, লাঞ্ছনা ও কুফ্‌র এবং 'জীবন' দ্বারা সম্মান, চৈতন্য ও ইসলাম বোঝানো উদ্দেশ্য। তারা বলেন, লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার অর্থ লাঠিতে ভর করে পাহাড়ে চড়া।

কুরআন ব্যাখ্যার এসব অভূতপূর্ব তত্ত্ব সামনে রেখে আপনি বলুন তো আমরা তাদের নয়া ব্যাখ্যার উদাহরণ হিসেবে খৃষ্টানদের বিষয়গুলো পেশ করে কি কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করেছি?

যাহোক, মাঝখানে এ কথা প্রসংগক্রমে এসে পড়েছিল। আমরা আরয করেছিলাম, দলীল-প্রমাণকে যদি দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী বানানোর কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে কুরআন মাজীদ দ্বারাই খৃষ্টধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করা যাবে। প্রমাণ করা যাবে ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রও। এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেই তো ইতঃপূর্বে পারভেজ সাহেব তার 'ইবলীস ও আদম' পুস্তকে কুরআন দ্বারাই 'ডারউইন'-এর 'বিবর্তনবাদ' প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদের আয়াত أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (নামায কায়েম কর)-এর দ্বারা তার 'উদ্ভাবনী ক্ষমতা' সমাজতান্ত্রিক ধারার এক অর্থব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। এই একই প্রক্রিয়ায় মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী 'দামেশক' দ্বারা 'কাদিয়ান' বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। হাদীছ শরীফে আছে, হযরত 'ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে বাবে-লুদ্দ (লুদ্দ দরজা) নামক স্থানে হত্যা করবেন। মির্জা কাদিয়ানির ব্যাখ্যা হল, 'লুদ্দ' হচ্ছে 'লুধিয়ানা' আর দরজা কাদিয়ান। এভাবে তিনি নিজেকে 'প্রতিশ্রুত মাসীহ' প্রমাণ করার পাঁয়তারা চালিয়েছেন।

নব্যপন্থীদের বক্রতার মূল কারণ

মোটকথা, আমাদের এই নব্যপন্থীগণ গবেষণা ও প্রমাণ প্রদর্শনের এই যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ প্রথমে একটা মতাদর্শ স্থির করে

নিয়ে তাকে 'সময়ের চাহিদা' সাব্যস্ত কর, তারপর তথাকথিত 'নতুন ব্যাখ্যা'-এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহকে টেনে-কষে তার সাথে মিলিয়ে দাও, এটাই হল সেই বুনিয়াদী ইট, যার বক্রতা তাদের চিন্তাধারার গোটা স্থাপনাকে বক্র করে তুলেছে। এবং এটাই সেই মূল কারণ, যদ্দরুন তাদের চিন্তা-চেতনা, তাহকীক ও গবেষণার তামাম মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন পদদলিত করে তাহ্‌রীফ ও অপব্যাখ্যার সীমানায় ঢুকে পড়েছে।

দুনিয়ার যে-কোনও জ্ঞানশাস্ত্রে গবেষণার কিছু নিয়ম-কানুন ও মূলনীতি স্থিরীকৃত থাকে। তা অনুসরণ করা ব্যতিরেকে সেই শাস্ত্রের গবেষণায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বর্তমান আইনশাস্ত্রে ও আইনের দর্শনেও (Jurisprudence) বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যা (Intepertation of Statutes) একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণ্য। এর যথারীতি নিয়মনীতি আছে। সেসব নিয়ম পুরোপুরি না মানা হলে আইনব্যাখ্যাতার কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না।

অনুরূপভাবে, ফিক্‌হ ও কুরআন-সুন্নাহ্‌'রও সুস্পষ্ট ও বিশদ নীতিমালা আছে, যা অধিকতর যুক্তিসংগত, সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। 'উসূলুল-ফিক্‌হ' শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে তা যারপরনাই বিচার-বিশ্লেষণের সাথে সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য বই-পুস্তক। তাতে একেকটি নীতি অতি উত্তমরূপে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ্‌'র ব্যাখ্যা যতক্ষণ সেইসব নীতিমালার আলোকে নিষ্পন্ন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিবেকবান লোক তা গ্রহণ করতে পারে না, যেমনিভাবে বিধিবদ্ধ আইনের ব্যাখ্যাদানের জন্য যেসব মূলনীতি স্থিরীকৃত আছে, সে অনুযায়ী না হলে কোনও আইনব্যাখ্যাতার আইনী ব্যাখ্যা গৃহীত হয় না।

কুরআন-ব্যাখ্যার একটি স্বীকৃত মূলনীতি এবং নব্যপন্থীদের কর্তৃক তা লঙ্ঘন

কিন্তু আমাদের আধুনিকতাপন্থীগণ তাদের চিন্তা-ভাবনায় উল্টোপথে চলার কারণে নিজেদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এসব মূলনীতির কোনওটাই মানে না। জায়গায়-জায়গায় তারা কুরআন-সুন্নাহ্‌'র ব্যাখ্যায় ওইসব সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন, যা উসূলুল-ফিকহের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উদাহরণত, উসূলুল-ফিকহের একটি স্বীকৃত নিয়ম হল– কুরআন-সুন্নাহ্‌'র কোনও শব্দের যতক্ষণ পর্যন্ত হাকীকী (প্রকৃত) অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাজাযী (রূপক) অর্থের দিকে যাওয়া যাবে না। যখন প্রকৃত অর্থগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়বে, কিংবা প্রকৃত অর্থের ব্যবহার

বর্জিত হয়ে যাবে, কেবল তখনই রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাবে। এ দু'টো কারণ যেখানে না থাকবে, সেখানে প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ নীতিটি শতভাগ যুক্তিসংগত, বিবেক-বুদ্ধির কোনও যুক্তি-প্রমাণ একে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এ নীতি অগ্রাহ্য করা হলে জগতের কোনও লোকের কোনও কথারই নিশ্চিত কোনও মর্ম থাকবে না। যার যা ইচ্ছা বোঝার অবকাশ থাকবে।

কিন্তু আমাদের আধুনিক চিন্তাবিদগণ পদে-পদে এ মূলনীতি লঙ্ঘন করেন। যেখানেই তারা কুরআন-সুন্নাহ্'র কোনও শব্দ নিজেদের চিন্তা-ভাবনার বিপরীত দেখে, সেখানেই নিজেদের মরজি মোতাবেক তার উপর রূপক অর্থ চাপিয়ে দেয়। এভাবেই তারা 'ইবন' (পুত্র) শব্দকে 'পৌত্র' অর্থে, عصى (লাঠি)-কে 'প্রমাণ' অর্থে, 'মাওত'-কে অচৈতন্য ও লাঞ্ছনা অর্থে এবং 'ইবলীস'-কে 'কল্পনাশক্তি' অর্থে গ্রহণ করেছে। এমনকি 'আল্লাহ' ও 'রাসূল'-এর অর্থও করেছে 'জাতির কেন্দ্রস্থল' (আধুনিক চিন্তাবিদগণ কুরআন মাজীদের এসব শব্দের এরকম ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। একই জায়গায় যদি সবগুলো দেখতে চান, তবে পারভেজ সাহেবের 'মা'আরিফুল-কুরআন' দেখতে পারেন)।

এই সামান্য কয়েকটি উদাহরণ কেবল নমুনাস্বরূপ পেশ করা গেল। নয়ত তাদের এ জাতীয় নীতিভ্রষ্টতা একত্র করা হলে বৃহৎ কলেবরের একটা বই তৈরি হতে পারে।

মতলবমত চলাই যাদের মূলনীতি

উসূলুল-ফিকহের ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত এ বিষয়ক সুপ্রতিষ্ঠিত ও যুক্তিসিদ্ধ মূলনীতিসমূহ না হয় কিছুক্ষণের জন্য বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু তারপরও শর'ঈ আইন ও বিধানের ব্যাখ্যাদানকালে কোনও না কোনও মূলনীতি তো আপনাদের অনুসরণ করতে হবে। উসূলুল-ফিকহের মূলনীতিসমূহ মনঃপূত না হলে দলীল-প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েই দিতেন, কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাদানের জন্য নির্ণিত সেসব নীতি কেন অচল এবং তার কোথায় কী ভুল আছে! অতঃপর দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার পরিবর্তে অন্য কোনও উপযুক্ত মূলনীতি স্থির করে দিতেন এবং নিজেদের তাহকীক-গবেষণায় তা অনুসরণ করে চলতেন!

কিন্তু আপনারা এর কিছুই করেননি। আমরা গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেয়েছি, তা হচ্ছে আধুনিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আপনারা কোনও

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করেননি। এক জায়গায় আদর্শের পরিপন্থী মনে হওয়ায় একটা মূলনীতি ছুঁড়ে ফেলেছেন, তো অন্য জায়গায় আবার সেটাকেই বিনাবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, যখন দেখেছেন আপনাদের মতলব অনুযায়ী কিছু প্রমাণ করার পক্ষে সেটি বেশ সহায়ক হয়। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই নিজেদের মতাদর্শের পরিপন্থী বোধ হওয়ায় একটা হাদীছকে কলমের এক খোঁচায় বাতিল করে দেন, তা সনদের দিক থেকে সে হাদীছ যতই শক্তিশালী হোক, আবার নিজেদের মতাদর্শ মোতাবেক মনে হওয়ায় এমন হাদীছকেও বিলক্ষণ গ্রহণ করে নেন, যা সনদের বিচারে নিতান্তই দুর্বল, এমনকি সেই দুর্বল হাদীছের ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট বক্তব্যকেও ঠেলে সরিয়ে দেন।

এমনিভাবে দেখা যায়, মুতাকাদ্দিমীন (প্রাচীন) 'উলামায়ে কিরামের কোনও বক্তব্য নিজেদের চিন্তা-ভাবনার খেলাফ হলে সেটি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেন, যদিও সে বক্তব্যটি হয় তাদের অবিসংবাদিত ও সর্বসম্মত। পক্ষান্তরে নিজেদের মনমত কোনও বক্তব্য যদি একজন ফকীহ'র বরাতে পেয়ে যান, তবে তা যতই কমজোর হোক না কেন বিনাবাক্যে লুফে নেন।

খামখেয়ালিপনার এক তাজা দৃষ্টান্ত

এর তাজা দৃষ্টান্ত হল– বিসমিল্লাহ না বলে যবাহ্ করা হলে সে পশুর গোশত হালাল হবে কিনা, সে সম্পর্কে ড. ফজলুর-রহমান সাহেবের অভিমত। তিনি সোজা-সাপটাই একে হালাল বলেছেন। কুরআন মাজীদে তো ইরশাদ–

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

'যবাহকালে যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, তা খেও না।'[৪০]

কিন্তু এ বিধান ডক্টর সাহেবের মতের খেলাফ। তাই এই দ্ব্যর্থহীন হুকুমও তিনি অকাতরে অগ্রাহ্য করেছেন। এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে টেনে এনেছেন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ। এবং খুঁজে বের করেছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর একটি উক্তি, যা তাঁর ফিকহী মতামতসমূহের মধ্যে বোধকরি সর্বাপেক্ষা কমজোর মত (খোদ তাঁর মাযহাবের 'উলামায়ে কিরাম পর্যন্ত এ মতকে দুর্বল সাব্যস্ত করে থাকেন)। ড. সাহেব হাদীছের যে দলীল পেশ করেছেন সে সম্পর্কে প্রথম কথা হল, তিনি এ জাতীয় হাদীছ সম্পর্কে নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

৪০.সূরা আন'আম, আয়াত ১২১

"কোনও হাদীছের বক্তব্য যদি কুরআন মাজীদের প্রত্যক্ষ শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে সেটিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে বরং ইসলামী ইতিহাসের সেই বিশেষ যুগের সাথে সম্পৃক্ত করব।"[৪১]

ড. সাহেব বিসমিল্লাহ পাঠবিহীন যবাহকে হালাল করার জন্য হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা যে প্রমাণ পেশ করেছেন, সে প্রমাণ প্রদর্শন যে কতটা গলদ, তা আপাতত বাদ রাখলাম। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, উপরিউক্ত উদ্ধৃতিমতে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী যখন এই যে, যে হাদীছ কুরআন মাজীদের প্রত্যক্ষ শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তাকে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করলেন না, অর্থাৎ সেটিকে তাঁর বক্তব্য বলে স্বীকার করলেন না, তখন কুরআন মাজীদের দ্ব্যর্থহীন শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও এ হাদীছের উপর আপনি কিভাবে নির্ভর করলেন?

বাকি থাকল ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মত। এ ক্ষেত্রেও আপনাদের স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। কেননা ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন হল–

"ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর প্রোজ্জ্বল প্রতিভা ও ব্যুৎপন্নমতিত্ব এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা রচনা করে দিয়েছে এবং নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসের মধ্যবর্তী সময়ে সামাজিক ও ধর্মীয় অবকাঠামোর সুপ্রতিষ্ঠায় তা যথেষ্ট ভূমিকাও রেখেছে, কিন্তু তার পরিণামে এ জাতিকে চিন্তার আধুনিকীকরণ ও সৃজনশীল কর্ম-পরিকল্পনা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়েছে।"[৪২]

প্রশ্ন হচ্ছে, যেই ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এমন মারাত্মক 'মৌলিক বিচ্যুতি'–এর শিকার হয়েছেন, শাখাগত একটা বিষয়ে তাঁর অভিমতকে দলীল হিসেবে পেশ করা আপনার পক্ষে কতটুকু বৈধ?

আপনারাই বলুন, এসব উদাহরণ দ্বারা কি স্পষ্ট হয়ে যায় না যে, ওই আধুনিক চিন্তাবাদীদের কাছে আসলে তাহকীক ও গবেষণার সুচিন্তিত কোনও মূলনীতিই ছিল না? তারা তাদের আধুনিক ব্যাখ্যায় যে উসূলুল-ফিকহের নিয়ম-কানুনের কোনও তোয়াক্কাই করেনি, ব্যাপার এতটুকুই নয়; বরং তারা তাদের নিজেদের তৈরি নিয়ম-নীতিরও কিছুমাত্র ধার ধারেনি।

---

৪১. মাহনামায়ে ফিক্‌র ওয়া নাজ্‌র, ২ভলিয়ম, ৮সংখ্যা, ৫১৫পৃ.

৪২.মাহনামায়ে ফিক্‌র ও নাজ্‌র, ২ভলিউম, ১সংখ্যা, ৩০পৃ.

একটু চিন্তা করে দেখুন, মূলনীতি থেকে তাদের এই পলায়নপরতার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তাদের উদ্দেশ্য হল প্রথমেই একটা মতাদর্শ স্থির করে নেওয়া, তারপর সেই লক্ষে দলীল-প্রমাণ খোঁজা। এ কর্মপন্থা কিছুতেই মূলনীতির সহযাত্রী হতে পারে না। আর এ কারণেই তাদেরকে প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য আলাদা-আলাদা নিয়ম তৈরি করে নিতে হয়েছে।

আমাদের নিবেদন

পরিশেষে কেউ যদি তাদের কাছে এই বিনীত অনুরোধ রাখে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে জ্ঞান ও গবেষণার এই দূরাবস্থার প্রতি দয়া করুন, কুরআন ও হাদীছকে এভাবে মোমের পুতুল বানাবেন না, যেমন ইহুদী-নাসারা সম্প্রদায় তাদের তাওরাত ও ইন্‌জীলকে বানিয়েছিল, তবে তাদের দৃষ্টিতে সে হয়ে যায় প্রতিক্রিয়াশীল, হয়ে যায় ফাঁসির আসামী। বলা হয়, সময়ের চাহিদা সম্পর্কে ওর কোনও খবর নেই। তার সম্পর্কে আধুনিকতাবাদীদের ফতোয়া হল–

> "তারা নতুন যুগকে অস্বীকার করে এবং সময়ের দাবি সম্পর্কে ওদের কোনও ধারণা নেই।"[৪৩]

আমরা জানি এই নিবেদনের জবাবেও আমরা ওই খেতাবই পাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিবেদনপত্রটি আমরা তাদের সামনে পেশ করলাম। এবং ভবিষ্যতেও একই আরয করতে থাকব। আমরা আশাবাদী আল্লাহ চাহেন তো আমাদের কোনও কথা কারও সচেতন হৃদয়ে একটু হলেও নাড়া দেবে। হয়ত কারও বিবেক জাগ্রত হবে এবং অন্তত এতটুকু চিন্তা করবে যে, গবেষণার নামে কুরআন-সুন্নাহ'র প্রতি এ কী আচরণ করা হচ্ছে?

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাম ও আধুনিকতা, ৪৯-৫৮পৃ.

৪৩.মাহনামায়ে ফিক্‌র ওয়া নাজ্‌র, ২ভলিউম, ১২সংখ্যা, ৭৩১ পৃ.

বিজ্ঞান ও ইসলাম

চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান যে ধারণা দিচ্ছে, কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তা কি সঠিক? আমাদের এ দেশে কিছু লোক মনে করে, সায়েন্স ও কুরআন-হাদীছের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, অতএব তার প্রতিটি কথাই সঠিক। আবার কেউ কেউ বলেন, সায়েন্সের দৃষ্টিভঙ্গী কুরআন মাজীদের সাথে সাংঘর্ষিক। অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে আপনার পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট মতামত সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবেন।– **(আব্দুল হাই, ফরিদপুর)**

আপনার এ প্রশ্নের জবাবদানের জন্য একটা বড়সড় নিবন্ধের দরকার। তারপরও মৌলিকভাবে কয়েকটি জরুরি কথা আরয করা যাচ্ছে। আশা করি তা আপনার দ্বিধা-সংশয় নিবারণে সাহায্য দেবে।

এক. সর্বপ্রথম বোঝার বিষয় হল, বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য কী? বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতে যেসব শক্তি নিহিত রেখেছেন তা উদঘাটন করা। সে শক্তিসমূহকে যদি মানুষের কল্যাণ ও উৎকর্ষসাধনে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়, তবে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল জায়েযই নয়; বরং একটি উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ। এ প্রচেষ্টার পথে ইসলাম কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি; বরং উৎসাহ জুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের দাবি কেবল এতটুকু যে, এসব শক্তিকে যেন কেবল এমন কাজে ব্যবহার করা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয ও উপকারী।

অন্যভাবে বললে বিজ্ঞানের কাজ হল বিশ্বজগতের গুপ্ত শক্তিসমূহ উদঘাটন করা। কিন্তু সে শক্তিসমূহকে কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তার নির্দেশনা কেবল ধর্মই দিয়ে থাকে। ধর্মই আবিষ্কারমূলক প্রচেষ্টাসমূহের জন্য সঠিক গতিপথ নির্ণয় করে ও উত্তম পরিবেশ-পরিমণ্ডলের যোগান দেয়। সায়েন্স ও টেকনোলজি কেবল তখনই মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, যখন তা ইসলামপ্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অন্যথায় একথা হয়ত কেউ অস্বীকার করবে না যে, বিজ্ঞান যেমন মানুষের কল্যাণ ও উৎকর্ষের কারণ হতে পারে, তেমনি তার ভুল ও অনুচিত ব্যবহার আমাদের জন্য সাব্যস্ত হতে পারে চরম ধ্বংসাত্মক। উদাহরণ আমাদের সামনেই

আছে। অতীতে বিজ্ঞান যেমন মানুষের বিভিন্ন আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছে, তেমনি তার অনুচিত ব্যবহার সমগ্র বিশ্বকে অশান্তি-অস্থিরতার জাহান্নামেও পরিণত করেছে। যে বিজ্ঞানসফর-ভ্রমণের জন্য দ্রুতগামী বাহন আবিষ্কার করেছে, সেই বিজ্ঞানই মানবতাবিধ্বংসী অ্যাটমবোমা ও হাইড্রোজেনবোমাও তৈরি করেছে। কাজেই বিজ্ঞানের যথার্থ কল্যাণ কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহপ্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী তার ব্যবহার হবে।

দুই. বৈজ্ঞানিক গবেষণা দু' প্রকার। এক গবেষণা প্রত্যক্ষ দর্শনভিত্তিক। এরূপ গবেষণা কখনও কুরআন-সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক হয়নি এবং তা হতেও পারে না; বরং অভিজ্ঞতা হল, এরূপ গবেষণা হামেশা কুরআন-সুন্নাহ'র সমর্থন করেছে। কুরআন-সুন্নাহ'র কিছু কিছু কথা এই কিছুকাল আগেও মানুষের পক্ষে বোঝা কষ্টকর ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন তা বোঝা খুব সহজ করে দিয়েছে। উদাহরণত, যেই বোরাকের পিঠে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মে'রাজ হয়েছিল, বিভিন্ন হাদীছে তার দ্রুতগতির বর্ণনা এসেছে।তার সে গতি এমনই অস্বাভাবিক যে, প্রাচীনকালের নামধারী বুদ্ধিজীবীগণ তা অযৌক্তিক মনে করত। কিন্তু এখন কি বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেয়নি যে, গতি এমনই একটি গুণ, যাকে বিশেষ কোনও সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না?

দ্বিতীয় প্রকারের সায়েন্টেফিক মতামত এমন, যা কোনও প্রত্যক্ষ দর্শন ও নিশ্চিত জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং কেবলই ধারণা-অনুমান বা অপূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত কোনও নিশ্চিত ফলাফলে উপনীত হতে পারেনি। এ জাতীয় গবেষণা অনেক সময় কুরআন-সুন্নাহ'র বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সরল সঠিক পথ হল, কুরআন-সুন্নাহ'র বক্তব্যে কোনওরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি ঈমান রাখা এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখা যে, এব্যাপারে বিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত সত্যে পৌছাতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যতবেশি পূর্ণতায় পৌছাবে, ততই কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত সত্য পরিষ্কার হতে থাকবে। উদাহরণত, বিজ্ঞানীদের ধারণা আকাশের কোনও অস্তিত্ব নেই। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা এরকম নয় যে, আকাশের অস্তিত্ব না থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত কোন দলীল পাওয়া গেছে এবং তার ভিত্তিতে তাদের এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বরং তাদের দলীলের সারকথা কেবল এই যে, আমরা আসমানের অস্তিত্ব জানতে পারিনি। আর

সেজন্যই আমরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করছি না। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, তাদের এই ধারণা 'অস্তিত্বহীনতার জ্ঞান'-এর উপর নয়; বরং 'জ্ঞানের অনস্তিত্ব'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা- যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র অকাট্যতার উপর বিশ্বাস রাখে—পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে বলছি ওই বিজ্ঞানীদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্য এটাই যে, কুরআন-সুন্নাহ'র বক্তব্যমতে আকাশের অস্তিত্ব আছে -আসমান অস্তিমান কিন্তু বিজ্ঞান নিজ অপূর্ণতার কারণে এখনও পর্যন্ত তা আবিস্কার করতে পারেনি। মানুষ তার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যতবেশি সামনে অগ্রসর হবে এবং তার জ্ঞান-গবেষণা যতবেশি সমৃদ্ধি লাভ করবে ততই নতুন নতুন সত্য তার সামনে উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। আর এভাবেই এক এক করে তার ভুল ভাঙতে থাকবে এবং এভাবে একপর্যায়ে সে আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যেমন সে ইতোমধ্যে এমন অনেক কিছুই স্বীকার করে নিয়েছে, যা সে একদিন মানতে প্রস্তুত ছিলনা।

বস্তুত মূল সমস্যা আমাদের মানসিকতায়। প্রতিটি বস্তুকে তার আপন স্থানে রাখার মানসিকতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। যখন কোন বস্তুর গুরুত্ব অন্তরে চেপে বসে, তখন অনেক সময় সে ব্যাপারে আমাদের সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতি উপকারী ও জরুরি শাস্ত্র। বর্তমানকালে এ শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া এবং এতে উৎকর্ষ লাভের অক্লান্ত চেষ্টা চালানো মুসলিম জাতির জন্য অতীব জরুরি। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে তাদের পক্ষে নিজেদের প্রকৃত অবস্থানে পৌছা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ আদৌ এরকম নয় যে, কোনও বিজ্ঞানী নিজ ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে-কোনও মত প্রকাশ করলেই ওহীর মত পরম সত্যজ্ঞানে তা মেনে নেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছে দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা ও সংযোজন-বিয়োজনের দরজা খুলে দেওয়া হবে কিংবা তার ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের বক্তব্যে দ্বিধা-সংশয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে, বিশেষত যখন আমরা দিবা-রাত্র প্রত্যক্ষ করছি বিজ্ঞান এ জাতীয় মতামতে প্রতিনিয়ত তার অবস্থান বদলাচ্ছে।

তিন. মনে রাখতে হবে, ইসলামের ব্যাপারটা খৃষ্টধর্মের মত নয়। এ দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। খৃষ্টধর্মের সেই প্রাণশক্তিই ছিলনা যে, যুগের নিত্য-নতুন প্রয়োজন ও মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মোকাবেলা করবে, ফলে বিজ্ঞান তার জন্য এক মহাবিপদরূপে আবির্ভূত হয়। চার্চের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তার সামনে দু'টি পথই খোলা ছিল– হয়

সে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করবে অথবা বিজ্ঞানের সাথে তাল মেলানোর জন্য নিজ ধর্মে রদবদল করবে। শুরুর দিকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করে। যেহেতু সাধারণ মানুষের উপর তার আধিপত্য কায়েম ছিল, তাই গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীদেরকে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন চার্চের আধিপত্য শিথিল হতে থাকে তখন একপর্যায়ে তার জন্য নিজ ধর্মে তরমীম করা এবং নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়াস চালানো ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। সুতরাং তাদের আধুনিকপন্থীগণ (Modernism)এ পন্থাই অবলম্বন করে।

কিন্তু এসবের মূল কারণ খৃষ্টধর্মের গোড়ার গলদ। এ ধর্মটিকে চরম প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম সে রকমের কোনও দ্বীন নয়। এটা সরল ধর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সুস্থ বিবেকসম্মত কোনও দলীল এ ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। যুগের যে-কোনও প্রয়োজন সমাধা করা এবং যে-কোনও জ্ঞান-গবেষণার সাথে সমতালে চলার পূর্ণ যোগ্যতা এ দ্বীনের রয়েছে। সুতরাং ইসলামের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাদের না প্রয়োজন আছে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার, না ইসলামকে বদলানোর। কেননা এটা আমাদের ঈমান যে, বিজ্ঞান যতই উন্নতি করবে এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধি লাভ করবে, ইসলামের সত্যতাও ততই পরিস্ফুট হতে থাকবে। শর্ত হল, মানুষের দৃষ্টিকোণ সত্যিকার অর্থে সায়েন্টেফিক থাকতে হবে। সে নিছক আন্দাজ-অনুমানকে নিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মর্যাদা দেবে না।

ব্যস এটাই হল 'উলামায়ে কিরামের বক্তব্য। এর সারকথা হল, প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখতে হবে। আবেগপ্রসূত শ্লোগানে তাড়িত হয়ে সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

আশ্চর্যের কথা হল, এই ভারসাম্যমান ও শতভাগ যুক্তিসিদ্ধ কথার দরুন কিছুলোক একাধারে প্রচার করে যাচ্ছে, 'আলেমগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধী। এ ময়দানের উন্নতি ও উৎকর্ষ তারা সহ্য করে না। এটা 'আলেমদের প্রতি নির্জলা অপবাদ। এর জবাবে আমরা কেবল এই দু'আই করতে পারি যে, হে আল্লাহ তাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

সূত্র : ইসলাম আওর জিদ্দাত পাসান্দী

ইসলাম ও ট্রাফিক

বছর পনের আগে আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যাই, তখন সেটাই ছিল কোনও আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে আমার প্রথম সফর। এখনতো দক্ষিণ আফ্রিকা শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে গেছে। বর্ণবাদী নীতি এখন সেখানকার অতীত কাহিনী। কিন্তু প্রথমবার যখন আমি সেখানে যাই, তখন শ্বেতাঙ্গ ডাচ শাসকদের রাজত্ব চলছিল। বর্ণবৈষম্যমূলক আইন-কানুন পূর্ণ প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে কার্যকর ছিল। বড় বড় নগরে কেবল শ্বেতাঙ্গদেরই বসবাসের অধিকার ছিল। অন্য জাতির লোকদের জন্য পৃথক পৃথক জনপদ ছিল এবং তা ছিল ওইসব বড় বড় শহর থেকে যথেষ্ট দূরে।

জোহানেসবার্গ থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে 'আজাদবেল' নামে এরকমই একটি মনোরম শহর গড়ে উঠেছিল। এ শহরটি কেবল ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের মেজবান যেহেতু সেই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, তাই আমাদের সেখানেই অবস্থান করতে হয়। এলাকাটির পরিবেশ ছিল বড়ই চমৎকার। বেশিরভাগ স্থাপনাই ছিল আবাসিক। অল্পসংখ্যক বাসিন্দার জন্য বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর পরিকল্পিতভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হয় তাহলে বলাইবাহুল্য এলাকাটির প্রশস্ততা ও উন্মুক্ত পরিবেশ চোখে পড়ার মত হবে। ঠিক এ দৃশ্যই এখানে বিরাজ করছিল। জনপদটি খুবই সুদৃশ্য, খোলামেলা, শান্ত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বোধ হচ্ছিল। এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব গাড়ি ছিল। কিন্তু সড়কে যানজটের কোনও প্রশ্নই ছিল না। পদযোগে চলাচলকারীদের সংখ্যা বড় কম ছিল। সড়কে কদাচিৎ দু'-একজন পদচারী দেখা যেত। তাও বেশির ভাগ ফুটপাতের উপর। সড়কে বেশির ভাগ সুনসান নীরবতা বিরাজ করছিল। কিন্তু সেই নীরব-নিস্তব্ধ সড়কেও প্রতিটি ছোট ছোট মোড়ে মাটির উপর কালো রেখা অঙ্কিত, যা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কোথাও কোথাও মোড় ছাড়াও সেরকম রেখা দেখা যাচ্ছিল। আমি মোটরকারে সফরকালে দেখতে পাই গাড়িচালক সেই রেখার উপর পৌঁছে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং ডানে বামে নজর দিয়ে ফের সামনে অগ্রসর হয়।

আমার খুব বিস্ময়বোধ হচ্ছিল যে, সড়কতো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জনশূন্য। কোথাও যাতায়াতকারীর নাম-নিশানাও নেই। তা সত্ত্বেও ড্রাইভারের যতই তাড়া থাক কিংবা কথাবার্তায় যতই মশগুল, সেই কালো রেখায় পৌঁছে অবশ্যই থেমে যায় এবং তার ঘার ডানে-বামে আপনা-আপনিই ঘুরে যায়। যেন স্বয়ংক্রিয় কোনও যন্ত্র রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘুরে যাচ্ছে। তা এর রহস্য কী! প্রথম প্রথম আমি মনে করেছিলাম, ড্রাইভারের হয়ত আকস্মিক কোনও সংশয় দেখা দিয়েছে, তাই গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যখন বারবারই একই দৃশ্য চোখে পড়ল, শেষে আর কৌতূহল থামাতে পারলাম না। লোকজনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তারা জানাল, এটা আমাদের দেশের ট্রাফিক আইন যে, প্রত্যেক মোড়ে অথবা যেখানে এই কালো রেখা অঙ্কিত আছে, ড্রাইভার সেখানে অবশ্যই গাড়ি থামিয়ে ডানে-বামে লক্ষ করবে। এখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে কোথাও কোনও মোড় দেখা গেলে কিংবা অন্য কোথাও কালো রেখা চোখে পড়লে পা আপনা-আপনিই ব্রেকে চলে যায় এবং গাড়ি থামা মাত্রই ঘাড় ডানে-বামে ঘুরে যায়।

এরপর যতদিন আমার সেখানে থাকা হয়, প্রতিদিন বার বার এই একই দৃশ্য দেখি। একজন লোকও এমন পাইনি, যে এ আইন ভঙ্গ করে। আমাকে আমার আবাসস্থল থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত রোজ কয়েকবার যেতে হত। প্রতিবারই দেখেছি গাড়িচালক মেইনরোডে পৌঁছার আগ পর্যন্ত সেই জনশূন্য সড়কে কয়েকবার থেমে যেত, অথচ এই পুরো সময়কালে সড়কে এমন কোনও ট্রাফিক আমার নজরে পড়েনি, যে মানুষকে এ আইন পালনে বাধ্য করছে। সেখানে আমাদের দেশের মত কোনও স্পিডব্রেকারও দেখিনি, যেগুলোকে 'স্পিডব্রেকার' না বলে 'কারব্রেকার' বলাই বেশি সমীচীন।

এ দৃশ্য আমি সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায়ই দেখেছিলাম, ফলে আমার কাছে তা অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কেননা চোখ তো পাকিস্তানের স্বাধীন ও বল্গাহীন ট্রাফিক দেখেই অভ্যস্ত ছিল। পরে অবশ্য এ দৃশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশেই দেখতে পেয়েছি। এখন তো চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন নিজ দেশে ট্রাফিকের হাল দেখি, তখন তাতে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করি না। আগে যেমনটা ছিল এখনও সেখানেই পড়ে আছে; বরং মনে হয় যেন পরিস্থিতি উল্টো দিকে চলছে। বিষয়টা সবার চোখের সামনে, তাই বিস্তারিত বলার দরকার নেই।

এহেন পরিস্থিতির কারণ সরকারি ব্যবস্থাপনার শিথিলতা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব তো বটেই, কিন্তু একটা বড় কারণ এইও যে, আমরা

জীবনের প্রাত্যহিক বিষয়গুলোকে দ্বীনবহির্ভূত জিনিস মনে করি। আমাদের মন-মানসিকতায় এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, দ্বীন ও ইসলামের সম্পর্ক কেবল মসজিদ-মাদরাসার সাথে, পার্থিব বিষয়াবলী– যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় দ্বীনের আওতাবহির্ভূত (না'ঊযুবিল্লাহ)। তাই আমরা মনে করি ট্রাফিক আইনের সংগে দ্বীনের কী সম্পর্ক?

এই ভ্রান্ত ধারণারই পরিণাম যে, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করতে গিয়ে কারও একবারও ধারণা হয় না যে, সে কোনও গুনাহ'র কাজ করছে; বরং এখন তো আইন অমান্য করা একটা বীরত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ব্যক্তি যতবেশি আইন লঙ্ঘন করতে পারে, তাকে ততবড় বীর ও সাহসী গণ্য করা হয়।এই ভ্রান্ত ধারণারই ফল যে, ভালো ভালো দ্বীনদার লোক, যারা নামায-রোযায় যত্নবান এবং সামগ্রিকভাবে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের ফিকিরও রাখে, ট্রাফিক আইন নির্দ্বিধায় লঙ্ঘন করে থাকে। এতে তাদের মনে কোনও চাপ পড়ে না এবং তারা এ কাজকে গলদ বা গুনাহ মনে করে না। ভুল জায়গায় গাড়ি দাঁড় করানো, নির্ধারিত গতির বেশি বেগে গাড়ি চালানো, উল্টোপথে চলা, থামার সংকেতবাহী লাল আলো উপেক্ষা করা, যেখানে ওভারটেকিং নিষিদ্ধ সেখানে যথারীতি প্রতিযোগিতার সাথে গাড়ি চালানো দৈনন্দিনকার তামাশায় পরিণত হয়ে গেছে। অথচ এসব কাজ কেবল শৃঙ্খলাবিরোধীই নয়; বরং দ্বীনী দিক থেকেও গুনাহ'র অন্তর্ভুক্ত। প্রথমত এ কারণে যে, ট্রাফিক সংক্রান্ত যাবতীয় আইন মূলত গণমানুষের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে আর সামগ্রিক সুবিধার্থে সরকারের পক্ষ থেকে যেসকল আইন তৈরি করা হয়, শরী'আতের দৃষ্টিতেও তা মানা ওয়াজিব। তা লঙ্ঘন করা বিলকুল জায়েয নয়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহর, আনুগত্য করবে রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্ববান তাদের।'[৪৪]

এ আয়াত দ্বারা একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, শাসকমহল জনসাধারণের কল্যাণার্থে যেসব আইন তৈরি করে, তা যদি শরী'আতবিরোধী না হয়, তবে তা মেনে চলতে হবে। এই আইন মান্য করার বিধানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার বিধানের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে এরকম আইন মেনে চলা শরী'আতেও জরুরি।

---

৪৪. সূরা নিসা, আয়াত ৫৯

দ্বিতীয়ত কেউ যখন সড়কে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স গ্রহণ করে, তখন সে সরকারের সাথে মৌখিক, লিখিত কিংবা অন্ততপক্ষে কার্যত ওয়াদা করে যে, সড়কে গাড়ি চালানোর সময় সে যাবতীয় সরকারি আইন মেনে চলবে। যদি লাইসেন্সের আবেদন করার সময়ই সে সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, ট্রাফিক আইনসমূহ মেনে চলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তবে তাকে কখনওই লাইসেন্স দেওয়া হবে না। তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে মূলত ওই ওয়াদারই ভিত্তিতে। সুতরাং লাইসেন্স পাওয়ার পর যদি সে রাস্তায় গাড়ি নামায়, কিন্তু ট্রাফিক আইন অনুসরণ না করে, তবে ওয়াদা ভঙ্গের কারণেও সে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

তৃতীয়ত এসব আইন অমান্য করার দরুন সাধারণত কারও না কারও ক্ষতি হয়েই যায়। কোনও না কোনওভাবে মানুষ তাতে কষ্ট পেয়েই থাকে। অনেক সময় এ আইন অমান্য করার কারণে দুর্ঘটনাও ঘটে যায়, যাতে মানুষের জান-মালের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়। অন্ততপক্ষে এতটুকু তো হয়ই যে, অন্য লোক মানসিকভাবে কষ্ট পায়। আমি বার বার লিখেছি, কোনও মানুষকে যে-কোনওভাবে কষ্ট দেওয়া কঠিন গুনাহ আর সে গুনাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও ক্ষমা করা হয় না।

ইসলামী ফিকহের সব কিতাবে মূলনীতি লেখা আছে, জনপথে চলা ও সওয়ারী চালানো বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল অন্যের নিরাপত্তা রক্ষা করা। অর্থাৎ এমন যে-কোনও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা কষ্টদায়ক। এই সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া সড়ক ব্যবহার জায়েয নয়। সড়ক জনগণের যৌথ সম্পত্তি। কারও অসতর্কতার কারণে অন্যের জান-মালের ক্ষতি হলে শরী'আতে তার দায়-দায়িত্ব সে ব্যক্তির উপরে বর্তায়। কাজেই জনপথ ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

চিন্তা করে দেখুন, কোনও ব্যক্তি যদি সিগন্যাল অমান্য করে গাড়ি চালায় কিংবা এমন কোনও জায়গায় সে অন্য গাড়ি ওভারটেক করে, যেখানে তা করা নিষিদ্ধ ছিল, তবে আপাতদৃষ্টিতে কাজটি তো মামুলি পর্যায়ের অনিয়ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মামুলি অনিয়মের ভেতরও চারটি বড় গুনাহ নিহিত রয়েছে–

এক. আইন অমান্যকরণ ও সরকারের বৈধ হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ;

দুই. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ;

তিন. অন্যকে কষ্টদান ও

চার. সড়কের অবৈধ ব্যবহার।

আমরা দিবা-রাত্র নির্দ্বিধায় এসব গুনাহ নিজেদের আমলনামায় লেখাচ্ছি। একবারও চিন্তা করছি না আমাদের দ্বারা কতবড় গুনাহ হয়ে যাচ্ছে।

অনেক সময় একব্যক্তির অনিয়মের কারণে হাজারও ব্যক্তির পথচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণত, রাস্তার একাংশে কোনও কারণে পথচলা বন্ধ করে দেওয়া হল, এ অবস্থায় কিছু ত্বরাপ্রবণ লোক কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করার কষ্টটুকুও সহ্য না করে সড়কের অপর অংশ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল, যে অংশটি মূলত আগমনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট। এখন এই ত্বরাপ্রবণ লোকদের কারণে আগমনকারীদের গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস, গাড়ি যেতেও পারছে না, আসতেও পারছে না। মহা জট লেগে গেল। এ জাতীয় অনিয়ম মূলত পৃথিবীতে 'অশান্তি সৃষ্টি'-এর সংজ্ঞায় এসে যায়। এর ফলে শতশত মানুষকে কষ্ট-ক্লেশে ফেলার পাপ ওই ব্যক্তির উপর বর্তায়, যে ব্যক্তি উল্টোপথে গাড়ি চালিয়ে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

আমাদের দ্বীন আমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে এ দ্বীনে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। এমন শিক্ষাই আমাদেরকে আমাদের দ্বীন দিয়েছে, যা চির নবীন ও সদা সজীব। কিন্তু আমরা তা বোঝা ও শেখা এবং তার অনুসরণ করার পরিবর্তে দ্বীনকে কেবল মসজিদ-মাদরাসার চারদেয়ালে বন্দি করে ফেলেছি। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি এসব নীতিমালা অনুসরণ করে অন্ততপক্ষে নিজেদের বাহ্যিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করেছে, কিন্তু আমরা তা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের আখিরাতও বরবাদ করছি এবং দুনিয়াকেও নানারকম সমস্যা, সংকট ও অস্থিরতায় জর্জরিত করছি, সেই সংগে নিজেদের এসব দুষ্কর্ম দ্বারা ইসলামের অপূর্ব চেহারাকেও বিকৃত করছি।

অবশ্য এসব সমস্যার সমাধান কেবল দূর-দূরান্ত থেকে আলোচনা-পর্যালোচনা করার দ্বারাই হতে পারে না; বরং এর জন্য দরকার প্রত্যেকের আত্মসচেতনতা। প্রত্যেকে যখন আপন আপন স্থানে নিজ অন্তরকে জাগ্রত করবে, অন্যে কী করছে না করছে সেদিকে না তাকিয়ে অন্ততপক্ষে নিজেকে গুনাহ থেকে হেফাজত করবে এবং ইসলামের এই সোনালি নীতিমালার অনুসরণ শুরু করে দেবে, কেবল তখনই পরিস্থিতির বদল হতে পারে। পরিস্থিতির বদল সর্বদা ব্যক্তিবর্গের নিজ আমলের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। যখন একেক ব্যক্তি নিয়ম-নীতির অনুসরণ শুরু করে দেয়, তখন ক্রমান্বয়ে তার বিস্তার ঘটতে ঘটতে এক পর্যায়ে জাতীয় মেজায ও সামষ্টিক চরিত্রের রূপ গ্রহণ করে নেয়।

সূত্র : যিক্‌র ওয়া ফিক্‌র
৪ রবিউস-সানী, ১৪১৫ হিজরী
১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

নারী-স্বাধীনতার ধোঁকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থ : ‘নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।’[৪৫]

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আস্‌-সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে ‘পর্দার গুরুত্ব’। ইসলামী বিধানাবলীর আলোকে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্’র দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর জন্য পর্দার বিধান কী, এর গুরুত্ব কতটুকু এবং এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য কী তা তুলে ধরাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নারীর জন্য হিজাব ও পর্দা কেন জরুরি এবং তার বিধান কী, তা ততক্ষণ পর্যন্ত যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয় যতক্ষণ না এই তত্ত্বটি আমরা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হব। আর তা হচ্ছে– এই দুনিয়ায় নারীর আগমন এবং তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য নিরূপণ। আল্লাহ তা‘আলা নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কেন সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়ায় তাকে

---

৪৫. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

কেন পাঠিয়েছেন সেই তত্ত্ব ও রহস্য যদি আমরা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি, তাহলে পর্দা ও হিজাবের বিধান বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্রষ্টার কাছে জিজ্ঞেস কর

আজ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আগ্রাসনের ভেতর সর্বত্র অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, ইসলাম পর্দা ও নেকাবের ভেতর রেখে নারীর কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে, তাকে চার দেয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রোপাগাণ্ডা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফল এবং এটা নারীর সৃষ্টি ও তাকে দুনিয়ায় প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কারও যদি এ বিষয়ে ঈমান থাকে যে, আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই মানুষের মধ্যে কতককে পুরুষ এবং কতককে নারী বানিয়েছেন, তবে সে নিঃসন্দেহে নর ও নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে চাইবে এবং যেভাবেই হোক তা সে জেনে নেবে। হাঁ, আল্লাহ না করুন কারও যদি এই ঈমান না থাকে, তার কথা ভিন্ন। সে এ বিষয়ে জানার কোনও আগ্রহবোধ করবে না। বর্তমানকালে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, নাস্তিক্যবাদের ময়দানে অন্ধের মত ছুটে চলছে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এমন এমন নিদর্শন ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিচ্ছেন, যা দেখে তাদের অনেকের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিচ্ছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসই আসল জিনিস। যার সে বিশ্বাস নেই, তার সাথে আলোচনা সামনে এগুতে পারে না; বরং তার সংগে কথা চলতে পারে কেবল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বিশ্বাস সম্পর্কে, এর বাইরে নয়। আর যার সেই ঈমান আছে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কাউকে পুরুষ এবং কাউকে নারী বানিয়েছেন, সে আরও সামনে চলতে চাইবে। তারই জানার আগ্রহবোধ হবে যে, তিনি মানুষকে এভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কেন করেছেন। এই কৌতূহল নিবারণের জন্য সে কেবল আল্লাহ তা'আলারই শরণাপন্ন হবে। তাঁরই কাছে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কাউকে পুরুষ এবং কাউকে নারী কেন বানিয়েছেন।

পুরুষ ও নারী ভিন্ন দুই শ্রেণী

আজ উচ্চরবে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে– 'নর-নারীর ভেদাভেদ মানি না', 'নারীকেও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে', 'একই সাথে তাদেরকে

কাজ করতে দিতে হবে'। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সমগ্রবিশ্বে এই শ্লোগানকে চালু করে দিয়েছে। কিন্তু তারা লক্ষ করে দেখছে না, নর-নারীকে যদি একই রকমের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তবে দৈহিকভাবে উভয়কে আলাদা করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন কি ছিল। পুরুষের দেহ-কাঠামো এক রকম, নারীর অন্য রকম। পুরুষের মন-মেজায নারীর মন-মেজায থেকে আলাদা। পুরুষ ও নারীর যোগ্যতায় রয়েছে পার্থক্য। আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীকে এমনভাবে বানিয়েছেন যে, উভয়ের আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কাজেই 'পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোনও রকমের পার্থক্য নেই'– এ কথা বলাটাস্বভাব-প্রকৃতিরসাথে বিদ্রোহ করারই নামান্তর এবং এটা বাস্তব সত্যেরও অপলাপ। কেননা নর-নারীর গঠন-প্রকৃতি যে সম্পূর্ণ পৃথক, এটা তো চাক্ষুষ বিষয়। আধুনিক ফ্যাশন নর-নারীর এই স্বভাবগত পার্থক্যকে মেটানোর জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন, তা কখনও সফল হওয়ার নয়। আজকাল নারীরা পুরুষদের মত পোষাক পরা শুরু করে দিয়েছে। অনেক পুরুষও নারীদের পোশাক-আশাক গ্রহণ করছে। নারীরা পুরুষদের মত চুল কাটছে আর পুরুষ নারীর ফ্যাশনে চুল রাখছে। কিন্তু তা যতই করুক না কেন, আজও পর্যন্ত কারও পক্ষে এই সত্য অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না যে, নর-নারীর দৈহিক গঠন-কাঠামোতে অনেক পার্থক্য,উভয়ে ভিন্ন শ্রেণীর, উভয়ের চিন্তা-ভাবনা আলাদা, স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্ন এবং যোগ্যতা ও ক্ষমতাও স্বতন্ত্র।

আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে জানার মাধ্যম

প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন এবং নারীকে বানিয়েছেন কী উদ্দেশ্যে, এটা কিভাবে জানা যাবে? উত্তর তো এটাই হবে যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এর উত্তর তাঁর কাছেই আছে। কাজেই তাকেই জিজ্ঞেস কর– আপনি পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন কী উদ্দেশ্যে এবং নারী সৃষ্টির দ্বারা আপনার লক্ষ কী? কিন্তু এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? তাঁর সংগে সরাসরি যোগাযোগ করা তো কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব না। তা যখন সম্ভব নয়, তখন মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কি অনবহিতই থেকে যাবে? না, এর জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলের ধারা চালু করেছেন। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রয়োজনীয় সব প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করেছেন। সেই ধারার সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছেন খাতামুল-আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মানব-জীবনের দু'টি শাখা

কুরআন মাজীদের শিক্ষা ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তা'লীম দ্বারাই মানুষের পক্ষে তার যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান লাভ করা সম্ভব। সেই শিক্ষা অনুযায়ী সন্দেহাতীতভাবে আমরা জানতে পারি মানুষের জীবন মৌলিকভাবে পৃথক দুই শাখায় বিভক্ত। তার একটি শাখা ঘরের ভেতর এবং আরেকটি শাখা ঘরের বাইরে। এই উভয় শাখা একটি অন্যটির সম্পূরক। উভয়টিকে একসঙ্গে গ্রহণ ছাড়া মানুষের পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন কিছুতেই সম্ভব নয়। ঘরের ভেতরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও মানুষের জন্য জরুরি এবং ঘরের বাইরের ব্যবস্থাপনাও তার জন্য সমান জরুরি। যখন উভয় কাজ আপন-আপন স্থানে যথাযথভাবে চলবে, তখনই মানুষের জীবন সুষ্ঠু ও সুচারু হবে। যদি এর কোনও একটি ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ে বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে তাতে মানব-জীবনের কেবল একটা শাখাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; বরং তার গোটা জীবনের ভারসাম্য (Balance) নষ্ট হয়ে যাবে।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে কর্মবণ্টন

আল্লাহ তা'আলা উভয় শাখার মধ্যে মানুষের কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। পুরুষের দায়িত্বে ন্যস্ত রেখেছেন ঘরের বাইরের কাজ, যেমন জীবিকা উপার্জন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি। বাইরের এসব কাজ সামাল দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষের। আর ঘরের ভেতরের শাখাটিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের উপর অর্পণ করেছেন। তারাই এটা সামাল দেবে। বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করা মানুষের অবশ্যকর্তব্য। তিনি যাকে যে কাজের হুকুম করেন সে তা মানতে বাধ্য। তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই আদেশ আসত যে, নারী করবে ঘরের বাইরের কাজ আর পুরুষ করবে ভেতরের কাজ, তবে তাতেও কারও প্রশ্ন করার কোনও অধিকার থাকত না। বিনাবাক্যে তা মেনে নিতে হত। কিন্তু তিনি তা না করে বর্তমান যে ব্যবস্থা দান করেছেন, তা কেবল এ কারণেই দান করেছেন যে, এটাই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। কারণ এটাই স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল। মানুষ যদি তার বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে তার স্বভাব-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখে, তবে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান যে ব্যবস্থা দান করেছেন সেটাকেই তার যথার্থ মনে হবে। সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই বাধ্য হবে যে, পুরুষ করবে বাইরের কাজ এবং নারী করবে ভেতরের কাজ।

কেননা নারী ও পুরুষের মধ্যে তুলনা করে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দৈহিক শক্তি নারী অপেক্ষা পুরুষের অনেক বেশি। এটা একটা বাস্তবতা, যা অস্বীকার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। অপরদিকে ঘরের বাইরের কাজগুলো এমন, যা সম্পাদন শক্তিসাপেক্ষ। বাইরের প্রতিটি কাজই শক্তি ও শ্রমের দাবি রাখে। মেহনত ও পরিশ্রম ছাড়া সেসব কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা পুরুষের ভেতর যে বাড়তি শক্তি নিহিত রেখেছেন তার দাবি এটাই যে, বাইরের শক্তিসাপেক্ষ কাজ সেই আঞ্জাম দেবে আর ঘরের ভেতরের কাজ নারীর উপর অর্পিত থাকবে।

ঘরের ব্যবস্থাপনা নারীর দায়িত্বে

আলোচনার শুরুতে যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তাতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি সম্বোধন করেছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহিয়সী স্ত্রীগণকে। অতঃপর এতে প্রদত্ত বিধান তাদের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম নারীর উপরও বর্তায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

অর্থ : 'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।'

এ আয়াতে কেবল এতটুকুই বলা হয়নি যে, তোমরা বিনা প্রয়োজনে বাইরে যেও না এবং তা যাওয়া উচিত নয়; বরং এতে একটি মৌলিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে–

"আমি নারীকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, সে স্বস্তির সাথে ঘরের ভেতর থাকবে, ঘরই হবে তার অবস্থানস্থল এবং ঘরের ভেতর থেকে সে অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম আঞ্জাম দেবে।"

হযরত 'আলী (রাযি.) ও হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মধ্যে কর্মবণ্টন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের কন্যা হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা (রাযি.) ও জামাতা হযরত 'আলী (রাযি.) জগতের এক শ্রেষ্ঠ দম্পতি। তাদের মধ্যেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই কর্মবণ্টন করে দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী হযরত 'আলী (রাযি.) ঘরের বাইরের কাজ আঞ্জাম দিতেন এবং হযরত ফাতিমা (রাযি.) ভেতরের কাজ সামলাতেন। তিনি ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং চাক্কি চালিয়ে আটা পিষতেন।

কুয়া থেকে পানি তোলা ও রান্নাবান্না করার কাজ তিনিই সামলাতেন। বলাবাহুল্য তারাই তো হবেন জগতের সমস্ত নারী-পুরুষের আদর্শ।

নারীকে কী উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে টেনে আনা হচ্ছে

যে পরিবেশে সামাজিক শুদ্ধতার কোনও মূল্য নেই, যেখানে চরিত্র ও নৈতিকতার পরিবর্তে চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতাকে পরম লক্ষ মনে করা হয়, বলা বাহুল্য সেখানে এই কর্মবন্টন এবং পর্দা ও শালীনতাকে কেবল অপ্রয়োজনীয়ই মনে করা হবে না; বরং পথের বাধা গণ্য করা হবে। সুতরাং পাশ্চাত্যে যখন নীতি-নৈতিকতার মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেল এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও ইন্দ্রিয়পরবশতা সেই জায়গা দখল করে নিল, তখন পুরুষ মনে করল নারীর আর ঘরের ভেতর থাকার প্রয়োজন নেই; বরং তার গৃহে অবস্থানকে নিজের জন্য ডবল মসিবত মনে করল। একদিকে তার লোভাতুর স্বভাব নারীর কোনও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল; বরং পদে পদে তার দ্বারা নিজ মনোরঞ্জন ও আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠল, অন্যদিকে সে নিজের আইনসম্মত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বগ্রহণকেও বাড়তি বোঝা মনে করল। এই উভয় সংকট থেকে কিভাবে নিজেকে উদ্ধার করা যায়, পাশ্চাত্য তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পরিশেষে সে এর যে প্রতারণামূলক সমাধান বের করল, তারই চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুরনাম হল 'নারীমুক্তির আন্দোলন'। নারীকে সবক দেওয়া হল–তুমি এ যাবতকাল গৃহের চারদেয়ালে বন্দি ছিলে, এখন সে দেয়াল ভেঙে ফেলার দিন, এখন স্বাধীনতার যুগ চলছে, তোমাদের উচিত ওই বন্দিদশা থেকে বের হয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি শাখায় সমান অংশগ্রহণ করা। এ যাবত তোমাদেরকে রাষ্ট্র ও রাজনীতির অঙ্গন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এখন তোমাদের জন্য সে দ্বার উন্মোচিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা বাইরে চলে এসো। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অংশীদারিত্ব বুঝে নাও। দুনিয়ার বড়-বড় পদ তোমাদের হাতছানি দিচ্ছে এবং সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান তোমাদের অপেক্ষায় আছে।

বেচারী নারীর কাছে এসব হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান বড় মধুর মনে হল। তারা এতে প্রভাবিত হয়ে ঘরের বাইরে চলে আসল। তা আসবেই না বা কেন? এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সর্বপ্রকার প্রচারমাধ্যম দ্বারা চারদিকে হৈচৈ ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, যুগ-যুগান্তরের দাসত্ব শেষে আজ তাদের মুক্তিলাভ হতে যাচ্ছে, তাদের সকল দুঃখ-কষ্টের

অবসান হতে চলেছে।এসব মনভোলানো শ্লোগানের আড়ালে নারীকে ঘর থেকে টেনে-হেঁচড়ে রাস্তা-ঘাটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে অফিস-আদালতে কেরানি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর-পুরুষের প্রাইভেট সেক্রেটারি বানানো হয়েছে। তাকে স্টেনোগ্রাফার ও টাইপিস্ট-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের চমকবৃদ্ধির জন্য তাকে সেল্‌সগার্ল ও মডেলকন্যা হওয়ার সৌভাগ্যদান করা হয়েছে এবং তার একেকটি অঙ্গকে প্রকাশ্য বাজারে লাঞ্ছিত করে গ্রাহকদের আহ্বান জানানো হয়েছে যে, এসো আমাদের কাছ থেকে মাল কেন। এমনকি যে নারীর মাথায় স্বভাবধর্ম ইসলাম সম্মান ও মর্যাদার মুকুট স্থাপিত করেছিল, যার গলদেশে চরিত্র ও পবিত্রতার হার পরিয়ে দিয়েছিল, সেই নারী ব্যবসায়িক-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এক শোপিস ও পুরুষের ক্লান্তি নিবারণের এক বিনোদন-সামগ্রীতে পরিণত হয়ে গেল।

আজ নারীরই দায়িত্বে যত হীন-নিকৃষ্ট কাজ

নাম তো দেওয়া হয়েছিল 'নারীমুক্তির'। নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে তার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ খুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একটু পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন যে, সমাজের বৃহত্তর পরিসরে তার আসন ঠিক কতটা পাকাপোক্ত হয়েছে। এ যাবতকালে খোদ পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে কতজন নারী প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে? কতজনকে জজ-বিচারক বানানো হয়েছে? কতজন নারীর জন্য উচ্চতর পদের দুয়ার খোলা হয়েছে? গুণে দেখলে অনেক কষ্টে লাখের ভেতর হাতেগোনা কয়েকজন পাওয়া যাবে। এই গোনা-গুনতি কয়েকজন নারীকে উচ্চতর পদ দেওয়ার বাহানায় বাকি লাখ-লাখ নারীকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা কল-কারখানার শ্রমসাধ্য কাজে টেনে নামানো হয়েছে। বস্তুত এটা নারীমুক্তির নামে প্রতারণা মাত্র এবং এই প্রতারণার চিত্র বড়ই বেদনাদায়ক। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে দেখুন, জগতের যত নিম্নস্তরের কাজ তা কেবল নারীর কাঁধে অর্পিত। রেস্তোরাঁসমূহে পুরুষ-ওয়েটার নামমাত্র চোখে পড়বে। সর্বত্র এ কাজ নারীরাই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। হোটেলসমূহে পর্যটকদের কক্ষ নারীরাই পরিষ্কার করছে। তাদের চাদর-বিছানা বদলানোর কাজ তারাই আঞ্জাম দিচ্ছে। রুম-এটেন্ড্যান্ট হিসেবে নারীদেরকেই চোখে পড়বে। বিপণিবিতানসমূহে গিয়ে দেখুন যে, পুরুষ সেল্‌সম্যান ক'জন চোখে পড়ে? প্রতিটি দোকানে নারীদেরকেই এ কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অফিস-আদালতে রিসিপ্সনিস্টের কাজে সাধারণত নারীদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। বেয়ারা থেকে ক্লার্ক পর্যন্ত প্রতিটি পোস্টে

এই কোমল-নাজুক দেহের মানবীদেরকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। আর এভাবে তাদেরকে ঘরের বন্দিদশা থেকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করানো হচ্ছে।

আধুনিক সভ্যতার আজব দর্শন

প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার শক্তিতে এই আজব দর্শন আজ মানুষের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নারী যদি নিজ ঘরে বাবা-মা ও স্বামী-সন্তানের জন্য গৃহস্থালির কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়, তবে সেটা তার জন্য পরাধীনতা এবং লাঞ্ছনার বিষয়। নারী কেন এভাবে পরাধীন ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে? অথচ এই নারীই যদি পর-পুরুষদের জন্য খাবার তৈরি করে, কামরা পরিষ্কার করে, হোটেল ও জাহাজে খাদ্য পরিবেশন করে, বিপণিবিতানে মুচকি হেসে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে, অফিস-আদালতে অফিসারদের মনোরঞ্জন করে, তবে তাতে তাদের মান-সম্মান নষ্ট হয় না; বরং এটাকেই তারা তাদের জন্য সম্মানজনক গণ্য করছে এবং এভাবে তারা নিজেদের মুক্ত-স্বাধীন বলে গর্ববোধ করছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

তদুপরি নির্মম পরিহাসের কথা হল, জীবিকা উপার্জনের আট-আট ঘন্টাব্যাপী এই কঠিন ও অবমাননাকর ডিউটি আদায় করা সত্ত্বেও নারী তার নিজ ঘরের কাজকর্ম থেকে অদ্যাবধি মুক্তি পায়নি। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম আজও আগের মতই তাকেই আঞ্জাম দিতে হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ নারীকে অদ্যাপি আট ঘন্টার ডিউটি আদায়ের পর নিজ ঘরে এসে রান্নাবান্না, হাড়িপাতিল ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদিকাজকর্ম করতে হচ্ছে। তাহলে কিসের মুক্তি তার লাভ হল? আগেকার কাজের চাপ যথারীতি তার মাথায় তো রয়েছেই, তার উপর মুক্তির নামে অতিরিক্ত কাজের বোঝা তার উপর চাপানো হল।

জনসংখ্যার অর্ধেক কি কর্মহীন জীবনযাপন করছে

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তারা যেহেতু ঘরের ভেতর গৃহস্থালিকাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে, তাই তাদেরকে ঘরের বাইরে টেনে আনার জন্য আজকাল একটা চালু যুক্তি এই পেশ করা হয়ে থাকে যে, আমরা জনসংখ্যার অর্ধেককে কর্মহীন রেখে জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারব না এবং তাদেরকে যদি বাইরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে উন্নতির চাকা অনেক বেশি বেগবান হতে পারে। এ কথাটি যে ঢঙে বলা হয় তাতে অনুমিত হয়, যেন দেশের সমস্ত পুরুষকে কোনও না কোনও কাজে লাগিয়ে পুরুষদের

পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে অনুপাতে জাতীয় আয়-উপার্জনের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়ে গেছে। এখন কোনও বেকার পুরুষ তো দেশে নেই; বরং হাজারও কাজ এমন রয়ে গেছে, যা বাড়তি ম্যানপাওয়ারের অপেক্ষায় আছে।

অথচ এসব কথা এমন এক দেশে বলা হচ্ছে, যে দেশে উঁচু যোগ্যতাসম্পন্ন হাজারও পুরুষ পথে পথে জুতা ক্ষয় করে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোনও চাপড়াশি বা ড্রাইভার পদেও লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলে সেজন্য অসংখ্য গ্রাজুয়েট পর্যন্ত দরখাস্ত পেশ করে থাকে। আর কোনও ক্লার্কের পদ খালি হলে তো সেজন্য মাস্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের পর্যন্ত শতশত দরখাস্ত পড়ে যায়। আমাদের নিবেদন– জাতীয় উন্নয়নের কাজে প্রথমে দেশের পুরুষ নাগরিকদেরকে, যারা কিনা সর্বমোট জনসংখ্যার অর্ধেক, পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে দিন। তারপর অবশিষ্ট অর্ধেককে নিয়ে চিন্তা করুন যে, তারা কর্মহীন কিনা।

আজ 'ফ্যামিলি সিস্টেম' ধ্বংসের পথে

আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে ঘরের যিম্মাদার বানিয়েছেন। তারা ঘরের ব্যবস্থাপক। ফ্যামিলি সিস্টেম পাকাপোক্ত রাখার জন্যই তাদের উপরে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন ঘরের বাইরে এসে গেল, তখন সেই সিস্টেমে ভাঙন ধরল। কেননা পরিবারের বাবাও বাইরে, মা'ও বাইরে, বাচ্চারা স্কুলে বা নার্সারিতে, ব্যস ঘর শূন্য। দরজায় তালা। এ অবস্থায় পরিবার-ব্যবস্থা থাকে কি করে? নারীকে তো এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তাকে কেন্দ্র করে গোটা পরিবার আবর্তিত হবে, সে ঘরের শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এবং শিশুরা তার কোলে প্রতিপালিত হবে। মায়ের কোলই তো শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। সেখান থেকেই সে আখলাক-চরিত্র শেখে, সেখানেই আদব-কায়দা শেখে এবং সেখানেই জীবনযাপনের সঠিক রীতিনীতি শেখে। কিন্তু আজ পশ্চিমা সমাজে ফ্যামিলি সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে শিশুরা মা-বাবার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত। কি করেই বা তারা স্নেহ-মমতা পাবে, যখন মা এক জায়গায় কাজ করছে এবং বাবা অন্য জায়গায়? স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সারাদিনও কোনও সাক্ষাত হয় না। পরস্পরে কোনও যোগাযোগ থাকে না। উভয় স্থানে মুক্ত সমাজের পরিবেশ। এর ফলে অনেক সময় পারস্পরিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। তাতে ভাঙন ধরে। বৈধ সম্পর্কের স্থানে অবৈধ সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়। ব্যাপারটা শেষমেশ বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। আর এভাবে ঘর-সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

নারী সম্পর্কে গর্বাচভের দৃষ্টিভঙ্গি

এ কথা যদি কেবল আমিই বলতাম, তবে কেউ বলতে পারত– এসব আপনাদের গোঁড়ামি, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি থেকে এসব কথা বলছেন। কিন্তু না, এ কথা কেবল আমিই বলছি না। আধুনিক মানুষ যাদেরকে জ্ঞানী মনে করে, যাদেরকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখে, এ জাতীয় কথা আজ তাদের মুখ থেকেও শোনা যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট 'মিখাইল গর্বাচভ'-এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। বছর কয়েক আগে তিনি 'প্রস্ত্রয়কা' নামে একখানি বই লিখেছেন। আজ সারা বিশ্বে এ বই প্রসিদ্ধ। গর্বাচভ তার এ গ্রন্থে Status Of Women – নামে স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন–

> "আমাদের পশ্চিমা সমাজে নারীদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসার ফলে নিশ্চয়ই আমরা কিছু অর্থনৈতিক উপকার লাভ করেছি। উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেহেতু পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও এর এক অপরিহার্য পরিণাম এই দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের ফ্যামিলি সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। ফ্যামিলি সিস্টেম ধ্বংস হওয়ার পরিণতিতে এত বেশি ক্ষতির স্বীকার আমাদেরকে হতে হয়েছে যে, সেই ক্ষতির বিপরীতে উৎপাদনগত যে প্রবৃদ্ধি আমরা লাভ করেছি তা কোনও তুলনায় আসে না। সুতরাং আমি আমাদের দেশে 'প্রস্ত্রয়কা' নামে যে আন্দোলন শুরু করেছি তাতে এ বিষয়টাও নজরে রাখা হয়েছে। তাতে আমার এক মূল উদ্দেশ্য এই-ও, যে নারীকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে তাকে আবার কিভাবে ঘরে ফিরিয়ে আনা যায় তার পথ খোঁজা। আমাদেরকে এর উপায় সন্ধান করতে হবে। এ নিয়ে ভাবতে হবে। অন্যথায় যেভাবে আমাদের ফ্যামিলি সিস্টেম ধ্বংস হয়েছে, একইভাবে আমাদের গোটা জাতিও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এসব কথা মিখাইল গর্বাচভ তার বইতে লিখেছেন। বইটি এখনও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যার ইচ্ছা দেখে নিতে পারেন।

টাকা-পয়সার হাকীকত

ফ্যামিলি সিস্টেম ধ্বংস করার এই যে কার্যক্রম, এর মূল কারণ হল আমরা নারী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। আমরা জানি না নারীদেরকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সে ঘরের ব্যবস্থাপনা সামলাবে এবং ফ্যামিলি সিস্টেমকে সুদৃঢ় করবে। কেননা মানব-সভ্যতার সুরক্ষার জন্য সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর ফ্যামিলি সিস্টেমকে রক্ষা করা অপরিহার্য। কিন্তু আজ সেদিকে লক্ষ করা হচ্ছে না। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় টাকা-পয়সা অর্জনই মূল কথা। সকল চিন্তা, চেষ্টা ও দৌড়ঝাঁপ টাকা-পয়সা অর্জনের জন্যই করা হচ্ছে। কিন্তু একটু বলুন তো, এ টাকা-পয়সা কি স্বয়ং কারও কোনও উপকার করতে পারে? আপনার যদি ক্ষুধা লাগে এবং পকেটে টাকা-পয়সাও থাকে, তবে সেই টাকা-পয়সা চিবিয়ে খেলে কি ক্ষুধা মিটবে? তা কি আদৌ খাওয়া যাবে? বলাবাহুল্য তা খাওয়াও যাবে না আর ক্ষুধাও মিটবে না। এর দ্বারা বোঝা গেল টাকা-পয়সা স্বয়ং কোনও বস্তুই নয়; বরং এটা প্রয়োজন মেটানোর একটা অবলম্বন মাত্র। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কোনও কাজের জিনিসই নয়।

আজকের লাভজনক কারবার

কিছুদিন আগে কোনও এক পত্রিকায় একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা লাভজনক কারবার কি তা দেখানো। জরিপের রিপোর্টে লেখা হয়েছে— আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা হল 'মডেল কন্যা'-এর কাজ। কেননা মডেল কন্যা অন্যের পণ্যের বিজ্ঞপ্তিদানের বিনিময়ে তার যে নগ্নরূপ প্রদর্শন করে থাকে, তাতে করে সে রোজ পঁচিশ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আয় করে থাকে। আর সেই একদিনে ব্যবসায়ী ও পুঁজি-মালিক নিজ মর্জিমত সেই মডেল কন্যার যতগুলো ছবি যে ঢঙে যে ভঙ্গিতে নেওয়ার ইচ্ছা তা নিয়ে নেয়। আর এর মাধ্যমে সে নিজ পণ্য বাজারে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে সেই নারী 'মডেল কন্যা' হওয়ার নামে মূলত নিজেকেই 'বিক্রয়পণ্য'-তে পরিণত করে ফেলে এবং পুঁজি মালিক তাকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে থাকে। নারীর এই পরিণতি তো কেবল এ কারণেই যে, সে তার আপন ভুবন ছেড়ে দিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে সে নিজের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য বরবাদ করেছে। সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিগতভাবে তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, ঘরের

বাইরে এসে সে তার সেই মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। তারই পরিণাম হল তার আজকের এই ভোগ্যপণ্যতে পরিণত হওয়া।

জনৈক ইহুদীর শিক্ষাদায়ী ঘটনা

জনৈক বুযুর্গ একটি ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটির সারমর্ম এরকম–

"অতীতকালে এক ইহুদী অনেক বড় ধনী ছিল। প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক ছিল। সেকালে নিয়ম ছিল যাদের প্রচুর টাকা-পয়সা থাকত, তারা মাটির নিচে কক্ষ বানিয়ে তাতে অর্থকড়ি সঞ্চয় করে রাখত। ওই ইহুদীও তার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে প্রচুর সোনাদানা জমা করে রেখেছিল। যেমন কারূন সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, সে বিশাল ধনভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। একবার ওই ইহুদী গোপনে তার ধনভাণ্ডার পরিদর্শন করতে গেল। কাজটা সে এতই গোপনীয়ভাবে করেছিল যে, ধনাগারের পাহারাদারকে পর্যন্ত অবগত করেনি। কেননা পাহারাদার কোনও খেয়ানত করে কিনা, তা দেখাও তার এই পরিদর্শনের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার সেই ধনাগারের দরজার ব্যবস্থাপনা ছিল এরকম যে, সেটি ভেতর থেকে বন্ধ তো করা যেত কিন্তু খোলা যেত না, খোলা যেত কেবল বাহির থেকেই। ইহুদী লোকটি গোপনে সেখানে প্রবেশ করার পর বে-খেয়ালিতে দরজাটি বন্ধ করে ফেলল। এখন আর সেটি খোলার কোনও উপায় ছিল না। অন্যদিকে সে যে ভেতর প্রবেশ করছে, পাহারাদারের তো সে কথা জানা ছিল না। ব্যস সে তো জানে ধনাগার বন্ধ রয়েছে। তার কল্পনায়ও ছিল না যে, মালিক তার ভেতরে। তো তার কল্পনার বাইরেই মালিক ভেতরে ধনাগার পরিদর্শন করতে থাকল, কোথায় কি সম্পদ রাখা আছে খুঁজে-খুঁজে দেখতে লাগল। এভাবে সবকিছু দেখভাল করার পর যখন নিশ্চিত হল যে, তার রক্ষিত মালামাল সব ঠিকই আছে, তারপর নিশ্চিত মনে দরজার পথ ধরল। যেই না দরজার হাতল ধরে টান দিল, দেখল সেটি বন্ধ। কোনওক্রমেই সে সেটি খুলতে পারল না, খোলার কোনও উপায়ই ছিল না। এভাবে সে নিজ ধনাগারে বন্দি হয়ে গেল। সময় গড়াচ্ছে, নানা ফন্দি-ফিকির করছে, কিন্তু কিছুতেই বের হওয়ার উপায় খুঁজে পেল না। এদিকে তার ক্ষুধা লেগে গেল। ক্রমে ক্ষুধা বাড়তেই থাকল। ধনাগারে সোনা-রূপার তো কোনও অভাব নেই, রাশি-রাশি টাকা-পয়সা সামনে পড়ে আছে, কিন্তু তা দিয়ে তো ক্ষুধা মিটবে না।

প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। সোনাদানায় তো পিপাসাও মিটবে না। রাতের বেলা ঘুম এসে গেছে। বিশাল তার ধনাগার, কিন্তু বিশ্রামের তো ব্যবস্থা নেই। সোনাদানা তো বিছানার কাজ দেবে না। তাছাড়া প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে ঘুমানো তো সম্ভব নয়। তার তো জীবনের শঙ্কা। এ অবস্থায় চাইলেও ঘুমানো যায় না। মোটকথা এভাবে তার সময় গড়াতে থাকল আর পানাহার ছাড়া যতদিন বাঁচা সম্ভব বাঁচল। পরিশেষে সেই সাধের ধনাগারের ভেতর তার মৃত্যু হয়ে গেল।"

তো এই হচ্ছে টাকা-পয়সার স্বরূপ। এটা স্বয়ং মানুষের কোনও উপকার দিতে পারে না। এর দ্বারা উপকার লাভ হতে পারে কেবল তখনই, যখন এর ব্যবস্থাপনা সঠিক হবে এবং সঠিক পন্থায় এর দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা হবে।

গাণিতিক বৃদ্ধিই বড় কথা নয়

আজ সারা জগত বলছে– নারীর এখন আর ঘরের মধ্যে থাকার দিন নেই। তাকে ঘরের বাইরে আসতে হবে। তারা বাইরে আসলে ওয়ার্কারের অভাব মিটবে। ফলে প্রোডাক্শন বাড়বে। প্রোডাক্শন বাড়লে উপার্জন বাড়বে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উন্নতি হবে। এতটুকু কথা তো সত্য যে, গাণিতিক দৃষ্টিতে সম্পদ বাড়বে, কিন্তু সম্পদ বাড়াই তো শেষকথা নয়। সম্পদ বাড়লেই জাতীয় উন্নতি হয় না। জাতীয় উন্নতির রহস্য মূলত পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। সম্পদ বাড়াতে গিয়ে যদি পারিবারিক কাঠামোই ভেঙে পড়ে, তবে তো জাতীয় উন্নতির রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই ক্ষতির তো কোনও প্রতিকার নেই। এ অবস্থায় সম্পদ বৃদ্ধির সার্থকতা কী?

অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য কী

সুতরাং অর্থ-সম্পদের গাণিতিক বৃদ্ধিতে নজর আটকে রাখলেই চলবে না, অর্থোপার্জনের লক্ষ-উদ্দেশ্য কী সেদিকেও তাকাতে হবে। কুরআন মাজীদে যে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ

অর্থ : 'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।'

এতে আল্লাহ তা'আলা সে উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নারীদেরকে সৃষ্টি

করেছেন এই লক্ষে, যাতে তারা গৃহের অভ্যন্তরীণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ফ্যামিলি-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং নিজ ঘর-সংসার সামাল দেয়। মানুষ তার সবটা দৃষ্টিই ঘরের বাইরের দিকে রাখবে, বাইরের কাজেই সমস্ত শক্তি-শ্রম ব্যয়িত হবে আর ঘর থাকবে বিরান হয়ে, এভাবে তো জীবন চলতে পারে না। মানুষ বাইরে থেকে যা-কিছু আয়-উপার্জন করে তা তো কেবল এজন্যই করে যে, সে ঘরের ভেতর এসে মনের শান্তি পাবে। কিন্তু ঘরের শান্তি যদি নষ্ট হয়ে যায়, ঘর-সংসারের কোনও শান্তি-শৃংখলাই যদি বাকি না থাকে, তবে বাইরে সে যা-কিছুই রোজগার করল তার কোনও সার্থকতা নেই। তার সবটা চেষ্টাই বৃথা। সব উপার্জন অর্থহীন।

শিশুর জন্য মায়ের মমতা অপরিহার্য

সুতরাং পারিবারিক ব্যবস্থাকে মজবুত করা, শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা এবং সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম নারীকে ঘরমুখো হতে হবে। কেননা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এসব দায়িত্ব নারীর উপরই অর্পিত হয়েছে। এজন্যই তো বাচ্চা পিতামাতা উভয়ের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা মায়ের অন্তরে যতটা মায়া-মমতা নিহিত রেখেছেন, পিতার অন্তরে অতটা রাখেননি। শিশুও তার মা'কে যতটা ভালোবাসে, মায়ের প্রতি তার মনের যতটা টান, অতটা বাবার প্রতি থাকে না। শিশু যদি কোনও আঘাত পায়, কোথাও কোনও কষ্টবোধ করে, তবে সে যেখানেই থাকুক না কেন সংগে সংগেই সে 'মা' বলে ডেকে ওঠে, বাবাকে কদাপি নয়। কী এর রহস্য? বস্তুত ওই অবোধ শিশুও জানে– আমার এই কষ্টের উপশম মায়ের দ্বারাই হতে পারে, মা'ই আমার পরম আশ্রয়। তাই সর্বপ্রথম সে তার এই পরম আশ্রয়কেই ডাকে। এই যে মহব্বতের শক্ত বন্ধন, এরই ভিত্তিতে শিশুর পরিচর্যার দায়িত্ব মায়ের উপর রাখা হয়েছে। কারণ তার যথাযথ পরিচর্যা তার পক্ষেই সম্ভব। এ ব্যাপারে মায়ের পক্ষে যেসব কাজ করা সম্ভব, বাবার পক্ষে তা কখনওই সম্ভব নয়। কোনও বাবা যদি মনে করে মায়ের সাহায্য ছাড়া আমি নিজেই শিশু লালন-পালন করব, তবে মনে সে যাই করুক না কেন, বাস্তবে এটা তার পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। কেউ চাইলে পরীক্ষা করে দেখুক।

আজকাল অনেকে তাদের শিশুদেরকে লালন-পালনের জন্য নার্সারির সাহায্য নেয় আর মনে করে তাদের প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে কোনও নার্সারিই শিশুকে মায়ের মমতা দান করতে পারে না। শিশুর জন্য পোল্ট্রিফার্ম জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠানের

প্রয়োজন নেই। তার তো দরকার মায়ের কোল। প্রয়োজন মাতৃস্নেহ। এই প্রয়োজন নার্সারি মেটাবে কী করে? মায়ের মমতা লাভের জন্য শিশুকে মায়ের কোলেই রাখতে হবে। এর জন্য অপরিহার্য 'পারিবারিক ব্যবস্থা'-কে অটুট রাখা এবং পারিবারিক অঙ্গনকেই নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র গণ্য করা। কোনও নারী যদি গৃহের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম না দেয়, বরং বাইরের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে সে যেন প্রকৃতির সংগেই বিদ্রোহ করছে। আর প্রকৃতির সংগে বিদ্রোহ করার পরিণতি কি দাঁড়ায় তা আজ আমরা চাক্ষুষ দেখছি।

বড়-বড় কীর্তির বুনিয়াদ গৃহে রচিত হয়

কুরআন মাজীদ চৌদ্দশ' বছর আগেই বলে দিয়েছে–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

অর্থ : 'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।'

অর্থাৎ হে নারী! ঘরই তোমার জীবন, ঘরই তোমার দুনিয়া ও আখিরাত। তুমি এ কথা মনে করো না যে, পুরুষ ঘর থেকে বাইরে গিয়ে বড়-বড় কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে আর আমি ঘরের ভেতর থেকে জীবন নষ্ট করছি, তাই বড়-বড় কাজ করার জন্য এবং নিজ জীবনকে কীর্তিময় করে তোলার জন্য আমাকেও ঘরের বাইরে যেতে হবে। কেন তুমি এমন ভাববে? এ ভাবনা সম্পূর্ণই স্থূল। তুমি চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, ঘরের ভেতরেই বড়-বড় কাজের বুনিয়াদ রচিত হয়। তুমি যদি সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন কর, তাদের অন্তরে ঈমানের বীজ বুনে দাও, তাদের ভেতর তাকওয়া ও সৎকর্মের চেতনা জন্মাও, তবে বিশ্বাস রাখ পুরুষ বাইরে গিয়ে যত বড়-বড় কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে সেই তুলনায় তোমার এ কাজ অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক বেশি মহিমাপূর্ণ। তুমি একটা শিশুকে দ্বীনী চেতনায় গড়ে তুলছ– এরচে' বড় কাজ আর কী হতে পারে?

পাশ্চাত্যের উল্টো প্রচারণা ও তার অন্ধ অনুকরণ আমাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। আমাদের নারীদের অন্তর থেকে সন্তানের দ্বীনী পরিচর্যা ও তাকে দ্বীনের আলোকে গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা উত্তরোত্তর খতম হয়ে যাচ্ছে। যেসব নারী নিজ গৃহে অবস্থান করছে তারাও এখন মাঝে-মাঝে চিন্তা করছে– সত্যিই ওসব লোক সঠিক কথা বলছে, বাস্তবিকই আমরা ঘরের চারদেয়ালে বন্দি হয়ে আছি, যেসব নারী ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করছে, সম্ভবত তারাই সঠিক পথ ধরেছে এবং তারাই দিন-দিন উন্নতি করছে।

প্রকৃতপক্ষে এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। ভালোভাবে বুঝে রাখ হে নারী! তুমি নিজ গৃহে থেকে যে কাজ আঞ্জাম দিচ্ছ তা অশেষ মূল্যবান। এর কোনও বিনিময় হতে পারে না। এ কাজ ঘরের বাইরে গিয়ে করা সম্ভব নয়। বাজারে গিয়ে বা দোকানে বসে এ কাজ করা যায় না। তোমরা ঘরে বসে যে কাজ করছ তার মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টা কর।

স্বস্তি ও শান্তি পর্দারই ভেতর

কোনও নারী যেন মনে না করে যে, পর্দা আমাদের জন্য একটা সমস্যা এবং তা আমাদের বহুবিধ সংকটের কারণ। কেন সে এ কথা ভাববে? পর্দা তো নারীর স্বভাবের ভেতরই নিহিত। নারীকে বলাই হয় 'আওরাত'। 'আওরাত মানে এমন জিনিস, যা ঢেকে রাখতে হয়। কাজেই পর্দার ভেতর থাকাটা নারীর প্রকৃতির দাবি। স্বভাব-প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেলে তার প্রতিকারের কোনও উপায় থাকে না। সেই বিকৃতি যাতে না ঘটে সেজন্য সচেতনতা জরুরি।

মনে রাখতে হবে, একজন নারীর পক্ষে পর্দার ভেতরে যে স্বস্তি ও শান্তি নিহিত আছে পর্দার বাইরে তা কোনও দিনই লাভ করা সম্ভব নয়। খোলামেলা থাকার দ্বারা শুধু অশান্তিই বাড়ে। তাতে মন-মানসিকতা বিপর্যস্ত হয় এবং শান্তি নষ্ট হয়। বেপর্দা চলার দ্বারা নারীর লাজুকতা ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ হায়া ও লজ্জাশীলতা একজন নারীর বরং একজন মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ। নারীর এই লাজুকতা রক্ষার জন্য পর্দার হেফাজত অপরিহার্য।

কিয়ামতের একটি আলামত

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের বহু আলামতের কথা বলে গেছেন। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি যেন নিজ চোখে এ অবস্থা দেখছিলেন। তিনি কিয়ামতের একটি আলামত বলেছেন এরকম–

"কিয়ামতের আগে এরকম নারীদের দেখা যাবে, যাদের মাথার চুল হবে কৃশকায় উটের কুঁজের মত।"[৪৬]

মাথার কেশবিন্যাস কিভাবে উটের কুঁজের মত হতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় এটা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। অথচ আজ সেটা বাস্তব। আজকাল নারীগণ এমনভাবে চুল বিন্যাস করে, যা ঠিক উটের কুঁজের মতই মনে হয়।

---

৪৬. মুসলিম, হাদীছ নং ৩৯৭১; আহমাদ, হাদীছ নং ৬৭৮৬

পোশাকের ভেতরও নগ্নতা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন–

"সেইসব নারী দৃশ্যত পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকবে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে থাকবে নগ্ন (অর্থাৎ তা দ্বারা পোশাকের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না)।"[৪৭]

কেননা সে পোশাক হবে অত্যন্ত পাতলা অথবা অতিরিক্ত আঁটসাঁট, যদ্দরুন শরীরের ভাঁজ ও উঁচু-নিচু প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পোশাক পরিহিত থাকা সত্ত্বেও যেন তার শরীর দৃশ্যমান হয়ে থাকবে। এসবই লজ্জা-শরম খতম হয়ে যাওয়ার পরিণাম। নিকট অতীতেও চিন্তাই করা যেত না যে, নারীগণ এ জাতীয় পোশাক পরিধান করবে। তাদের অন্তরে লজ্জাশীলতা ছিল। লজ্জাকে তারা চরিত্রের ভূষণ মনে করত। ফলে এ জাতীয় পোশাক পরিধান করা তারা পসন্দই করত না। কিন্তু আজ কী অবস্থা? বুক খোলা, গলা খোলা, বাহু খোলা– এ কেমন পোশাক? পোশাক তো ছিল সতর ঢাকার জন্য। পোশাক ছিল নারীকে তার আসল স্বভাবের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। অথচ আজ তারা এমন পোশাক পরছে, যা শরীর ঢাকছে না, আরও পরিস্ফুট করে তুলছে। এভাবে পোশাক আজ সতর ঢাকার পরিবর্তে সতর খোলার কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে।

অবাধ মেলামেশার যতসব অনুষ্ঠান

আজ চারদিকে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার অনুষ্ঠানাদি বেড়েই চলছে। সমাজের সর্বত্র এ জাতীয় অনুষ্ঠানের সয়লাব। এমন-এমন পরিবারেও আজকাল এরকম অনুষ্ঠান চোখে পড়ছে, যারা নিজেদেরকে দ্বীনদার বলে পরিচয় দেয়, যাদের পুরুষগণ মসজিদে প্রথম কাতারে নামায পড়ে, অথচ তারাও এই অবাধ মেলামেশার অনুষ্ঠান অবাধেই করে যাচ্ছে। তাদের বাড়িতে বিয়েশাদীর অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখুন সেখানে কী হচ্ছে? তারা কি এসব পরিহারের চেষ্টা আদৌ করছে? একটা সময় ছিল যখন এরকম অনুষ্ঠানের চিন্তাই করা যেত না। তখন কেউ ভাবতেই পারত না, বিয়েশাদীর অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করবে। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে কোনও রাখঢাক নেই। যে-কোনও অনুষ্ঠানেই নারী-পুরুষ একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করছে, কথাবার্তা বলছে। তাতে মেয়েরা সেজেগুজে আসে; বরং তাতে সাজগোজের প্রতিযোগিতা চলে। দামি অলংকার ও আকর্ষণীয়

---

৪৭. মুসলিম, হাদীছ নং ৩৯৭১; আহমাদ, হাদীছ নং ৬৭৮৬

বেশভূষায় পরিপাটি হয়ে তারা অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে। না পর্দার চিন্তা আছে, না লজ্জা-শরমের বালাই।

কেন এই নিরাপত্তাহীনতা

আজকাল এ জাতীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও ফিল্মও করা হচ্ছে। যাতে এ অনুষ্ঠানে যারা শরীক হয়নি এবং এর মনোহর দৃশ্য উপভোগ করতে পারেনি, তাদের জন্য এটা উপভোগ করার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। অতঃপর দেখা যাচ্ছে সকলে একত্র হয়ে সেই ভিডিও ফিল্ম দেখছে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারার দুঃখ কিছুটা হলেও মোচন করতে পারছে। এ সবকিছুই হচ্ছে, কিন্তু তারপরও তারা দ্বীনদার এবং নামাযী ও পরহেযগার। এই নির্লজ্জ কাজ-কারবার দেখেও তাদের কপালে একটুও ভাঁজ পড়ে না, মনে কোনও আক্ষেপ জাগে না। এমনকি এই অনুভূতি আছে বলেই মনে হয় না যে, তারা খারাপ কিছু করছে। সুতরাং সেই খারাপ মেটানোর আগ্রহ অন্তরে পয়দা হবে কিভাবে? বলুন তো এরপরও ফিতনা না এসে পারে কি? এরপরও অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা কেন দেখা দেবে না? আজ কারও জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা নেই। সর্বাবস্থায় সকলকেই কোনও না কোনও ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। কেনই বা তা থাকতে হবে না? পরিণাম তো আরও ভয়াবহ হওয়ার কথা ছিল। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রহমত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকত যে, সর্বগ্রাসী কোনও আযাব নাযিল হচ্ছে না,যদ্দরুন সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সমস্ত কাজকর্ম তো এমন, যার পরিণামে আল্লাহর আযাব ও গযবে সকলের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা।

আমরা নিজেদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করছি

এই যে বর্তমান সামাজিক অবস্থা, এটা আমাদের কৃতকর্মেরই ফল। প্রত্যেক ঘরের বড়রা চরম গাফলতির স্বীকার। তাদের অন্তর থেকে যেন অনুভূতি খতম হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলার নেই। অন্যায়-অপরাধ দেখেও কেউ টুকছে না। টোকার গরজও বোধ করছে না। নিজ সন্তান জাহান্নামের দিকে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু তার হাত ধরে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কোনও বাবার অন্তরে এই চিন্তা জাগছে না যে, আমি আমার সন্তানকে কোন্ গর্তে নিক্ষেপ করছি। দিন-রাত সবকিছুই চোখের সামনে হচ্ছে, কিন্তু দেখেও যেন

দেখছি না এবং দেখেও কিছু খারাপ লাগছে না; বরং কেউ যদি তাদেরকে বোঝাতে যায় তবে বড়রা জবাব দিয়ে দেয়– আরে ভাই এরা তো নওজোয়ান, এই বয়সে এসব করেই, তা করতে দাও, শুধু-শুধু এদের কাজে বাধা সৃষ্টি করো না। এভাবে সন্তানদের নষ্ট হওয়ার পথ খুলে রাখা হচ্ছে; বরং নষ্ট হওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান অবস্থা তারই পরিণাম।

এখনও সময় আছে

এখনও সময় হাত থেকে চলে যায়নি। এখনও যদি গৃহকর্তা বা ঘরের অভিভাবক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তবে পরিস্থিতির বদল সম্ভব। সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কয়েকটি কাজ করতে দেব না, আমাদের বাড়িতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হবে না, এমন কোনও অনুষ্ঠান আমরা করব না যাতে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করবে, নারীরা বেপর্দা চলাফেরা করবে বা পুরুষদের সংগে খোলামেলা বসে আড্ডা মারবে, এ জাতীয় কোনও কাজ আমরা হতে দেব না, আমাদের কোনও অনুষ্ঠানে ভিডিও ফিল্মের সুযোগ থাকবে না। অভিভাবক যদি এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে এ সয়লাব এখনও বন্ধ হতে পারে। পরিস্থিতি এখনও আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি, কিন্তু সতর্ক এখনই হওয়া দরকার,আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল। এমন দিন না এসে যায়, যখন কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী এই সুরতহাল বদলানোর চেষ্টা করবে কিন্তু সফল হবে না, 'তার কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না। যেসকল পরিবার নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করে, যারা দ্বীন ও ইসলামের নাম নেয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনের সংগে সম্পর্কও রাখে, অন্ততপক্ষে তারা তো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিক যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কোনও অনুষ্ঠান তারা করবে না।

এরূপ অনুষ্ঠান বয়কট করুন

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন বয়কট-জাতীয় কোনও পদ্ধতি শেখাননি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কখনও কখনও এরূপ পরিস্থিতিও সামনে এসে যায় যখন বয়কটের ফয়সালাও নিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, হয় আমাদের কথা শোনা হবে, নয়ত আমরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব না। বিবাহের অনুষ্ঠানে যদি এরূপ অবাধ মেলামেশা হয়ে থাকে এবং আপনি মনে করেন সে অনুষ্ঠানে না গেলে আত্মীয়-স্বজন অভিযোগ করবে এবং আপনি

কেন তাতে শরীক হলেন না সেজন্য আপনাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তবে সেই চিন্তায় যেন দমে না যান; বরং আপনি এভাবে বিষয়টাকে চিন্তা করুন যে, তাদের অভিযোগকে তো আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন কিন্তু আপনার অভিযোগকে তারা কোনও পাত্তাই দেয় না। আপনি যদি পর্দানশীন নারী হয়ে থাকেন আর আপনাকে তারা তাদের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে চায় এবং আপনি তাতে শরীক থাকুন সেই কামনাও করে, তবে আপনার জন্য তারা পর্দার ব্যবস্থা কেন করল না? তার মানে আপনার অনুভব-অনুভূতি ও আপনার চাল-চলন ও দ্বীনদারীর কোনও মূল্য তাদের কাছে নেই। তারা যখন আপনার দিকে এতটুকু লক্ষ রাখল না, তখন তাদের দিকে লক্ষ রাখার কোনও দায়ও আপনার উপর আসে না। কেনই বা আসবে, যখন তারা তাদের বেপর্দা অনুষ্ঠানে তাদের মত গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য আপনাকেও বাধ্য করতে চাচ্ছে? আপনি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন– এরূপ অনুষ্ঠানে আমি যেতে পারব না। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু সংখ্যক নারী এরূপ শক্ত অবস্থান গ্রহণ না করবে, মনে রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ সয়লাব ঠেকানো যাবে না। পরিস্থিতি বদল করতে চাইলে হিম্মতের সংগে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে। আপনি কতদিন পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে চলবেন? কতদিন পর্যন্ত নতিস্বীকার করে থাকবেন? চিন্তা করেছেন, এভাবে চলতে থাকলে এই সয়লাব আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

দুনিয়াদারদের কতদিন তোয়াজ করে চলবে

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী (রহ.) এক বিশিষ্ট নাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করুন– আমীন। তাঁর সময়ে এ দেশে যত বুযুর্গানে দ্বীনের জন্ম হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। হযরত মাওলানা (রহ.)-এরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁর ঘরে বসার ব্যবস্থা ছিল নিচে।

একবার তাঁর ঘরের মহিলাদের খেয়াল হল– সময় তো অনেক বদলে গেছে, এখন আর নিচে বসার কাল নেই, ঘরে ঘরে সোফার রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে, তাই আমাদের ঘরেও ব্যবস্থা বদলানো দরকার। সুতরাং তারা হযরত মাওলানা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, আপনি নিচে বসার এই পদ্ধতি বাদ দিয়ে দিন, অন্যদের মত আমাদের ঘরেও সোফা কিনে ফেলুন। হযরত মাওলানা (রহ.) বললেন, সোফার প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই, তাতে আমি আরামও পাই না, নিচে বসতেই আমার ভালো লাগে, কাজেই

এই ব্যবস্থাই থাকুক। মহিলারা বলল, আপনি না হয় আরাম পান কিন্তু দুনিয়ার লোকজনের প্রতিও তো একটু লক্ষ রাখা চাই, যারা আপনার সংগে সাক্ষাত করতে আসে তারা তো এতে অভ্যস্ত নয়, তাদের আরামটাও চিন্তা করা দরকার। এর উত্তরে হযরত মাওলানা (রহ.) যা বললেন তা স্মরণ রাখার মত। বললেন–

> "খুব ভালো বলেছ। দুনিয়ার লোকজনের প্রতি তো আমি লক্ষ রাখব কিন্তু বল তো তারা আমার প্রতি কতটা লক্ষ রাখে? আমার কারণে কি তাদের কেউ কোনও নিয়ম বদলিয়েছে? কেউ কি আমার কারণে তাদের কোনও কাজে পরিবর্তন এনেছে? তারা যখন আমার প্রতি লক্ষ রাখেনি, আমি কেন তাদের প্রতি লক্ষ রাখতে যাব?"

কে কী ভাবল তার পরওয়া করো না

যে তোমার পর্দাকে সম্মান করে না, তোমার পর্দার প্রতি যার কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই; বরং যে এটাকে পসন্দ করে না, সে কি মনে করল বা করল না তাতে তোমার কি আসে যায়। সে যখন তোমার কথা চিন্তা করছে না তখন তুমিও তার কথা চিন্তা করো না। তার ভালো-মন্দ লাগার কোনও পরওয়া করো না। মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা যেখানে করা হয়েছে, সেখানে যদি কোনও বেপর্দা নারী এসে বসে যায়, তাতে কি তার কোনও ক্ষতি আছে? নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে কোনও পর্দানশীন নারী যদি পুরুষদের সামনে চলে যায়, তাতে তার বিরাট ক্ষতি। সেই ক্ষতি তার পক্ষে মেনে নেওয়াই সম্ভব নয়। কাজেই এ অবস্থায় লক্ষ রাখা উচিত কার প্রতি? বেপর্দা নারীর প্রতি লক্ষ করে পর্দাহীন ব্যবস্থাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, নাকি পর্দানশীন নারীর সম্মানার্থে পৃথক ব্যবস্থা করাকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে? যারা এই মোটা কথাটাকেই বুঝতে চায় না, তাদের মনোভাবের কোনও পরওয়া করা তোমার আদৌ উচিত নয়। পর্দার ব্যবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও তারা খারাপ ভাববে এই চিন্তায় যদি তুমি তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান কর আর এভাবে তাদের খারাপ লাগাকে গুরুত্ব দিয়ে চল, তবে তা কতদিন চলবে? এভাবে চলতে গেলে তো এক পর্যায়ে তোমার দ্বীন ও ঈমানকেই বরবাদ করতে হবে। তারচে' তুমি এই পরিবেশ-পরিস্থিতির বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াও। তা দাঁড়াতে পারলে তুমি তোমার দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা যদি তোমার না-যাওয়াকে খারাপ মনে করে, তবে তোমারও তো খারাপ

মনে করার কিছু আছে! তারা তোমাকে এরকম অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে তোমাকে অপমান করছে, সেদিকটা কেন চিন্তা করছ না? আমাদের তো এভাবেই চিন্তা করা উচিত যে, যেই অনুষ্ঠানে পর্দার ব্যবস্থা নেই তারা আমাদেরকে সেখানে কেন দাওয়াত করবে? কেন তারা আমাদের অনুভব-অনুভূতিকে অসম্মান করবে? মনে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে রুখে না দাঁড়াবে, ততক্ষণ এই সয়লাব প্রতিহত করতে পারবে না।

বেপর্দা পুরুষদের বের করে দাও

যেসব অনুষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়, পুরুষদের জন্য আলাদা শামিয়ানা এবং মেয়েদের জন্যও আলাদা শামিয়ানার ব্যবস্থা থাকে, আজকাল দেখা যায় এক শ্রেণীর পুরুষ সেই ব্যবস্থাপনার মর্যাদা রক্ষা করে না। তারা অবাধে মহিলাদের শামিয়ানায় ঢুকে পড়ে। দেখা যায় তারা মহিলাদের সাথে কথা বলে, হাশি-তামাশা করে, ফূর্তি করে, ছবি তোলে, ভিডিও করে এবং এভাবে যা মনে চায় তাই করে। কোনও কিছুরই পরওয়া করে না। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হল? বাহ্যদৃষ্টিতে আলাদা ব্যবস্থা, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আলাদা থাকল কি? এরূপ ক্ষেত্রে মহিলাদেরই রুখে দাঁড়ানো উচিত। তাদের প্রতিবাদ করা উচিত। সোজা বলে দেওয়া উচিত তোমরা পুরুষরা এখানে কেন এসেছ? আমরা পর্দানশীন নারী, আমরা পর্দা রক্ষা করেই চলতে চাই, তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যাও। এভাবে সেখান থেকে পুরুষদেরকে বের করে দেওয়া উচিত।

দ্বীনের উপরে ডাকাতি হচ্ছে, তথাপি নীরবতা

আজকাল বিয়েশাদীতে অনেক কিছু নিয়েই ঝগড়া-ফাসাদ হয়। একেক জনের একেক রকম দাবি থাকে, একেক রকম চাহিদা। কেন তা পূরণ করা হয় না, তা নিয়ে হয় গণ্ডগোল। আমাদের এই কথা রাখা হল না, আমাদের এ দিকটা চিন্তা করা হল না, কেন আমাদের ওই কথা রাখা হল না– ব্যস এইসব হাবিজাবি নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। কথা কাটাকাটি, মন কষাকষি থেকে শুরু করে এক পর্যায়ে বিবাহই ভেঙে যায়। তো এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যখন ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে, তখন তোমরা পর্দানশীন নারীগণ নিজেদের পর্দা নিয়ে কেন অসন্তোষ প্রকাশ কর না? পসন্দমত অভ্যর্থনা করা না হলে ক্ষোভ প্রকাশ করছ অথচ পর্দা নিয়ে কোনও কথা বলছ না, এটা কেমন দ্বীনী চেতনা? দ্বীনের উপরে ডাকাতি করা হচ্ছে অথচ তোমরা নীরব বসে আছ।

এই নীরবতা আদৌ জায়েয নেই। ভরা মজলিসে দাঁড়িয়ে বলে দাও— তোমাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আমরা মানতে পারছি না, তোমরা এগুলো বন্ধ কর, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু নারী ও পুরুষ এরূপ হিম্মত প্রদর্শন না করবে, মনে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হায়া, তোমাদের পর্দা, তোমাদের দ্বীন কিছুই রক্ষা পাবে না; বরং এই সয়লাব বেড়েই চলবে।

নয়ত আযাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও

মোটকথা আমরা যারা দ্বীনের নাম নিয়ে থাকি, নিজেদেরকে দ্বীনদার ভাবতে পসন্দ করি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এই হিম্মত না করব এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে রুখে না দাঁড়াব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সয়লাব থামবে না। আল্লাহর দিকে তাকিয়ে এখনই সংকল্প করে ফেলুন। আর তা যদি করতে না পারেন, তবে আল্লাহর আযাবের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আল্লাহর আযাব সহ্য করার হিম্মত যদি কারও থাকে, তবে সে তার জন্য প্রস্তুত হোক। আর যাদের সেই হিম্মত নেই, তারা এখনই সতর্ক হোক। আল্লাহর আযাব সওয়া কার পক্ষে সম্ভব? তা যখন সম্ভব নয়, তখন পরিস্থিতির মোকাবেলায় আমাদেরকে দাঁড়াতেই হবে।

নিজের পরিবেশ নিজেই তৈরি করে নাও

আমার মহান পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (রহ.) অনেক মূল্যবান কথা বলতেন। তাঁর সব কথাই মনে রাখার মত। একবার তিনি বলছিলেন—

> "তোমরা বল পরিবেশ-পরিস্থিতি খারাপ। তা তোমরা নিজেদের পরিবেশ-পরিস্থিতি নিজেরাই কেন তৈরি করে নাও না? তোমাদের সম্পর্ক তো এমনসব লোকের সংগে হওয়া উচিত, নীতি-নৈতিকতায় যাদের সংগে তোমাদের মিল আছে। যাদের সংগে তোমাদের রীতি-নীতি মেলে না, যারা একপথে চলে আর তোমরা অন্যপথে, তাদের সংগে মেলামেশা করবে কেন? বরং তোমরা বন্ধু-বান্ধবের এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করে নাও, যারা দ্বীনী রীতি-নীতিতে একে অন্যের সহযোগিতা করবে। তোমাদের চলার পথে যারা প্রতিবন্ধক, তোমরা তাদের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে আন।"

অবাধ মেলামেশার কুফল

যাহোক ঘরই নারীর আসল জায়গা। সে ঘরের বাইরে চলে গেলে তাতে সে কেবল নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সে ক্ষতির স্বীকার হতে হয় সকলকেই। তার এক ক্ষতি তো এই যে, এতে 'ফ্যামিলি সিস্টেম' ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত এর ফলে চরিত্রের সর্বনাশ ঘটে। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে সৃষ্টিই করেছেন এমনভাবে যে, তাদের একের প্রতি অন্যজন আকর্ষণ বোধ করে। পুরুষের অন্তরে আছে নারীর আকর্ষণ এবং নারীর অন্তরে পুরুষের আকর্ষণ। এটা একটা স্বভাবগত ব্যাপার। আপনি এতে যতই বাধা সৃষ্টি করেন না কেন, সত্যিকথা হচ্ছে এ আকর্ষণ কোনও অবস্থাতেই নির্মূল করা সম্ভব নয়। তো এই আকর্ষণ নিয়ে যখন উভয়ে অবাধে মেলামেশা করবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, সর্বক্ষণ একে অন্যকে দেখবে, নিভৃতে আলাপচারিতার সুযোগ পাবে তখন সেই স্বভাবগত আকর্ষণ কোনও না কোনও অবস্থায় তাদেরকে পরস্পরের প্রতি প্রলুব্ধ করবেই এবং তার পরিণামে তারা নির্ঘাত গুনাহ'র প্রতি ধাবিত হবেই। আপনারা তো সেই সোসাইটিতেই বাস করছেন। নিজ চোখে দেখছেন নারী-পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা পরিস্থিতিকে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে। চারদিকে কী হচ্ছে তা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন। বিদ্যমান পরিবেশে কোনও নারী-পুরুষ যদি অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় কিংবা অবৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে চায়, তবে তার দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এমন কোনও আইন-কানুন নেই, যা তাদেরকে বাধা দিতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদের অবৈধ ইচ্ছা পূরণের সম্পূর্ণ অনুকূল। সামাজিক কোনও বাধাই তাদের সামনে নেই। কোনও রকম জোর-জবরদস্তিরও প্রয়োজন নেই। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সবরকম সুযোগ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্যদেশ আমেরিকায় জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা সারাবিশ্বে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘটছে। গতকালকের সংবাদপত্রে আমি পড়লাম, ও দেশে প্রতি সেকেণ্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এবার চিন্তা করুন, যে দেশে সেচ্ছায় ব্যভিচার করার অবাধ সুযোগ রয়েছে সে দেশেই এত বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে! তা এর কারণ কী?

কারণ এই যে, মানুষ তার স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরে চলে গেছে। প্রকৃতি তার জন্য যেই সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, সে তা ছিন্ন করে ফেলেছে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার কামেচ্ছা পূরণের জন্য প্রকৃতি নির্ধারিত পন্থা

অবলম্বন করবে এবং স্বভাবগত সীমারেখার ভেতরে অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার কামেচ্ছা পূরণের মাধ্যমে সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। যখন সে সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তখন তার কামেচ্ছা পূরণ কদাপি প্রশান্তি লাভের উপায় থাকবে না; বরং তা তার এক অপূরণীয় ক্ষুধা ও অনিবারণীয় পিপাসায় পরিণত হয়ে যাবে। তার সেই ক্ষুধা কোনও কিছুতেই মিটবে না। তার পিপাসা কোনও কিছু দ্বারাই নিবারণ হবে না। এ অবস্থায় মানুষ কোনও পরিমাণ ও কোনও সীমায় তৃপ্ত হতে পারে না; বরং তার ক্ষুধা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। সে হয়ে পড়ে এক রাক্ষুসে জন্তুর মত।

বস্তুত মানুষের এই পরিণতি নর-নারীর অবাধ মেলামেশারই কুফল। সেই কুফল আজ আপনারা নিজ চোখে দেখছেন। স্বভাবগত সীমানা ছিন্ন করলে এই কুফল ভোগ করতেই হবে। এ সীমানা তো আল্লাহ-নির্ধারিত। কাজেই এটা ছিন্ন করা একরকম বিদ্রোহ এবং আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা। আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট হুকুম হল–

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

অর্থ : 'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।'

আমরা এই হুকুম অমান্য করছি। আল্লাহর দেখানো পথ ছেড়ে অন্য পথের পথিক হয়ে গেছি। এর কুফল তো ভোগ করতেই হবে।

প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, নারীও তো মানুষই। কাজেই পুরুষের যেমন ঘরের বাইরে প্রয়োজন থাকে তেমনি কোনও প্রয়োজন নারীরও দেখা দিতে পারে। পুরুষের যেমন বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তেমনি ইচ্ছা তারও থাকবে বৈ কি। কারও তো আত্মীয়-স্বজনের সংগে দেখা-সাক্ষাত করার ইচ্ছা থাকবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যও অনেক সময় বাইরে যাওয়ার দরকার হয়। এমনকি কখনও কখনও বৈধ বিনোদনের জন্যও বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এখন নারীকে যদি ঘরের ভেতরেই থাকতে হয়, তাহলে এসব প্রয়োজন সে কিভাবে পূরণ করবে? কিভাবে সে তার এই বৈধ ইচ্ছা মেটাতে সক্ষম হবে? সুতরাং ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি তার থাকা উচিত।

এর উত্তর পরিষ্কার। নারীকে যে ঘরের ভেতরে থাকতে বলা হয়েছে, তার মানে এই নয় যে, তাকে ঘরের ভেতরে তালাবদ্ধ করে রাখা হবে এবং সর্বক্ষণ

সে ঘরের ভেতর বন্দি জীবনযাপন করবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে ঘর। সে অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে না। কোনও প্রয়োজনেও যে বাইরে যেতে পারবে না এমন কথা নেই; বরং প্রয়োজন দেখা দিলে ঘরের বাইরে অবশ্যই যেতে পারবে।

যদি কামাই-রোজগারের ব্যাপারটা চিন্তা করা হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কোনও কালেই রোজগারের দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করেনি। তার খরচাদির ভার পুরুষের দায়িত্বেই রাখা হয়েছে। বিবাহের আগে এ ভার বহন করবে তার পিতা এবং বিবাহের পর স্বামী। এটা তাদের দায়িত্ব। হাঁ যেই নারীর পিতা বা স্বামী নেই এবং তার ব্যয় নির্বাহের অন্য কোনও ব্যবস্থাও নেই, তার ব্যাপারটা ভিন্ন। তার কামাই-রোজগার করার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতেই পারে। আর এ অবস্থায় তার বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছেও। কেবল রোজগারের জন্যই নয়; বরং যেমনটা আমি পূর্বে বলেছি– বৈধ বিনোদনের জন্যও নারী ঘরের বাইরে যেতে পারে। সে অনুমতি তার জন্য আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পবিত্র মায়েদেরকে নিয়ে ঘরের বাইরে যেতেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-কে সংগে নিয়ে যে তিনি অনেকবার বাইরে গিয়েছেন এ কথা তো সকলেই জানে।

'আয়েশারও কি দাওয়াত

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একবার জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাড়িতে আপনার দাওয়াত। উত্তরে প্রিয়নবী বললেন–

أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟

'আয়েশাও কি আমার সংগে থাকবে?'

যমানাটা ছিল সরলতার। অকৃত্রিমতাই ছিল সে কালের বৈশিষ্ট্য। সাহাবী যখন দাওয়াত দিতে এসেছিলেন তখন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কথা তার মাথায় ছিল না। তাই পরিষ্কার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কেবল আপনাকেই দাওয়াত দিতে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাফ জবাব দিলেন–

إِذًا فَلَا

'তবে আমিও যাচ্ছি না।'

তো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাওয়াত কবুল করলেন না। সাহাবী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু তার তো মনে বড় আশা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত খাওয়াবেন, তাই আবারও আসলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও সেই প্রশ্ন করলেন–

أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟

'আয়েশাও কি আমার সংগে থাকবে?'

সাহাবী আগের উত্তরেরই পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কেবল আপনাকেই দাওয়াত দিতে এসেছি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাফ বলে দিলেন, তাহলে আমিও যাব না। এবারও সাহাবী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু তার তো মনে প্রচণ্ড আগ্রহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত খাওয়াবেন, তাই একই আবেদন নিয়ে তৃতীয়বার আসলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে দাওয়াত করতে এসেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফের সেই কথা বললেন–

أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟

'আয়েশাও কি আমার সংগে থাকবে?'

এবার সেই সাহাবীর চোখ খুলে গেছে। তিনি ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছেন আম্মাজানকে ছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত কবুল করার নন। সুতরাং তিনি উত্তর দিলেন–

نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ

'জি, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ!, আপনার সাথে 'আয়েশা (রাযি.)-এরও দাওয়াত।'

এবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

اِذًا فَنَعَمْ

'তবে আমি দাওয়াত কবুল করলাম।'

কেন এই পীড়াপীড়ি

প্রশ্ন হচ্ছে, আম্মাজানকে দাওয়াত দেওয়ানোর জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত পীড়াপীড়ি কেন করলেন? হাদীছের বর্ণনায় তো এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু নেই, তবে 'উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের সাধারণ নিয়ম ছিল না যে, কেউ দাওয়াত দিলে হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-কেও সংগে নিয়ে যাওয়ার শর্তারোপ করতেন; বরং সাধারণত কেউ তাকে দাওয়াত দিলে তিনি তা কবুল করে নিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম করলেন তার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, যেই সাহাবী তাকে দাওয়াত করেছিলেন তার প্রতি আম্মাজানের মনে কোনও কারণে অপ্রসন্নতা ছিল। তিনি তার সেই অপ্রসন্নতা দূর করতে চাচ্ছিলেন আর সে কারণেই তাকে দাওয়াত দেওয়ানোর জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করছিলেন।

উল্লেখ্য এ দাওয়াত মদীনা তায়্যিবার ভেতরে ছিল না; বরং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে একটু দূরের কোনও জনপদে ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজানকে সংগে নিয়ে সেই দাওয়াতে চললেন। পথে একটি খোলা মাঠ পড়ল। সংগে কোনও লোকজন ছিল না। তিনি সেই মাঠে আম্মাজানের সংগে দৌড় প্রতিযোগিতা দিলেন।[৪৮]

দৌড় দেওয়া একটা বৈধ বিনোদন ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বৈধ বিনোদনের প্রতিও লক্ষ রাখলেন। একজন নারীর জন্য বৈধ বিনোদনেরও প্রয়োজন রয়েছে। এর দ্বারা জীবনে স্ফূর্তি লাভ হয় এবং কর্মে উদ্যম ও প্রাণশক্তি অর্জিত হয়। তাই শরী'আত এটা অনুমোদন করেছে। তবে শর্ত হল, তা সীমার ভেতরে হতে হবে। শরী'আত যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছে, কিছুতেই তা লঙ্ঘন করা যাবে না, যেমন বেপর্দা না হওয়া, গায়রে মাহরামের সাথে দেখা-সাক্ষাত না করা ইত্যাদি।

সাজসজ্জার সাথে বের হওয়া জায়েয নয়

যাহোক এ ঘটনা দ্বারা জানা গেল নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারে। শরী'আত তার অনুমতি দিয়েছে। তবে বাইরে বের হওয়ার জন্য এই শর্তারোপ করেছে যে, অবশ্যই পর্দা রক্ষা করতে হবে। কোনও অবস্থায়ই বেপর্দা হওয়া যাবে না। নিজ শরীরকে প্রদর্শন করা চলবে না। এ কারণেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থ : 'সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'[৪৯]

---

৪৮. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২২১৪; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ১৯৬৯
৪৯. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

অর্থাৎ কখনও যদি বাইরে যাওয়ার দরকার হয়, তবে পর্দার সাথে শালীনভাবে বের হবে। জাহেলী যুগে নারীগণ যেমন বেশভূষার প্রদর্শন করে বেড়াত, বাইরে যাওয়ার সময় সেজেগুজে বের হত, তোমরা সেরকম বের হবে না। কেননা তাতে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যা নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই ফিতনা থেকে বাঁচার লক্ষে তোমরা অবশ্যই পর্দার সংগে বের হবে। ঢিলেঢালা পোশাক দ্বারা শরীর ঢেকে বের হবে। আমাদের এ কালে তো বোরকার রেওয়াজ আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় এর প্রচলন ছিল না। তখন বড় চাদর ব্যবহৃত হত। চাদর দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর ঢেকে নেওয়া হত। তো বলা হচ্ছে, তোমরা বড় চাদর দ্বারা কিংবা বর্তমানকালের রেওয়াজ অনুযায়ী বোরকা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে বের হও।

সারকথা নারীগণ প্রয়োজনকালে ঘরের বাইরে যেতে পারে। ইসলামে তাদেরকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাইরে বের হলে যেহেতু ফিতনার আশংকা থাকে, তাই সে ফিতনা থেকে বাঁচার লক্ষে পর্দার সংগে বের হতে বলা হয়েছে। পর্দার সংগে বের হলে ফিতনার আশংকা থাকে না। এটা নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর।

পর্দার হুকুম কি কেবল নবী-পত্নীদের জন্য

কেউ-কেউ বলে থাকে, পর্দার হুকুম কেবল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের জন্যই ছিল। সাধারণভাবে সকলের জন্য এ হুকুম দেওয়া হয়নি। কাজেই এ হুকুম অন্য নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তাদের দলীল হল, এ আয়াতে কেবল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ করেই কথা বলা হয়েছে। ঘরে থাকার হুকুম তাদেরকে লক্ষ করেই দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে, জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। কিন্তু তাদের এই কথা সম্পূর্ণ গলদ। কুরআন-হাদীছ ও যুক্তি-বুদ্ধি কোনও বিচারেই এ কথা টেকে না। কেননা তারা যে আয়াত দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে, সে আয়াতে কেবল পর্দার হুকুমই দেওয়া হয়নি, পর্দা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেমন এক হুকুম তো হল এই যে–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

অর্থ : 'সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'

এ হুকুম কেবল নবী-পত্নীদের জন্য? তাই যদি হয়, তবে তো অন্যান্য নারীগণ সাজসজ্জার সাথে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু সে অনুমতি কি তাদের জন্য আছে? শরী'আত কি তাদেরকে সেজেগুজে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ানোর এজাযত দিয়েছে? আদৌ দেয়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের জন্য যেমন সে অনুমতি নেই, তেমনি অন্যান্য নারীগণকেও সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। বোঝা গেল এটা সকলের জন্য সাধারণ হুকুম। এমনিভাবে এ আয়াতে পরে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থ : 'এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।'[৫০]

এখানে নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা– এই তিনটি কাজের হুকুম দেওয়া হয়েছে। তা এ হুকুম তিনটি কি কেবল নবী-পত্নীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল? অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়? নামায পড়ার হুকুম কি কেবল তাদের জন্যই? যাকাত দেওয়ার বিধানও কি কেবল তাদের জন্যই? এবং কেবল তাদেরই কি কর্তব্য ছিল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা? অন্য সকলে কি এসব বিধানের আওতামুক্ত? পূর্ণ আয়াতের আগে-পরের সবটা বক্তব্য স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এ আয়াতে যতগুলো বিধান দেওয়া হয়েছে তা সকলের জন্যই ব্যাপক, কারও জন্য বিশেষ নয়। যদিও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে, কিন্তু আমাদের সেই মায়েদের মাধ্যমে এ সম্বোধন সকলের জন্যই সাধারণ এবং এর বিধানও সকলেরই জন্য প্রযোজ্য।

তাঁরা ছিলেন পবিত্র নারী

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হিজাব ও পর্দার উদ্দেশ্য কী ছিল তাও লক্ষ করা দরকার। মূলত এর উদ্দেশ্য ছিল পর্দাহীনতার কারণে সমাজে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তার দুয়ার বন্ধ করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফিতনা কি কেবল নবী-পত্নীগণের বহির্গমন দ্বারাই সৃষ্টি হওয়ার ছিল? নিশ্চয়ই এটা কেউ ভাবতে পারে না। কেননা তাঁরা সকলেই ছিলেন সতী-সাধ্বী নারী। তাঁরা ছিলেন পবিত্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী। ভূ-পৃষ্ঠে তাঁদের মত চরিত্রবতী নারী কখনও জন্ম নেয়নি। তাঁদের বহির্গমন দ্বারা ফিতনার কিসের আশংকা? এ আশংকা

---

৫০. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

তো কেবল অন্য নারীদের বাইরে যাওয়ার দ্বারাই দেখা দিতে পারে। কাজেই যখন আমাদের সেই মায়েদেরকে হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা বাইরে যাবে পর্দার সাথে, তখন অন্য নারীদের জন্য তো এ হুকুম অধিকতর গুরুত্বের সংগেই প্রযোজ্য হবে। কেননা ফিতনার আশংকা তাদের ক্ষেত্রেই বেশি।

পর্দার বিধান সকলের জন্যই

তাছাড়া অন্য আয়াতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থ : 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মু'মিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫১]

এরচে' সুস্পষ্ট নির্দেশ আর কি হতে পারে? 'জালাবীব' শব্দটি 'জিলবাব'-এর বহুবচন। এর মানে এমন বড় চাদর, যা দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা নারীদেহ ঢেকে ফেলা যায়। কুরআন মাজীদ কেবল এই বড় চাদর পরারই হুকুম দেয়নি; বরং এর সাথে يُدْنِيْنَ শব্দ ব্যবহার করেছে। তার মানে সেই চাদর সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেবে, যাতে চেহারা ঢাকা পড়ে যায়, কেউ তা দেখতে না পায়। পর্দার এরচে' স্পষ্ট হুকুম আর কী হতে পারে?

ইহরাম অবস্থায় পর্দার পদ্ধতি

আপনাদের জানা আছে, হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য চেহারায় কাপড় লাগানো জায়েয নয়। পুরুষ মাথা ঢাকতে পারে না এবং নারী চেহারা ঢাকতে পারে না। কিন্তু এই যে চেহারা ঢাকতে পারে না, তার মানে কি পর্দার হুকুম মাফ? না, তা আদৌ নয়। এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনা শুনুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহধর্মীনীগণকে নিয়ে যখন হজ্জে গমন করেন তখন এই মাসআলা সামনে আসে। একদিকে পর্দার হুকুম, অন্যদিকে ইহরাম অবস্থায় মুখে কাপড় লাগানো জায়েয নয়। তখন নবী-পত্নীগণ কী করেছিলেন, হাদীছে তা বর্ণিত হয়েছে। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন–

---

৫১. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯

"হজ্জের সফরে আমরা যখন উটের উপরে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা আমাদের মাথায় একটা কাঠের টুকরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। রাস্তায় কোনও পুরুষলোক সামনে না পড়লে আমরা নেকাব উল্টিয়ে রাখতাম, কিন্তু যখন কোনও কাফেলা সামনে পড়ত বা কোনও পর-পুরুষ দেখা যেত তখন সেই কাঠের উপর দিয়ে নেকাব ঝুলিয়ে দিতাম, যাতে পর্দাও হয়ে যায় আবার মুখেও কাপড় না লাগে।"[৫২]

এই হাদীছ দ্বারা জানা গেল, ইহরাম অবস্থায়ও উম্মুল-মু'মিনীনগণ পর্দা ছাড়েননি। তার মানে এই অবস্থায়ও পর্দার হুকুম মাফ হয়ে যায় না।

পর্দা রক্ষায় জনৈকা মহিলার প্রযত্ন

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও এক যুদ্ধে গমন করেন। জনৈকা মহিলার এক পুত্র অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পর সমস্ত মুসলিম ফিরে আসল, কিন্তু তার পুত্রকে ফিরতে দেখা গেল না। পুত্র যুদ্ধ থেকে ফিরে আসল না, এ অবস্থায় সেই মায়ের কী অবস্থা হতে পারে চিন্তা করতে পারেন? উদ্বিগ্না সেই নারী তার পুত্রের খোঁজ নেওয়ার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছুটে আসল। এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলের কী খবর? সাহাবায়ে কিরাম উত্তর দিলেন, তোমার ছেলে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেছে। মহিলার মাথায় যেন বাজ পড়ল। প্রাণের ধন চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেছে, মায়ের পক্ষে তা সহ্য করা কত কঠিন। তবে ইনি তো একজন সাহাবিয়া। সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা পেয়েছেন। তিনি সবর করলেন। নিজেকে সংযত রাখলেন। চোখে লাগে এমন কোনও আচরণ তার দ্বারা প্রকাশ পেল না। এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি তাকে বলে উঠল, ওহে মহিলা! এত দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি নিয়ে তুমি নিজ ঘর থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছুটে এসেছ, তা সত্ত্বেও চেহারা থেকে নেকাব সরাওনি, যথারীতি মুখ ঢেকে রেখেছ? এই শোকের ভেতরও মুখে নেকাব দিতে ভুলোনি? উত্তরে সেই মহিলা বলল–

إِنْ أُرْزَأْ ابْنِيْ فَلَمْ أُرْزَأْ حَيَائِيْ

'আমি পুত্র হারিয়েছি, লজ্জা তো হারাইনি।'[৫৩]

---

৫২. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৫৬২; আহমাদ, হাদীছ নং ২২৮৯৪
৫৩. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২১২৯

অর্থাৎ পুত্র হারিয়েছি বলে আমি বেপর্দা হব কেন? পুত্রের জানাযা হয়েছে বলে আমার লজ্জাকেও দাফন করে ফেলব? এই ছিল সেকালের মহিলাদের পর্দা রক্ষার এহতেমাম।

পশ্চিমাদের ব্যঙ্গ-নিন্দায় কান দিও না

আরয করছিলাম, হিজাব ও পর্দা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হুকুম দেওয়া হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। উম্মাহাতুল-মু'মিনীন ও মহিলা সাহাবীগণ তা আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকেও এর যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। কে কী বলল না বলল, তাতে কান দেওয়া চলবে না। পশ্চিমারা প্রোপাগাণ্ডা করছে–ইসলাম নারীদের প্রতি অবিচার করেছে, নারীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে দিয়েছে, মুখটা পর্যন্ত খোলা রাখার সুযোগ দেয়নি, একদম কার্টন বানিয়ে ফেলেছে। তা তারা যতই অপপ্রচার করুক, তাদের এই ব্যঙ্গ-নিন্দার কারণে আমরা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম ছেড়ে দেব নাকি? মনে রাখতে হবে, আমাদের অন্তরে যখন এই ঈমান ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে তরীকা শিখেছি সেটাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ তরীকা, তবে পশ্চিমারা যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। কেউ উপহাস করলে করুক, নিন্দা করলে করতে থাকুক, আমরা তার পরওয়া করি না। এসব নিন্দা-উপহাস একজন মুসলিমের গলার অলংকার। আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালাম, যারা কিনা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ, কম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনেছেন? এ জগতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই নানাভাবে নিন্দা করা হয়েছে। তাদেরকে পশ্চাদপদ বলা হয়েছে, সেকেলে বলা হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– এসব লোক আমাদেরকে ইহকালবিমুখ করতে চায়, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত করতে চায়। মোটকথা তাদের উপর হাজারও নিন্দার তীর বর্ষণ করা হয়েছে। তা তোমাদের উপর কেন বর্ষণ করা হবে না, যখন তোমরা মু'মিন এবং নবীগণের ওয়ারিশ? উত্তরাধিকার হিসেবে ওয়ারিশ যেমন অন্যান্য জিনিস লাভ করে তেমনি নিন্দা ও গালমন্দও লাভ করতে হবে বৈকি? এই উত্তরাধিকারের ভয়ে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ ও পন্থা ছেড়ে দেবে? যদি

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান থাকে, তবে নিন্দা ও গালিতে ভয় পেও না; বরং তা শোনার জন্য প্রস্তুত থাক। সবরকম গালমন্দ শোনার জন্য সংকল্পবদ্ধ থাক।

তথাপি তৃতীয় স্তরের নাগরিক হয়ে থাকবে

আল্লাহ না করুন, তোমরা যদি তাদের নিন্দাকে ভয় পাও এবং সেই ভয়ে তাদের কথা মেনে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা উপেক্ষা কর, তবে মনে রাখবে তাতে পার্থিব কিছু লাভও তোমাদের অর্জিত হবে না; বরং তথাপি তৃতীয় স্তরের নাগরিক হয়ে থাকবে। তারা বলে, নারীদেরকে ঘরে বসিয়ে রেখ না, তাদেরকে অবরূদ্ধ করে রেখ না এবং পর্দার মধ্যে বন্দি করে রেখ না। তোমরা কি তাদের এ কথা শুনবে? যদি তা শোন, সেইমত কাজ কর এবং নারীদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে আস, তবে এর বিনিময়ে তোমাদের কী অর্জিত হবে? তোমরা তাদের কথা মেনে নিলে, তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করলে আর এভাবে পর্দা ছুড়ে ফেললে, ওড়না ফেলে দিলে, সবকিছুই করলে কিন্তু তাই বলে কি তারা তোমাদেরকে তাদের লোক বলে স্বীকার করে নিয়েছে? তারা কি বলেছে যে, তোমরা আমাদেরই লোক?তারা কি তোমাদেরকে তাদের সমান অধিকার দিয়ে দিয়েছে? তারা নিজেরা যে সম্মান ও ইজ্জত ভোগ করছে, সেই সম্মান ও ইজ্জত কি তোমরাও পেয়ে গেছ, না কস্মিনকালেও পাবে? কখনওই পাবে না; বরং এতকিছুর পরও তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদ ও প্রতিক্রিয়াশীলই বলবে। যখন তোমাদের নাম উচ্চারিত হবে, গালির সাথেই উচ্চারিত হবে। নিন্দা ও ব্যঙ্গের সংগে উচ্চারিত হবে। তোমরা যদি পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছু বদলে ফেল এবং প্রতিটি বিষয়ে তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ কর, তারপরও তোমরা তৃতীয় স্তরের নাগরিক হয়েই থাকবে।

কাল আমরাই তাদেরকে বিদ্রূপ করব

পক্ষান্তরে তোমরা যদি তাদের এসব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে চল এবং ওসবের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ না কর; বরং চিন্তা কর যে, ওরা তো আমাদেরকে নিন্দাই করবে, গালমন্দ করতেই থাকবে কিন্তু তাতে আমাদের কী আসে যায়, আমরা তো মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম, আমাদেরকে তারই পথে চলতে হবে, আমাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে, তবে তারা যতই নিন্দা ও উপহাস করুক না কেন এবং আমাদেরকে

নিয়ে যতই হাসাহাসি করুক না কেন তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। একটা দিন আসবে যখন আমরাই তাদের নিয়ে হাসব। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ۝ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

অর্থ : 'আজ মু'মিনগণ কাফেরদেরকে নিয়ে হাসবে। আরামদায়ক আসনে বসে দেখবে যে, কাফেরগণ বাস্তবিকই তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।'[৫৪]

অর্থাৎ কাফেরদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা দুনিয়ায় মু'মিনদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করে, বিদ্রূপ-উপহাস করে, যখন তাদের সম্মুখ দিয়ে কোনও মুসলিম যায় তখন একে অন্যকে ইশারা করে– ওই দেখ, মুসলমান যাচ্ছে, তারা এভাবে উপহাস করতে থাকুক, কিন্তু যখন আখিরাত আসবে এবং প্রত্যেকে তার কর্মফলের সম্মুখীন হবে, তখন ঈমানদারগণই কাফেরদেরকে দেখে হাসবে এবং মূল্যবান সোফায় বসে দেখবে তারা কিভাবে তাদের অসৎকর্মের ফল ভোগ করছে– ইনশাআল্লাহ।

ইহজীবন কতদিনের? কাফেরগণ তোমাদেরকে দেখে কতদিন হাসবে? যেদিন চোখ বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন জানা যাবে, যারা মু'মিনদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাদের পরিণাম কী হয়েছে আর সেই উপহাসিত মু'মিনদেরই বা পরিণাম কী হয়েছে। কাজেই আমরা ওদের হাসি-ঠাট্টার পরওয়া করব না, তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে দমে যাব না, কোনও অবস্থাতেই নিজের পথ ছাড়ব না, কোনওকিছুর বিনিময়েই নিজেদের আদর্শ জলাঞ্জলি দেব না; বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমাদের পবিত্র মায়েদের পন্থাকেই আকড়ে ধরব। কেননা মুক্তির পথ কেবল সেটাই। কাফেরগণ হাসতে থাকুক, তারা নিন্দা ও বিদ্রূপ করতে থাকুক, তাদের যা ইচ্ছা তাই করুক। আমরা কোনও অবস্থাতেই নিজেদের পথ ছেড়ে দেওয়ার নই।

ইসলামের অনুসরণেই সম্মান নিহিত

মনে রেখ, যে ব্যক্তি হিম্মতের সাথে নিজ আদর্শকে ধরে রাখে, এ দুনিয়ায় সত্যিকারের ইজ্জত কেবল তারই পদচুম্বন করে। ইজ্জত-সম্মান

---

৫৪. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ৩৪-৩৬

ইসলাম পরিত্যাগের ভেতর নয়; বরং ইসলামের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ

'আমাদের যা-কিছু সম্মান, তা ইসলামের অনুসরণ করার বদৌলতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন।'[৫৫]

আমরা যদি সেই ইসলাম ছেড়ে দেই, তবে ইজ্জত-সম্মান পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না; বরং চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা আমাদেরকে ঘিরে ধরবে।

দাড়িও গেল, চাকরিও মিলল না

জনৈক বুযুর্গ আমাকে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়েছেন। বড়ই শিক্ষাদায়ী ঘটনা। ঘটনাটি হল–

"তাঁর এক বন্ধু লন্ডনে থাকত। সেখানে সে চাকরির সন্ধানে ছিল। এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গেল, তখন তার চেহারায় দাড়ি ছিল। যে ব্যক্তি ইন্টারভিউ নিচ্ছিল সে বলল, এখানে চেহারায় দাড়ি নিয়ে কাজ করা কঠিন হবে, তাই তোমাকে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে। সে চিন্তায় পড়ে গেল, দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে? এটা কি করে সম্ভব? অনেক চিন্তা করেও নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছিল না। তখনকার মত সে ফেরত চলে আসল। তারপর অন্যান্য জায়গায় চাকরি খুঁজতে লাগল। এভাবে দু'-তিনদিন চলল, কিন্তু কোথাও চাকরি পাচ্ছিল না। বেকার দিন কাটছিল। একদিকে বেকারত্বের দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে দাড়ি কামানোর ভীতি। প্রচণ্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত হার মানল। দাড়ি কামানোরই ফয়সালা করে ফেলল। আগে চাকরি তো পেয়ে নেই! শেষপর্যন্ত দাড়ি কামিয়েই ফেলল। তারপর সেই দাড়িবিহীন চেহারায় চাকরির জন্য পূর্বের সে জায়গায় চলে গেল। কিন্তু সেখানে পৌছার পর তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেল না। তারা জিজ্ঞেস করল, কিজন্য এসেছেন? সে বলল, আপনারা বলেছিলেন দাড়ি কামিয়ে ফেললে চাকরি পাওয়া যাবে, আমি দাড়ি কামিয়ে এসেছি। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মুসলিম? বলল, হাঁ,

---

৫৫. আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম ১খ, ১৩০পৃ, হাদীছ নং ২০৭; মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাঃ ৭খ, ৯৩পৃ. হাদীছ নং ৩৪৪৪৪; মুখতাসারু তারীখি দিমাশ্ক ১খ, ২৫০৭পৃ.

আমি একজন মুসলিম। ফের জিজ্ঞেস করল, আপনি দাড়ি রাখাকে জরুরি মনে করেন, নাকি মনে করেন না? সে উত্তর দিল, আমি জরুরি মনে করতাম এবং সেজন্যই তো রেখেছিলাম। তারা বলল, আপনি যখন জানতেন এটা আল্লাহর হুকুম আর আল্লাহর হুকুম মেনেই দাড়ি রেখেছিলেন, তখন সর্বাবস্থায় তা রেখে দেওয়াই উচিত ছিল নাকি? কেবল আমাদের কথায় দাড়ি কামিয়ে ফেললেন? এর অর্থ তো দাঁড়াল, আপনি আল্লাহ তা'আলার ওফাদার নন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওফাদার হয় না সে নিজ অফিসারেরও ওফাদার হতে পারে না। সুতরাং আমরা আপনাকে চাকরি দিতে অপারগ।"

এভাবে তার আখিরাতও গেল, দুনিয়াও পেল না। দাড়িও গেল, চাকরিও মিলল না।

কেবল দাড়িই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার যত হুকুম আছে তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রজোয্য। মানুষ হাসবে, দুনিয়ার স্বার্থসিদ্ধি হবে না এই চিন্তায় শরী'আতের কোনও হুকুমকেই ত্যাগ করা চলে না। তা ত্যাগ করতে গেলে অনেক সময় দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চেহারারও পর্দা আছে

হিজাব সম্পর্কে সবশেষে এ কথা আরয করতে চাই যে, এ ব্যাপারে আসল কথা হল– মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর কোনও বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা কিংবা ঢিলাঢালা গাউন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে। মাথার চুলও ঢাকা থাকবে। চেহারাও পর্দার বাইরে নয়, তাই চেহারার উপরেও নেকাব থাকতে হবে। একটু আগেই আমি এ আয়াত তিলাওয়াত করেছি যে–

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

অর্থ : 'তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়।'[৫৬]

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রাযি.) বলেন, সেকালে নারীগণ এভাবে পর্দা করত যে, একটা বড় চাদর শরীরের উপর জড়িয়ে তার একটা প্রান্ত নিজেদের চেহারার উপর ছেড়ে দিত। তাতে কেবল চোখ খোলা থাকত এবং চেহারার বাকি অংশ ঢাকা পড়ে যেত।[৫৭]

---

৫৬. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯

৫৭. আযওয়াউল-বায়ান ফী তাফসীরিল-কুরআন বিল-কুরআন ৬খণ্ড, ৩৪৯পৃ.

এই হল হিজাবের আসল নিয়ম। বাকি জরুরত ও ঠেকার কথা ভিন্ন। বিভিন্ন অপারগ অবস্থা সামনে আসতেই পারে, তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল চেহারার ক্ষেত্রে এই অবকাশ রেখেছেন যে, কোথাও চেহারা খোলার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে তা খোলা যেতে পারে। এমনিভাবে হাতও কবজি পর্যন্ত খোলার অবকাশ আছে। কিন্তু এরকম ঠেকার অবস্থা না দেখা দিলে চেহারাসহ গোটা শরীরই পরপুরুষের সামনে ঢেকে রাখতে হবে।

পুরুষদের আকলের উপর পর্দা পড়ে গেছে

এই হল পর্দার বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা। বস্তুত একজন নারীর শুদ্ধ ও পবিত্র জীবনের জন্য হিজাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর মর্যাদা রক্ষায় এর ভূমিকা অপরিসীম। তাই পুরুষদের কর্তব্য নারীদেরকে শরী'আতের এ বিধান পালনে উৎসাহিত করা আর নারীদের কর্তব্য সর্বাবস্থায় এ বিধান মেনে চলা। বড়ই আফসোসের কথা, অনেক সময় নারী আন্তরিকভাবেই পর্দা করতে চায় কিন্তু পুরুষ তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী বড় চমৎকার বলেছেন–

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں — اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گر گیا

پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا — کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

'কাল যখন কতিপয় নারীকে বেপর্দা দেখা গেল,
দ্বীনী সম্ভ্রমবোধে আকবর পড়ে গেল মাটির উপরে।
সে তাদের সুধাল, তোমাদের পর্দা কোথায় গেল?
বলে উঠল, আমাদের পর্দা পড়েছে গিয়ে আজ পুরুষের আক্‌ল 'পরে।'

বাস্তবিকই আজ পুরুষের আকল-বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে গেছে। না হয় তারা নারীর পর্দার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত ও দয়ায় আমাদের সকলকে ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে নাজাত দান করুন এবং তাঁর ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম মোতাবেক জীবনযাপনের তাওফীক দিন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৭৭

নারীসমাজ ও পর্দা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ (১), যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত (২), যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে (৩), যারা যাকাত সম্পাদনকারী (৪), যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে (৫) নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (৬) তবে কেউ এছাড়া অন্যকিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী (৭)।'[৫৮]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে মু'মিনদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, যারা এসব গুণের অধিকারী হবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করবে। তার মধ্যে একটা

---

৫৮. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৭

গুণ হল 'নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করা'। লজ্জাস্থান হেফাজত করার মানে পাক-পবিত্রতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ চরিত্র রক্ষা করা এবং নফসের চাহিদা ও কামভাবকে কেবল বৈধ সীমানার মধ্যে সংরক্ষণ করা। বৈধ সীমারেখার মানে বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেই সম্পর্কের সীমানার মধ্যে থাকা। আল্লাহ তা'আলা এটাকে হালাল করেছেন। কুরআন মাজীদ বলছে, যারা বৈবাহিক সম্বন্ধের বাইরে নিজেদের যৌনচাহিদা পূরণ করতে চায় তারা সীমালঙ্ঘনকারী ও নিজ সত্তার প্রতি জুলুমকারী। কারণ এর পরিণাম দুনিয়ায়ও অশুভ এবং আখিরাতেও অশুভ। চরিত্র রক্ষার জন্য শরী'আত আমাদের প্রতি কয়েকটি হুকুম জারি করেছে। যারা সেই হুকুম মেনে চলবে তাদের চরিত্র সবরকম অন্যায়-অনাচার ও কদর্যতা থেকে রক্ষা পাবে।

প্রথম হুকুম : চোখের হেফাজত

আরয করছিলাম, শরী'আত আমাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার হুকুম দিয়েছে। আর সেজন্য যৌনচাহিদাকে বৈধ সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাখার জোর তাগিদ দিয়েছে, যাতে কিছুতেই সেই চাহিদা সীমারেখার বাইরে হানা দিতে না পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শরী'আত আমাদের উপর অনেক বিধান জারি করেছে। সেসব বিধানের মাধ্যমে একটি শুদ্ধ ও পবিত্র সমাজ গড়ে উঠতে পারে। একটি পূতপবিত্র সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বপ্রথম দরকার চোখের হেফাজত, কানের হেফাজত ও এমন এক পরিবেশ-পরিমণ্ডলের, যেখানে এই রিপু ও অপবিত্র ভাবাবেগ কোনওরূপ প্রশ্রয় পাবে না এবং কেউ এ জাতীয় তাড়নাবোধ করলেও সেই তাড়না নিবারণের জন্য অবৈধ কোনও উপায় অবলম্বনের সুযোগ পাবে না। বিগত দুই জুমু'আতে এ সম্পর্কিত একটি হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা ছিল 'চোখের হেফাজত'। শরী'আত চোখের প্রতি এই হুকুম আরোপ করেছে যে, সে আনন্দ পাওয়ার জন্য কোনও পরনারীর দিকে তাকাবে না।

দ্বিতীয় হুকুম : নারীর পর্দা

একটি পূতপবিত্র সমাজ গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বিতীয় যে হুকুম দিয়েছেন তা হচ্ছে নারীর হিজাব বা পর্দা। প্রথমত নারীকে হুকুম দেওয়া হয়েছে–

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থ : 'নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'[৫৭]

এ আয়াতে সরাসরি উম্মাহাতুল-মু'মিনীনকে– মু'মিনদের মায়েদেরকে অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীদেরকে লক্ষ করে হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান কর এবং জাহেলী যুগের লোকেরা যেভাবে সাজসজ্জা করে বাইরে যেত, তোমরা সেভাবে বাইরে যেও না। জাহেলী যুগে পর্দার কোনও নিয়ম ছিল না। নারীরা সেজেগুজে বাইরে বের হত এবং পুরুষদেরকে অসৎকর্মে উসকানি দিত। কুরআন মাজীদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীদেরকে লক্ষ করে বলছে–

"তোমরা তাদের সে নীতি অবলম্বন করো না; বরং তোমরা ঘরের ভেতরেই থাক। নিতান্ত দরকার না হলে বাইরে যেও না।"

ঘরই নারীর আসল জায়গা

কাজেই নারীদের জন্য মূল বিধান এটাই যে, তারা ঘরের মধ্যে থাকবে। ঘরের কাজকর্ম সামলাবে। বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাবে না। বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য পসন্দনীয় নয়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– কোনও নারী যখন বিনা প্রয়োজনে বাইরে যায়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে থাকে। শয়তান তার পিছনে লেগে যায়। কাজেই যতক্ষণ সম্ভব তারা ঘরের ভেতরেই থাকবে। নিতান্ত কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে বাইরে যেতে পারবে বটে, কিন্তু তখনও কোনও রকম সাজসজ্জা করবে না, যেমনটা জাহেলী যুগের নারীদের নীতি ছিল; বরং অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে বের হবে।

বর্তমানকালের অপপ্রচার

এখানে দু'টো বিষয় বুঝে রাখা দরকার। বিশেষত বর্তমানকালের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তা এজন্য বোঝা দরকার যে, আজকাল ইসলামের এই বিধানটির ব্যাপারে চারদিকে জোরদার প্রোপাগাণ্ডা চলছে। এই প্রোপাগাণ্ডা শুরু তো হয়েছিল অমুসলিমদের পক্ষ থেকে, কিন্তু এখন নামধারী মুসলিমগণও এতে শামিল হয়ে গেছে; বরং তারাই এখন এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অপপ্রচারটি এই যে, ইসলাম ও মৌলভী সাহেবগণ

---

৫৭. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

নারীদেরকে ঘরের চারদেয়ালে বন্দি করে ফেলেছে, তাদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। আজকের বিশ্ব প্রোপাগাণ্ডার বিশ্ব। সময়টাই হল অপপ্রচারের। সর্বাপেক্ষা ন্যাক্কারজনক মিথ্যাকেও অপপ্রচারের শক্তিতে মানুষের অন্তরে এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়, যেন সেটাই চরম সত্য। এটা গুয়েভলসীয় নীতি। গুয়েভল্‌স ছিল জার্মানির বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। তার এই উক্তি প্রসিদ্ধ যে,

"মিথ্যাকে জোরালোভাবে প্রচার করতে থাক। একসময় জগত সেটাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে।"

এটা ছিল তার দর্শন। আজকের জগত তার সেই দর্শনের উপর চলছে।

সুতরাং প্রোপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে যে, এটা একবিংশ শতাব্দি। এ যুগে নারীদেরকে ঘরের চারদেয়ালে বন্দি করে রাখা যাবে না। এখন নারীর গৃহে অবস্থান পশ্চাদপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর। যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। এটা প্রগতির যুগ। নারীদেরকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলতে হবে। তার গৃহের ভেতর অবস্থান করাটা প্রগতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। একদিকে তো এই অপপ্রচার চলছে, অন্যদিকে কান পেতে শুনুন, গভীর মনোযোগের সংগে লক্ষ করুন কুরআন মাজীদ কী বলছে। কুরআন মাজীদ নারীদের লক্ষ করে বলছে– "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।" এটা একটা মৌলিক নির্দেশনা। এই নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে।

নারী ও পুরুষ দু'টি পৃথক শ্রেণী

এই মৌলিক নির্দেশনা এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। একটি শ্রেণী পুরুষদের, অপরটি নারীদের। আল্লাহ তা'আলা এই ভিন্ন দুই শ্রেণীকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের দৈহিক গঠন-আকৃতি একরকম এবং নারীর অন্যরকম। পুরুষের যোগ্যতা ও ক্ষমতা একরকম এবং নারীর অন্যরকম। পুরুষের চিন্তা-ভাবনা একরকম, নারীর অন্যরকম। পুরুষের রুচি-অভিরুচি একরকম এবং নারীর অন্যরকম। এমনিভাবে আবেগ ও অনুভূতিতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য এজন্যই রেখেছেন যে, উভয়ের কাজ ও দায়িত্ব আলাদা আলাদা। এই আলাদা দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার মাধ্যমেই মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আসে। কিন্তু আজ নারী-পুরুষের সমাধিকারের শ্লোগান দিয়ে উভয়ের সেই সৃষ্টিগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে– পুরুষ যেই কাজ করছে

নারীগণও তাই করবে, উভয়ের কর্মক্ষেত্র হবে অভিন্ন। সাম্যের এই শ্লোগান মূলত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে বিদ্রোহের নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা উভয়কে আলাদাভাবে সৃষ্টি তো এজন্যই করেছেন যে, উভয়ের দায়িত্ব হবে আলাদা এবং কর্মক্ষেত্রও আলাদা।

নারী-পুরুষের দায়িত্ব আলাদা-আলাদা

মানবজীবনের পরিপূর্ণতা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দুই ধরনের কাজ ও দুই রকমের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া জরুরি। একটি হচ্ছে ঘরের বাইরের কাজ এবং আরেকটি ভেতরের কাজ। বাইরের কাজ বলতে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্জ, চাকরি-বাকরি, শ্রমবিনিয়োগ প্রভৃতি কাজকে বোঝায়। যার মাধ্যমে মানুষ টাকা-পয়সা কামাই করবে, জীবিকা উপার্জন করবে ও জীবন নির্বাহের সামগ্রী অর্জন করবে। আর ঘরের ভেতরের কাজ হল, গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা। এর মধ্যে রয়েছে শিশুর পরিচর্যা, গৃহের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানাহারের বন্দোবস্ত এবং স্বস্তিকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-শৃংখলা আঞ্জাম দেওয়া। এভাবে ঘরের বাইরের যিম্মাদারী ও ভেতরের যিম্মাদারী– এই উভয়ের মাধ্যমেই মানুষের জীবনযাপন হয় সুচারু ও পূর্ণাঙ্গ। এর একটি ছাড়া অন্যটি অপূর্ণ থেকে যায়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ফল হয়ে যায়। কাজেই মানবজীবনের জন্য উভয় প্রকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া জরুরি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কর্মবণ্টন

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে স্বভাবগত ব্যবস্থাপনা দান করেছিলেন, হাজার হাজার বছর যাবত মানুষ তা অনুসরণ করে আসছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যে এই নিয়মই চালু ছিল যে, পুরুষ ঘরের বাইরের দায়িত্ব পালন করবে আর নারী ভেতরের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। এই স্বভাবগত ব্যবস্থাপনার অনুসরণ করার ফলে হাজারও বছর যাবত মানুষ স্বস্তিকর জীবনযাপন করছিল। আখেরী ধর্ম ইসলামও সেই ব্যবস্থাপনাকেই বহাল রেখেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত 'আলী (রাযি.)-এর সাথে নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর বিবাহ সম্পন্ন করেন, তখন তাদের মধ্যেও এই ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী কর্মবণ্টন করে দিয়েছিলেন। হযরত 'আলী (রাযি.)-কে লক্ষ করে তিনি বলেন, তুমি বাইরের কাজ আঞ্জাম দেবে এবং আয়-রোজগার করবে আর হযরত ফাতিমা (রাযি.)-কে বললেন, তুমি ঘরের ভেতরে থাকবে এবং

ভেতরের দায়িত্বসমূহ পালন করবে। এভাবে তিনি তাদের মধ্যে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী কর্মবণ্টন করে দিলেন। এ অনুযায়ীই তারা জীবনযাপন করতেন এবং এ নিয়মই চালু ছিল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আর এ অনুসারেই চলছিল ইসলামী সমাজ।

শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর অবস্থা

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ব্যবসায় নতুন-নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং নতুন-নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। তখন একটা নতুন সমস্যা এই দেখা দেয় যে, পুরুষদেরকে অর্থোপার্জনের জন্য লম্বা-লম্বা সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হচ্ছিল। দিনের পর দিন সফরে থাকতে হত। এ সময়কালে তাদেরকে বিবি-বাচ্চা থেকে দূরে থাকতে হত। দ্বিতীয় সমস্যা এই দেখা দেয় যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে যায়। ফলে স্ত্রীদের ব্যয়ভার বহনকে পুরুষগণ বাড়তি বোঝা মনে করতে শুরু করে। ইউরোপের পুরুষগণ এ দুই সমস্যার সমাধানকল্পে নারীদের বলল, তোমাদেরকে খামোখা হাজার-হাজার বছর ধরে ঘরের ভেতরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি এক মারাত্মক অবিচার। তোমরা এই অবরোধের শেকল ছিঁড়ে ফেল, বন্দিদশা থেকে বের হয়ে আস, বাইরে এসে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ কর এবং পুরুষগণ যেমন নানারকম পার্থিব উন্নতিসাধন করছে, তোমরাও তেমনি উন্নতির পথে অগ্রসর হও। তাদের এসব কথা ছিল মূলত দূরভিসন্ধিমূলক। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এ যাবতকাল নারীদের যে ব্যয়ভার তাদের কাঁধে চাপানো ছিল সেই ভার নিজেদের উপর থেকে নামিয়ে ফেলা এবং নারীদের উপরেই তা চাপিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, অবৈধ মনোরঞ্জনের পথ সৃষ্টি করা। নারীরা যখন বাজারে-রাস্তাঘাটে চলে আসবে, তখন তাদেরকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করা সহজ হয়ে যাবে।

আজ নারীগণ সর্বত্র পুরুষদের নাগালের ভেতর

তাদের এই মুখরোচক শ্লোগান খুব কাজ দিল। নারী তার ঘরের বাইরে চলে আসল। সারা ইউরোপে নারীদের ঘরের ভেতর থাকার ইচ্ছা খতম হয়ে গেল। এখন আর সেই দিন নেই যে, নারী এক ঘরে বসে আছে আর পুরুষগণ লম্বা-লম্বা সফরে একাকী চলে যাচ্ছে আর এই দীর্ঘকাল স্ত্রী-সান্নিধ্য থেকে

বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। ইউরোপের মানুষ এখন নতুন বিশ্বের স্বাদ উপভোগ করছে। এখন তাদের কদমে-কদমে নারী উপস্থিত। অফিস-আদালতে নারী, হাটে-বাজারে নারী, রেলে-জাহাজে সর্বত্রই নারী উপস্থিত। পুরুষের পাশে পাশে সর্বত্র তাদের অবাধ বিচরণ। তাদের পারস্পরিক বিনোদন ও মনোরঞ্জনে কোনও বাধা যাতে না থাকে সেজন্য এই আইনও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে, দুই নারী-পুরুষ যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ভোগ-উপভোগে রত হতে চায়, তাতে কোনও বাধা দেওয়া চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের না কোনও আইনগত বাধা আছে, না চরিত্রগত প্রতিবন্ধকতা। এখন নারী সব জায়গায় আছে এবং তাকে পাওয়ার জন্য রাস্তাও খোলা আছে। পুরুষের কাঁধের উপর নারীর কোনও যিম্মাদারীও নেই; বরং নারীকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা কামাই-রোজগারও করবে এবং পদে-পদে আমাদের উপভোগ ও আনন্দ দানের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতার পরিণাম

স্বাধীনতা দানের নামে এভাবে নারীদের সাথে প্রহসন করা হয়েছে। নাম তো দেওয়া হয়েছে 'নারীমুক্তির আন্দোলন', কিন্তু বাস্তবে তাদের সংগে করা হয়েছে চরম প্রতারণা। এই প্রতারণার পরিণাম হয়েছে এই যে, সকালবেলা স্বামী ঘুম থেকে ওঠে নিজের কর্মক্ষেত্রে চলে গেল এবং স্ত্রীও তার কাজে বের হয়ে গেল। তাদের ঘরের দরজায় তালা। যদি শিশু জন্ম নিয়ে থাকে, তার জন্য চাইল্ড কেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যস বাবা-মা আপন-আপন কর্মক্ষেত্রে আর তাদের বাচ্চা চাইল্ড কেয়ারে। সেখানে সে সেবিকাদের হাতে লালিত-পালিত হচ্ছে। সে বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত। এক নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জীবনে সে বেড়ে উঠছে। যেই শিশু তার শৈশব থেকেই বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত থেকে অন্যের হাতে লালিত-পালিত হচ্ছে, তার অন্তরে বাবা-মায়ের প্রতি কতটুকু ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে? ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মানোর পথটাই তো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বুড়ো বাবা বৃদ্ধাশ্রমে

এটা তারই পরিণতি যে, বাবা যখন বুড়ো হয়ে যায়, পুত্রধন তখন তাকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করে দেয়। তুমি আমাকে আমার জন্মের পর চাইল্ড কেয়ারে রেখে দিয়েছিলে, এখন তোমার পালা। তুমি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে থাক। এখন এটাই তোমার ঠিকানা।

এক বৃদ্ধাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক নিজে আমাকে বলেছে, এক বৃদ্ধ আমাদের এই বৃদ্ধাশ্রমে ছিল। তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমি তার ছেলেকে ফোন করে জানালাম যে, আপনার বাবার মৃত্যু হয়ে গেছে, আপনি এসে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করুন। ছেলে জবাব দিল, বড়ই আফসোসের কথা, আমার বাবার ইন্তিকাল হয়ে গেল, কিন্তু মুশকিল হল আজ অনেক জরুরি কাজ পড়ে গেছে, আমার পক্ষে তো আসা সম্ভব না, মেহেরবানী করে আপনারা দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করুন, তাতে যা খরচ হয় তার বিল আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি পরিশোধ করে দেব।

পশ্চিমা নারী এখন এক বিক্রিপণ্য

আজ পশ্চিমের অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক। সেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বাবা-মায়ের মধ্যে যে মধুর বন্ধন ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভাই-বোনের সম্পর্ক ভেঙে চুরমার। আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-খান্দান বলতে এখন আর সেখানে কিছু নেই। অন্যদিকে নারী হয়ে গেছে একরকম বিক্রিপণ্য। চারদিকে তার ছবি দেখিয়ে তার একেকটি অঙ্গ প্রকাশ্য বাজারে নগ্নরূপে প্রদর্শন করে তার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যকে চমকানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে পয়সা উপার্জনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই হচ্ছে এখন পশ্চিমা নারীর মর্যাদা।

নারীকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে

নারীকে বলা হয়েছিল, তোমাদেরকে ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সে অবরোধ থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে বাইরে আনা হচ্ছে, যাতে তোমরা পুরুষের সাথে সমানতালে উন্নতিলাভ করতে পার। এখন তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে, মন্ত্রী-সচিব হতে পারবে, বড়-বড় পদ দখল করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু পেয়েছে? আমেরিকার ইতিহাস খুঁজে দেখুন। সেখানে আজ পর্যন্ত কতজন নারী প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছে? কতজন মন্ত্রী হতে পেরেছে? প্রেসিডেন্ট তো কেউ হতে পারেনি। দু'-চারজন যা মন্ত্রী হয়েছে, পুরুষের পাশাপাশি তার সংখ্যা বড়ই নগন্য। সেই দু'-চারজনের জন্য অসংখ্য নারীকে টেনে-হেঁচড়ে রাস্তায় নামানো হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখুন দুনিয়ার যতসব নিকৃষ্ট কাজ নারীদের দিয়ে করানো হচ্ছে। তাদেরকে দিয়ে রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেওয়ানো হচ্ছে। হোটেল-রেস্তোরাঁয় তাদেরকে ওয়েটার বানানো হচ্ছে। বাজারে-দোকানে আজ তারা 'সেল্স গার্ল'-এর কাজ করছে।

হোটেলে চাদর-বিছানা পাল্টানোর কাজ তারাই করছে। জাহাজে-বিমানে খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্ব তাদের উপরেই ন্যস্ত। যেই নারী একদিন নিজ ঘরে স্বামী-সন্তান ও বাবা-মাকে খাদ্য পরিবেশন করত আর এ কারণে তাদেরকে পশ্চাদপদ ও সেকেলে বলে ব্যঙ্গ করা হত, তাদেরকে অবরুদ্ধ বলে মায়াকান্না কাঁদা হত, আজ সেই নারী হোটেলে-বাজারে, বিমানে-জাহাজে হাজারও পুরুষের সামনে খাদ্য পরিবেশন করছে। তাদেরকে সেইসব পুরুষের লালসাদৃষ্টিতে বিদ্ধ করা হচ্ছে। আর এটাই কিনা তাদের সম্মান! এটাই তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা!

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

'বুদ্ধির নাম রাখলে পাগলামী আর পাগলামীর নাম বুদ্ধিমত্তা
আপনার যা ইচ্ছা তাই করেন হে রূপের কারিগর!'

নারীর প্রতি অবিচার

একদিকে তথাকথিত প্রগতিবাদের ধোঁয়া তুলে নারীকে আজ এ করুণ পরিণতির শিকার বানানো হয়েছে, অন্যদিকে নারীমুক্তির প্রবক্তাগণ নারীদের প্রতি যে জুলুম-অবিচার করেছে, মানবতার ইতিহাসে এরকম জুলুম-অবিচার তাদের প্রতি কেউ কখনও করেনি। আজ নারীর একেকটা অঙ্গ বিক্রি করা হচ্ছে। তাদের ইজ্জত-সম্মান লুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তারা জোরগলায় বলে বেড়াচ্ছে– আমরা নারীর প্রতি বিশ্বস্ত, আমরা নারীমুক্তির পতাকাবাহী। অপরদিকে যারা নারীর মাথায় পবিত্রতা ও সাধুতার মুকুট পরিয়ে রেখেছিল, তার গলায় ইজ্জত-সম্মানের হার পরিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা নারীদেরকে ঘরের ভেতর বন্দি করে রেখেছে। কি আজব পরিহাস! বস্তুত নারী এমনই এক সৃষ্টি, যাকে যে-কেউ ধোঁকা দিতে পারে। তাকে ধোঁকা দিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করা যে-কারও পক্ষেই সম্ভব। আজ সেই ধোঁকার ফাঁদে আমাদের মুসলিম নারীগণও পড়ে গেছে। তাই দেখছি এখন এরাও ওদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে।

আমাদের সমাজের চালচিত্র

আপনাদের হয়ত মনে আছে, কিছুদিন আগে আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ এক নেতা দেশবাসীকে লক্ষ করে বলেছিল–

"পুরুষদের উচিত নারীদের সবরকম খরচাদি নিজেরাই বহন করবে। অহেতুক তাদেরকে ঘর থেকে বের করে রুজি-রোজগারে লাগানো উচিত নয়।"

কিন্তু এ কথা বলতে না বলতেই যারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল, একদলনারীই ছিল তাদের অগ্রভাগে। যারা নিজেদেরকে নারী-অধিকারের পতাকাবাহী বলে দাবি করে থাকে, সেই মডার্ণ নারীরা তার বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল পর্যন্ত করেছিল। তাদের এক কথা– এই ব্যক্তি আমাদের অধিকার ও স্বার্থবিরোধী কথা বলেছে। চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তি নারীদেরকে রুজি-রোজগারের ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে, বলছে তারা নিজেরা কেন নিজেদের জীবিকার ফিকির করবে, তাদের এই খেদমত আঞ্জাম দেবে পুরুষগণ এবং পুরুষগণ এই খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে, তার এই কথার জন্য তো নারীদের খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম তার বিপরীত চিত্র। মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা আজ গোটা বিশ্বকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তার ডামাডোলে আমাদের নারীরা পর্যন্ত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। যদ্দরুন তারা খুশি না হয়ে উল্টো এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে যে, এই ব্যক্তি নারী-স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চায়। সেই ক্ষোভে তারা রাজপথে পর্যন্ত নেমে আসল। আসলে তারা নারীদের সত্যিকারের অধিকার ও নারীর প্রকৃত মর্যাদা বুঝতেই পারেনি এবং তা বোঝার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত তারা করতে প্রস্তুত নয়। এসব নারী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়িতে লালিত-পালিত হয়েছে। গ্রামীণ নারীদের কী সমস্যা, তাদেরকে কি-কি জটিলতার ভেতর দিয়ে দিনযাপন করতে হয়, সে সম্পর্কে এরা কোনও খোঁজই রাখে না। তা জানার কোনও চেষ্টাই তারা কোনওদিন করেনি। তাদের সামনে বিষয় কেবল এটাই যে, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকজন আমাদেরকে বলছে, তোমরা আধুনিক চিন্তার মানুষ, তোমরা একবিংশ শতাব্দিতে চলার লোক। তাদের এই কথায় তারা বেশ পিঠচাপড়ানী বোধ করছে আর এটাকে পুঁজি করেই তারা যা-কিছু করছে ও বলছে।

প্রকৃতিবিরোধী সাম্য

যাহোক আজ এই প্রোপাগাণ্ডা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই মুসলিমগণ এবং এই মোল্লা-মৌলভীগণ নারীদেরকে গৃহবন্দি করতে চায়, তাই তোমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করো না। অথচ বাস্তবতা হল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভিন্ন দু'টি কর্মক্ষেত্র স্থির করে দিয়েছেন। পুরুষের জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র এবং নারীর জন্য আলাদা কর্মক্ষেত্র। কেননা পুরুষের

দৈহিক গঠন-আকৃতি একরকম এবং নারীর অন্যরকম। পুরুষ ও নারীর রুচি-মেজায এবং যোগ্যতা ও ক্ষমতা আলাদা-আলাদা। তাই তাদের কাজ ও কর্মক্ষেত্র আলাদা হওয়াই স্বভাব-প্রকৃতির দাবি। কাজেই নারী ও পুরুষ একই কাজ করবে, একই কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করবে– এই শ্লোগান সম্পূর্ণ স্বভাববিরোধী। এটা প্রকৃতির সাথে বিদ্রোহ করার নামান্তর। এই শ্লোগানের পিছনে পড়ার ফলেই পশ্চিমে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। আজ আমরাও সেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছি। আমাদের সমাজকে যদি সেই পরিণতি থেকে রক্ষা করতে হয়, যদি আমাদের পরিবারব্যবস্থাকে হেফাজত করতে হয়, তবে আমাদেরকে আমাদের প্রকৃতিসম্মত নিয়মকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। পর্দার বিধান সেই নিয়মেরই এক অন্যতম প্রধান ধারা। সুতরাং আমাদের নারীদেরকে পর্দার ভেতরেই রাখতে হবে। পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার প্রভাব থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমাজকে পশ্চিমের আপদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে স্বস্তিকর ও সুখের জীবন দান করুন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১৫ খণ্ড, ১৮৫-১৯৮পৃ.
বায়তুল মুকার্‌রম জামে' মসজিদ, করাচী।

পর্দা নারীর অলংকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ (১), যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত (২), যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে (৩), যারা যাকাত সম্পাদনকারী (৪), যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে (৫) নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (৬) তবে কেউ এছাড়া অন্যকিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী (৭)।'[৬০]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

সূরা মু'মিনূনের প্রথমদিকের এই আয়াতসমূহকে সামনে রেখে অনেকদিন যাবত আলোচনা চলছে। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সফল মু'মিনদের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। গত দুই জুমু'আ থেকে চতুর্থ গুণ সম্পর্কে আলোচনা চলছে। যার সারকথা হল, মু'মিন হবে

---

৬০. সূরা মু'মিনূন, আয়াত ১-৭

চরিত্রবান, সে তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও শুদ্ধতা রক্ষায় সদা সচেতন থাকবে। এই গুণের আলোচনা প্রসংগে আরয করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি স্বভাবসম্মত দ্বীন দিয়েছেন। এ দ্বীনে মানুষের যাবতীয় বৈধ কামনা-বাসনা ও প্রয়োজনাদি পূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

যৌনচাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষের মধ্যে যৌনচাহিদা নিহিত রেখেছেন। কামভাব মানুষের স্বভাবগত বিষয়। পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নারীও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এই জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য একটি বৈধ ব্যবস্থা দান করেছেন। সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে বিবাহ। ইসলাম এই ব্যবস্থাটিকে কেবল জায়েযই করেনি; বরং এটিকে সুন্নত ও 'ইবাদতও সাব্যস্ত করেছে। কোনও কোনও অবস্থায় এটি ওয়াজিব হয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কেবল পার্থিব বিষয়ই নয়; বরং এর রয়েছে পারলৌকিক মহিমা। এর মাধ্যমে ছওয়াব ও পুণ্য অর্জিত হয়। মানুষ যদি বিবাহের মাধ্যমে নিজের জৈবিকচাহিদা পূরণ করে, তবে এটা কেবল পার্থিব সুখের বিষয়ই হয়ে থাকে না; বরং এর জন্য ছওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে। এই হালাল ও বৈধ পন্থা নির্ধারণ এবং একে ছওয়াব ও পুরস্কারের উপায় সাব্যস্ত করার পর মানুষকে বলে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তোমাদের কামেচ্ছা পূরণের জন্য এই বৈধ পন্থাকে ব্যবহার কর। তোমরা এই পথ ছেড়ে অন্য যে-পথই অবলম্বন করবে তাতে নিশ্চিত গুনাহগার হবে। সুতরাং তোমরা সেসব দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বৈধ উপায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। আরও বলে দেওয়া হয়েছে, কারও যদি বিবাহ করতে কোনও বাধা থাকে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বাধা অপসারিত না হয়, সে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে চলবে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে ও সংযত জীবনযাপন করবে।

মানুষ কেন কুকুর-বেড়ালের কাতারে

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, মানুষ একবার তার বৈধ ও হালাল পথ থেকে সরে গিয়ে নিজ ইন্দ্রিয়চাহিদা মেটানোর জন্য যদি অবৈধ পন্থার পিছনে পড়ে যায়, তখন সে আর কোনও সীমারেখায় স্থির থাকতে পারে না। তখন সে তার ইন্দ্রিয়পরবশতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় এগিয়ে যেতে যেতে এতদূর পৌছে যায় যে, কুকুর-বেড়ালও সেখানে পৌছতে পারে না। গাধা, ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তু পর্যন্ত যা করতে পারে না তাও সে অবলীলায় করে ফেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার খাহেশাত ও ইন্দ্রিয়চাহিদা পুরোপুরি নিবারণ হয় না। পাশ্চাত্য

জগতে আজ যা-কিছু হচ্ছে, তাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারা বিয়ে-শাদীর বাইরে চলে গিয়ে তাদের জৈব কামনা ও ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণের জন্য অবৈধ পন্থার সন্ধানে লেগে পড়ার পরিণামে আজ এমন এক স্তরে নেমে গেছে, একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আজ সেখানে মাতা-পুত্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে, ভাই-বোনের পার্থক্য শেষ হয়ে গেছে। তাদের অবক্ষয় এতদূর পৌঁছে গেছে যে, তাদের কর্মকাণ্ড দেখলে কুকুর-বেড়ালেরও লজ্জাবোধ হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও তাদের খাহেশাত প্রশমিত হচ্ছে না। এক অন্তহীন যৌনক্ষুধা নিয়েই তাদের জীবন কাটছে।

অনিবারণীয় পিপাসাই যার পরিণাম

আপনারা জানেন, পশ্চিমের দেশগুলোতে ব্যভিচার দোষের কিছু নয়। পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সেখানে যে-কোনও নারীর সাথে যে-কোনও সময়ে ব্যভিচার করার দরজা উন্মুক্ত। কোনও বাধা নেই। কোনও রকমের নিষেধাজ্ঞা নেই। তা সত্ত্বেও জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা ওইসব দেশেই সবচে' বেশি ঘটে থাকে। এর কারণ এই যে, কামেচ্ছা ও যৌনক্ষুধা এমনই এক জিনিস যে, তা একবার সীমা অতিক্রম করতে পারলে তারপর আর কোনও কিছুতেই তা পরিতুষ্ট হতে পারে না। তা এক অনিবারণীয় পিপাসায় পরিণত হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি ওই তৃষ্ণাকাতর রোগীর মত হয়ে যায়, যার তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না। সে যতই পানি পান করুক না কেন, তৃষ্ণা তার কিছুতেই মেটে না। এমনিভাবে সে হয়ে যায় ওই ক্ষুধার্তের মত, কোনওকিছুতেই যার ক্ষুধা মেটে না। তাকে যতই খাওয়ানো হোক না কেন, তার এক কথা- আমার ক্ষুধা মিটছে না। অবৈধ পন্থায় যৌনক্ষুধা মেটানোর পিছনে যে পড়ে, তার অবস্থাও ঠিক এরকমই হয়ে যায়। উপভোগ ও আনন্দের কোনও মাত্রাতেই সে তৃপ্ত হতে পারে না। ফলে এক অনন্ত ক্ষুধা ও অন্তহীন পিপাসা নিয়েই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এ কারণেই শরী'আত আমাদেরকে পরিতুষ্টির শিক্ষাদান করেছে। তার কথা হচ্ছে- তোমরা যদি হালাল ও বৈধ সীমারেখার মধ্যে থাক, তবে ওই রাক্ষুসে ক্ষুধার আযাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

হারাম থেকে বাঁচার জন্য দুই প্রহরী

হালালের সীমারেখার ভেতরে থাকা এবং হারাম পন্থা থেকে বাঁচার জন্য শরী'আত যে দুই প্রহরী নিযুক্ত করেছে এবং ব্যভিচার ও অনাচারে লিপ্ত

হওয়ার যে পথসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে, গত জুমু'আয় সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম পাহারা হচ্ছে চোখের হেফাজত। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাহারা নারীর হিজাব ও পর্দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও নারীর কর্মক্ষেত্র অন্য। পুরুষ বাইরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেবে আর নারী ঘরের ভেতরে থেকে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেবে। নারীকে বলা হয়েছে– তোমরা নিজেদের ঘরের ভেতর অবস্থান কর, জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজসজ্জা করে বাইরে বের হবে না। এর মূল কথা হচ্ছে গৃহই নারীর আসল জায়গা।

পারিবারিক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য পর্দার প্রয়োজনীয়তা

কথা কেবল এতটুকুই নয় যে, নারী ঘরের মধ্যে থাকবে; বরং এই গৃহে অবস্থানের ভেতর প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা এটা ফ্যামিলি সিস্টেম ও পারিবারিক ব্যবস্থা রক্ষার মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, তোমরা যদি পারিবারিক ব্যবস্থা রক্ষা করতে চাও, তবে তোমাদেরকে এই কর্মবণ্টন-নীতি মানতেই হবে যে, পুরুষ ঘরের বাইরের কাজকর্ম দেখবে এবং নারী ভেতরের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেবে। শিশুর লালন-পালন ও গৃহের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার জন্য নারীর গৃহে অবস্থান অবশ্যকর্তব্য। তাই নারী যেন সেখানেই থাকে। বাইরে বের হয়ে পুরুষের লালসাতুর চোখের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণ হওয়া যেমন নারী-সম্ভ্রমের পক্ষে শোভনীয় নয়, তেমনি নয় সমাজ-সভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর।

পাশ্চাত্য সমাজ নারীর প্রতি চরম অবিচার করেছে। সে নারীকে তার ব্যবসা-বাণিজ্য চমকানোর মাধ্যম বানিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নারীর মাথায় সতীত্ব ও সাধুতার মুকুট পরিয়েছিলেন। তার গলায় পরিয়েছিলেন ইজ্জত ও সম্ভ্রমের কণ্ঠহার। কিন্তু পাশ্চাত্য তার সেই মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে তাকে সেল্স-গার্ল বানিয়ে দিয়েছে। আজ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের বিজ্ঞাপনে তাকে নগ্নরূপে প্রদর্শন করে মানুষকে লোভ দেখানো হচ্ছে যে, এসো, আমার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় কর। নারীর প্রতি এই অমর্যাদাকর আচরণ পাশ্চাত্যেরই শিক্ষা। সেই কুশিক্ষার থাবায় আজ আমাদের নারীরাও ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। অথচ আমাদের নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা হল যে, তোমরা ঘরের ভেতরে অবস্থান কর। বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তাতে বাধা নেই। প্রয়োজন সমাধার জন্য বাইরে যেতে পার। কিন্তু লক্ষ রাখবে সেই বের হওয়াটা যেন অন্ধকার যুগের নারীদের মত না হয়। সেই জাহেলী যুগে নারীরা সেজেগুজে

বাইরে যেত আর মানুষকে চরিত্রহীনতার প্রতি উস্কানি দিত। সাবধান! তোমাদের বের হওয়াটা যেন তাদের মত অমর্যাদাকর বের হওয়া না হয়।

নারী ও পোশাক

আল্লাহ তা'আলা নারীদেহের ভেতর পুরুষদের জন্য বিশেষ এক ধরনের আকর্ষণ রেখেছেন। এটা স্বভাবগত আকর্ষণ। তাই নারীদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে তারা যেন বাইরে যাওয়ার সময় নিজেদের শরীর প্রদর্শন না করে এবং বাড়িতে মাহরামদের সামনে যে পোশাক পরে তাও যেন বেশি আঁটসাঁট না হয়, যার উপর দিয়ে শরীরের ভাঁজ চোখে পড়ে এবং পাতলাও যেন না হয়, যার উপর দিয়ে শরীর নজরে আসে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ

'অনেক নারী এমন আছে, যারা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিত থাকে কিন্তু আখিরাতে থাকবে উলঙ্গ।'[৬১]

আখিরাতের এ শাস্তি এই কারণে যে, তারা দুনিয়ায় পোশাক পরত বটে, কিন্তু পোশাক পরার উদ্দেশ্য পূরণ হত না। কেননা পোশাক যদি অতিরিক্ত পাতলা বা অতি আঁটসাঁট হয়, তবে তার উপর দিয়ে শরীর আরও পরিস্ফুট হয়। যথার্থভাবে ঢাকা পড়ে না।

পোশাকের দুই উদ্দেশ্য

কুরআন মাজীদে পোশাক সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا

অর্থ : 'হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা আবৃত করে এবং তা শোভাস্বরূপ।'[৬২]

কুরআন মাজীদ এ আয়াতে পোশাকের দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে–

এক. এর দ্বারা সতর ঢাকা হয়;

দুই. এর দ্বারা মানবদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

---

৬১. বুখারী, হাদীছ নং ৬৫৪২; তিরমিযী, হাদীছ নং ২১২২; আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৩৩৪
৬২. সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৬

বর্তমান দুনিয়ায় পোশাকের এই উভয় উদ্দেশ্য খতম হয়ে গেছে। আজকাল মানুষ এতবেশি আঁটসাঁট পোশাক পরে, যা দ্বারা সতর আরও পরিস্ফূট হয়। তাই এর নাম যতই পোশাক হোক না কেন, শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পোশাক নামের উপযুক্ত নয়। যেহেতু এর দ্বারা পোশাকের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, তাই এরূপ পোশাক পরা জায়েয নয়। আজকাল নারী-পুরুষ সকলেই এ জাতীয় পোশাক পরছে। পোশাক পরা সত্ত্বেও আজ তাদের শরীরের লজ্জা-শরমের অংশটুকু মানুষের চোখে পড়ছে। এটা কী রকমের পোশাক হল? অথচ এ জাতীয় পোশাকই তাদের বেশি পসন্দ। যাহোক শরী'আত নারীকে প্রথম হুকুম দিয়েছে এই যে, তারা যেন বেশি আঁটসাঁট ও পাতলা পোশাক না পরে; বরং তারা যেন এমন পোশাকই পরে, যা দ্বারা সতর ভালোভাবে ঢাকা পড়ে। মনে রাখতে হবে, নারীর চেহারা ও হাত ছাড়া গোটা শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত।

বাইরে যাওয়ার সময় নারীর বেশভূষা কেমন হবে

দ্বিতীয় হুকুম তাদের বাইরে যাওয়া সম্পর্কে। যখন কোনও প্রয়োজনে তারা বাইরে যাবে কিংবা গায়রে মাহরামের সামনে আসবে, তখন তার পুরো শরীর ঢেকে আসতে হবে। তা বড় কোনও চাদর দিয়ে হোক কিংবা বোরকা দ্বারা, যাতে তারা পুরুষদের জন্য ফিতনার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের মাধ্যমে সমাজে ফিতনার বিস্তার না ঘটে।

নারীর জন্য অলংকার ব্যবহারের অনুমতি আছে বটে, কিন্তু হুকুম দেওয়া হয়েছে তারা যখন বাইরে যাবে তখন যেন এমন কোনও অলংকার পরিধান না করে যাতে কোনও রকম আওয়াজ হয়। কেননা অলংকারের আওয়াজ পুরুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।

এমনিভাবে তাদেরকে এ হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করে। কারণ সুগন্ধির কারণে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। হাদীছ শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

"কোনও নারী যখন সুগন্ধি মেখে বাইরে যায়, তখন শয়তান তার পিছনে লেগে পড়ে।"

চেহারার পর্দা

ইদানীং কিছু লোককে বলতে শোনা যায়, নারীর সারা অংগ পর্দার অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু তার চেহারায় পর্দার হুকুম নেই। এটা তাদের ভুল

ধারণা। ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। চেহারা অবশ্যই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদেই এর প্রমাণ আছে। কুরআন মাজীদ নারীদেরকে লক্ষ করে বলছে–

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

অর্থ : 'তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়।'[৬৩]

এ আয়াতে যে جَلَابِيْب শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, এটি جِلْبَابٌ এর বহুবচন। جِلْبَابٌ এমন বড় চাদরকে বলে, যা দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর ঢাকা যায়। বোরকার সাথে তার পার্থক্য কেবল সেলাই থাকা না-থাকা। তাতে সেলাই থাকে না আর বোরকা যথানিয়মে কেটে সেলাই করে নেওয়া হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় নারীগণ جِلْبَابٌ –ই ব্যবহার করতেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে– আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের جِلْبَابٌ নিজেদের সম্মুখদিকে নামিয়ে দেয়। এই নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কেবল এটাই, যাতে চেহারা ঢাকা পড়ে যায় এবং তা মানুষের নজরে না আসে। সুতরাং বোঝা গেল চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত এবং তা কুরআন মাজীদ দ্বারাই প্রমাণিত।

আসল উদ্দেশ্য বেপর্দা হওয়া

আমি বলব, যারা বলছে চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা মূলত পর্দা থেকেই বের হয়ে যেতে চাচ্ছে। সরাসরি তো আর বেপর্দা হওয়ার কথা বলতে পারে না, তাই চেহারায় পর্দা না থাকার ছল গ্রহণ করছে। আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, যারা চেহারার পর্দাকে অস্বীকার করছে তারা আজ পর্যন্ত কখনও সেইসব নারী সম্পর্কে টু-শব্দটি করেনি, যারা বাইরে বেপর্দা ঘোরাফেরা করে। তাদের চেহারা তো চেহারা, সবই তো খোলা থাকে। গলা খোলা, বাহু খোলা, পায়ের নলা খোলা, বুক-পিঠ খোলা, তার উপর যতটুকু ঢাকা তাও অতিরিক্ত আঁটসাঁট ও পাতলা পোশাকে, যা শরীরকে আরও বেশি প্রদর্শন করে। এসব নারীদের লক্ষ করে তারা তো কোনও আপত্তি জানায় না। তাহলে চেহারায় পর্দা না থাকার ধুয়া তোলার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কী? কেন তারা অহেতুক এই মাসআলা নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করছে যে, চেহারায় পর্দা আছে কি না?

---

৬৩. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯

নারী-পুরুষের প্রভেদ ঘুচে গেছে

আজকাল সমাজের চারদিকে যে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, তার বড় কারণ হল কুরআন মাজীদের বিধানাবলীকে পাশকাটিয়ে চলা। কুরআন মাজীদ সামাজিক শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যেসকল বিধান দিয়েছে, তা ব্যাপকভাবে লংঘন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিষয়ে মানুষ পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ করছে। চারদিকে তাদের অনুকরণ করার প্রতিযোগিতা। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে মানুষ যা-কিছু করছে, আমাদের লোকজনও নির্বিচারে তাই করে যাচ্ছে। সেখানে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সে পার্থক্য এমনভাবেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অনেক সময় চেনাই মুশকিল হয়ে যায় সামনে যে আসছে সে নারী না পুরুষ।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– সেসকল পুরুষের প্রতি লা'নত, যারা নারীর অনুকরণ করে এবং সে সমস্ত নারীর প্রতিও লা'নত, যারা পুরুষের অনুকরণ করে।

আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষকে পৃথক দু'টি শ্রেণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সে পার্থক্য রক্ষা করা চাই। উভয়ের পোশাক-আশাকে এমন বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, যাতে পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী হিসেবেই চেনা যায়। কিন্তু আজকের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা নারী-পুরুষের সেই বৈশিষ্ট্য এবং উভয়ের মধ্যকার প্রভেদ খতম করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ

আজকাল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ যেই পথে চলছে, আমরাও সেই পথে চলা শুরু করে দিয়েছি। সেখানে যেমন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সর্বত্র পদে-পদে যেমন নারী-পুরুষ একাকার হয়ে আছে, উভয়ের মধ্যে কোনও রকমের পার্থক্য নেই, তেমনি অবস্থা আমাদের দেশেও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানসমূহে নারীরা সেজেগুজে হাজির হয়ে যায়। সব রকমের সাজসজ্জা গ্রহণ করে। পোশাক-আশাক, অলংকার ইত্যাদিতে সেজে কে কত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, এসব অনুষ্ঠানে তারই প্রতিযোগিতা চলে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই যেন থাকে নিজ অলংকার ও পোশাক-আশাক প্রদর্শন করা। আজকাল এসব অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা রাখা হয় না। একটা সময় এমন ছিল যখন পুরুষদের জন্য আলাদা স্থান এবং নারীদের জন্যও আলাদা স্থানের ব্যবস্থা

রাখা হত। এখন সেই কাহিনী খতম হয়ে গেছে। এখন বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ স্বাধীনভাবে একে অন্যের সংগে দেখা-সাক্ষাত করছে, পাশাপাশি বসে গল্পগুজবে মেতে উঠছে। আর এরই পরিণাম যে, আজ আমাদের সমাজ সে আগেকার সমাজ নেই। চারদিকে শুধু ফিতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও অস্থিরতা। সকলেই তা দেখছে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ফিতনা। সর্বত্র লড়াই। ঘরে-ঘরে নাজায়েয সম্পর্ক গড়ে উঠছে আর তাকে কেন্দ্র করে দেখা দিচ্ছে নানা অশান্তি।

পর্দাহীনতার সয়লাব

এসবই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করার পরিণাম। কুরআন মাজীদ বলছে– উত্তম চরিত্র অবলম্বন কর, চরিত্রকে পাক-পবিত্র রাখ, শুচিতা ও শুদ্ধতা বজায় রেখে চল, পবিত্র জীবনযাপন কর। কিন্তু আমরা তাতে আদৌ কর্ণপাত করছি না। আমরা চলছি উল্টোপথে। এসব গুণ অর্জনের জন্য শরী'আত আমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছে এবং শরী'আত যে ব্যবস্থা দিয়েছে, হিজাব ও পর্দাও তো তার একটি। কিন্তু আমরা কি তা ধরে রেখেছি? আদৌ রাখিনি, বিলকুল ছেড়ে দিয়েছি। আর বেপর্দার ঢল প্রবল বেগে ছুটছে। প্রায় শতবর্ষ আগে বাঁধভাঙা এ ঢলের সূচনা হয়েছে। তার আগে অবস্থা এরকম ছিল না। তখন তো মানুষ কল্পনাও করতে পারত না যে, একজন মুসলিম নারী বেপর্দা হয়ে বাইরে যাবে। মুসলিম উম্মাহ শত শত বছর পর্দার বিধান ধরে রেখেছিল। কিন্তু যখন ইংরেজ শাসনের কাল আসল, অবস্থা আমূল বদলে গেল। ইংরেজগণ মানুষকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল যে, সভ্য, শিক্ষিত ও মডার্ণ হওয়ার একটা বড় নিদর্শন হল বেপর্দা হওয়া। আমাদের নারী ও পুরুষগণ তা বিশ্বাসও করে নিল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল বেপর্দা চালচলন। প্রথমে যখন শুরু হয়েছিল তখন তো দু'-চারজন নারীই পর্দা ছেড়েছিল। তখনও অধিকাংশ নারী পর্দা রক্ষা করেই চলত। কিন্তু উত্তরোত্তর পর্দাহীনতা বাড়তে থাকল। সেই প্রথম যখন শুরু হয়েছিল তখন আকবর এলাহাবাদী বলে উঠেছিলেন–

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں
اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا
پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا
کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

'কাল যখন কতিপয় নারীকে বেপর্দা দেখা গেল,
দ্বীনী সম্ভ্রমবোধে আকবর পড়ে গেল মাটির উপরে।
সে তাদের সুধাল, তোমাদের পর্দা কোথায় গেল?
বলে উঠল, আমাদের পর্দা পড়েছে গিয়ে আজ পুরুষের আক্‌ল 'পরে।'

নারীর বিবেক-বুদ্ধির উপরে পর্দা পড়ে গেছে

মরহুম আকবর এলাহাবাদী অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে পর্দা ছিল নারীর, তা আজ পুরুষের আকলের উপরেই পড়ে গেছে। যে কারণে আজ পুরুষ ভাল-মন্দ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে না। তবে আমি বলব, পর্দা বেশি পড়েছে নারীরই বিবেক-বুদ্ধির উপর। তারা পাশ্চাত্যের অপপ্রচারের ফাঁদে পড়ে গেছে। নিজ বুদ্ধি-বিবেককে কাজে না লাগিয়ে তারা যা বলছে তাই অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। একটুও চিন্তা করল না আমার জন্য কোন্‌টা কল্যাণকর এবং কোন্‌টা ক্ষতিকর। পাশ্চাত্য ধোঁকা অনেককেই দিয়েছে। নারী-পুরুষ সবাই তার ফাঁদে পা রেখেছে। তবে বেশি পরিহাস নারীর সংগেই করা হয়েছে। নারী-সমাজই পাশ্চাত্য দ্বারা বেশি প্রতারিত হয়েছে। তাই বলি, নারীর আকল-বুদ্ধির উপরেই পর্দা পড়ে গেছে, যদ্দরুন সে নিজের সতীত্ব ও নিজের মর্যাদা এবং নিজের সম্ভ্রম ও নিজের গৌরবময় স্থান ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বিক্রিপণ্য বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। প্রোপাগাণ্ডা বড় ভয়াবহ জিনিস। নির্জলা মিথ্যাকেও তা সত্যে পরিণত করে ফেলে। পর্দার ক্ষেত্রে তো তাই হয়েছে। অপপ্রচারের মাধ্যমে মিথ্যাকে এমন সত্য বানিয়ে ফেলা হয়েছে যে, আজ নারী-পুরুষ সকলেই মিথ্যার ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। পশ্চিমা জাতিসমূহের এটা মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য যে, তারা প্রোপাগাণ্ডার জোরে যখন যেই মিথ্যাকে ইচ্ছা হয় সত্যে পরিণত করে দেখায়। তাদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা বিশ্বের সব নিয়ম-নীতি উলট-পালট করে ফেলেছে।

জনসংখ্যার অর্ধেক বেকার বসে থাকবে

পর্দার বিধান ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য কত রকমের আপত্তিই না খাড়া করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নারী-সমাজকে পর্দার ভেতরে বসিয়ে দিলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই তো বেকার হয়ে যাবে। তাদের কোনও কাজ থাকবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে এবং অর্থনীতিতে ধস নামবে। এসব কথা আজকাল খুব

জোরেশোরেই বলা হচ্ছে এবং চতুর্মুখে প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে, এ কথা যদি এমন কোনও দেশে বলা হত, যেখানে দেশের কর্মক্ষম সকল পুরুষ কাজে লেগে আছে, সকলেই উপার্জন করছে, দেশের একজন পুরুষও বেকার বসে নেই, তখন তো এ কথাটির একটা যুক্তি থাকতো এবং একরকম গ্রহণযোগ্যতাও পেত। কিন্তু যে দেশে বড়-বড় ডাক্তার এবং বি.এ, এম.এ ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী হাজার-হাজার লোক বেকার পড়ে আছে, কাজের সন্ধানে জুতার তলা ক্ষয় করে বেড়াচ্ছে, সেই দেশে এ জাতীয় কথা কি এক ধরনের পরিহাস নয়? তোমরা যে দেশের শিক্ষিত পুরুষদেরকে এখনও পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারনি এবং কোনও চাকরি জুগিয়ে দিতে পারনি, সেখানে নারীদের নিয়ে মাতামাতি করছ আর এই বলে শোর তুলছ যে, নারীদেরকে পর্দার ভেতরে রাখলে দেশের অর্ধেক নাগরিক বেকার হয়ে যাবে?

কাজ বলতে কী বোঝায়

আসলে কাজ বলতে কী বোঝায় সেটাও একটা কথা। তারা যে বলছে অর্ধেক নাগরিক বেকার হয়ে যাবে, তার মানে তাদের মাধ্যমে কোনও অর্থ উপার্জন হবে না। তাদের দৃষ্টিতে কাজ সেটাই, যার মাধ্যমে পয়সা আসে। যে কাজে অর্থকড়ি নেই, তাদের দৃষ্টিতে সেটা বেকারত্বের নামান্তর। যে ব্যক্তি গৃহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে, ঘরকে সুন্দর-সুশৃংখলভাবে চালানোর কাজ আঞ্জাম দেয়, তাদের দৃষ্টিতে সে কোনও কাজই করছে না। অথচ এটা কতই না গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঘরের পরিবেশকে শোধরানো, ফ্যামিলি সিস্টেমকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা রক্ষায় ভূমিকা রাখা তো এতবড় কাজ, যা না হলে মানবসভ্যতার পতন অনিবার্য হয়ে যায়। এরকম মহিমাপূর্ণ কাজই তো নারী করছে। তার এ কাজের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। একটি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সমাজ গড়ার পিছনে সে যে ভূমিকা রাখছে, তার এই কৃতিত্বকে যথাযথ মর্যাদার দৃষ্টিতেই দেখা উচিত।

সময় থাকতে সচেতন হোন

যাহোক আমার আরয এই যে, এখনও সময় আছে, আমাদের সকলের সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশ এখনও পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছে যায়নি, যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, এই কঠিন সময়েও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে,

পরিস্থিতিতে দিন-দিন পরিবর্তন আসছে। বিভিন্ন দাওয়াতী মেহনতের ফলে মানুষের হুঁশ-জ্ঞান ফিরে আসছে। তাবলীগী জামাতের মেহনত এবং 'উলামায়ে কেরামের ইসলাহী কার্যক্রমের সুফল আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ নারী-সমাজের ভেতরও চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে, আমরা ম্যাম নই, আমরা মুসলিম নারী। আমরা পশ্চিমের বেপর্দা নারী নই, আমাদের জন্ম মুসলিম সমাজে। আজ মুসলিম নারীদের ভেতরে মূল্যবোধ সৃষ্টি হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে কিভাবে তাদের চরিত্র, সতীত্ব ও নারীত্বের মর্যাদা লুণ্ঠন করা হচ্ছে। তারা আপন মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছে এবং কিভাবে তাদের এসব গুণ রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে তারা ভাবছে। এই অল্পকিছুদিন আগেও পর্দাহীনতার যে ভয়াবহ রূপ লক্ষ করা যাচ্ছিল, সে অবস্থা এখন নেই। তখন বাজারে, রাস্তায় বোরকা চোখেই পড়ত না। আলহামদুলিল্লাহ এখন বোরকা দেখা যাচ্ছে এবং নারী-সমাজ পর্দার দিকে ফিরে আসছে। তাই বলছি পরিবেশ-পরিস্থিতি এতবেশি নষ্ট হয়নি যে, তার সংশোধনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আকবর এলাহাবাদী যে কথা বলেছিলেন, পুরুষদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পর্দা পড়ে গেছে, তার সেই কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা দরকার। পুরুষগণ যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের গৃহের পরিমণ্ডলে শরী'আতের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টা করে এবং ঘরের লোকজনকে শরী'আতের অনুসরণে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হয়, তবে ইনশাআল্লাহ পরিবেশ অবশ্যই বদলাবে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে কুরআন মাজীদে যে সফলতার ওয়াদা করা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ তা অর্জিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং আপনাদের সকলকেও এর উপর আমলের তাওফীক দান করুন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১৫ খণ্ড, ২০১-২১৪ পৃষ্ঠা
বায়তুল মুকার্‌রাম জামে' মসজিদ, করাচী

পর্দাহীনতার সয়লাব

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্যের ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

কিছুকাল যাবত 'উলামায়ে কিরাম, মুসলিম চিন্তাশীল মহল ও দ্বীনী জামাতসমূহের মনোযোগ বিশেষভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। এ বিষয়ে মনোযোগ এতবেশি মাত্রায় দেওয়া হচ্ছে যে, এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় পিছনে পড়ে গেছে। সেদিকে বিলকুল দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে না কিংবা খুব কমই করা হচ্ছে। পরিণামে একদিকে তো রাজনীতি ও আইন-কানুনে দ্বীনের দখল ও প্রবেশ ঘটছে খুব ধীরগতিতে, অন্যদিকে সমাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির ভেতর বদদ্বীনীর অনুপ্রবেশ ঘটছে ক্ষীপ্রবেগে। মানুষজন অতি দ্রুতগতিতে অপসংস্কৃতি ও বেদ্বীনী কার্যক্রমের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে লজ্জা-শরম ও চরিত্রবত্তার ধারণা লোপ পেয়ে গেছে। বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা অতীত দিনের কাহিনীতে পরিণত হয়ে গেছে। অফিস-আদালতে ঘুষ ও দুর্নীতির জয়-জয়কার। হাট-বাজার সুদ, জুয়া, ধোঁকা, প্রতারণা ও কালোবাজারির দখলে। এসব যে মন্দকাজ, সে ধারণাই মানুষের অন্তর থেকে মুছে গেছে। সমাজ-চোখে এসব এখন আর কোনও ঘৃণ্যকাজ নয়। তাই এগুলোর প্রতিরোধ ও প্রতিহতকরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। মনোযোগ যা-কিছু তা সবই ওই রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে।

সমাজে যেসব অন্যায়-অনাচার ও বেদ্বীনী কর্মকাণ্ড চলছে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা ও তার প্রতিরোধকল্পে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। আমরা আজকের এ মজলিসে পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকবর্গের সামনে কিছু আরয করতে চাই।

আমাদের এ দরদপূর্ণ ও বিনীত গুজারেশ যেমন 'আম-মুসলমানদের প্রতি, তেমনি 'উলামায়ে কিরাম ও চিন্তাশীল মহলের প্রতিও বটে। যারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাদেরও কর্তব্য এ কথাগুলোকে গুরুত্বের সংগে বিবেচনায় নেওয়া।

ইসলাম নারীকে অভূতপূর্ব ইজ্জত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তার মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে ইসলাম যে শিক্ষাদান করেছে, দুনিয়ার অন্য কোনও ধর্ম ও জাতির ভেতর তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদাদানের পাশাপাশি তার নাগরিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষার জন্য যেসকল বিধান ইসলামে দেওয়া হয়েছে, তা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণকর, মানববুদ্ধির পক্ষে যা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়।

মুসলিম নারী এজন্য নয় যে, সে নিজ ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার সাথে সবরকম নাগরিক অধিকার ভোগ করা সত্ত্বেও কেবল জীবিকা সংগ্রহের লক্ষে জীবন ক্ষয় করে বেড়াবে; বরং তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঘরের রাণী হয়ে থাকার জন্য। এ কারণেই ইসলাম তার জীবনের কোনও পর্যায়েই তার উপর কোনওরকম আর্থিক ভার চাপায়নি। বিরল দু'-চারটি অবস্থা বাদ দিলে সমগ্র জীবনে আর্থিক কোনও দায় তার উপর বর্তায় না। বিবাহের আগে তার ব্যয়ভার পিতাকে বহন করতে হয় এবং বিবাহের পর স্বামী বা সন্তানকে। কাজেই সাধারণভাবে অর্থকড়ির জন্য তার রাস্তায় বের হওয়ার কোনও দরকার পড়ে না। তার ইজ্জত-সম্ভম এবং তার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের নিরাপত্তাবিধানের লক্ষে হুকুম দেওয়া হয়েছে–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

অর্থ : 'নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে পদর্শন করা হত।'[৬৪]

প্রয়োজন ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি অবশ্যই দিয়েছে। কিন্তু সেই বের হওয়ারও কিছু আদব-কায়দা আছে। কিছু শর্ত আছে। সেদিকে লক্ষ রেখেই তারা ঘর থেকে বের হবে এবং নিজেদেরকে লোভাতুর চোখের নিশানা হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

নারীর ওই মর্যাদার দিকে লক্ষ করেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বভাবসম্মত কর্মবণ্টন করা হয়েছে। পুরুষ উপার্জন করবে এবং নারী ঘরের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেবে। পুরুষের অর্থোপার্জন করে আনা নারীর প্রতি তার কোনও

---

৬৪. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

অনুগ্রহ নয়, এটা তার দায়িত্ব। বরং এ ব্যাপারে ইসলাম নারীকে এই ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে যে, ঘরের ব্যবস্থাপনাও আইনগতভাবে তার দায়িত্ব নয়। অবশ্য নৈতিকভাবে তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দান করা হয়েছে যে, সে যেন স্বামীগৃহের দেখাশোনা করে, কিন্তু কোনও নারী যদি তার এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে, তবে পুরুষ তাকে আইনের জোরে তা করাতে বাধ্য করতে পারবে না। পক্ষান্তরে নারীর জন্য পুরুষের অর্থোপার্জন করার দায়িত্ব যেমন নৈতিক, তেমনি আইনগতও। কোনও পুরুষ যদি এ ব্যাপারে অবহেলা করে, তবে নারী আইনের আশ্রয় নিয়ে তাকে সে দায়িত্ব আদায়ে বাধ্য করতে পারে।

ইসলাম নারীকে এই বিশেষত্ব দান করেছে এই লক্ষে যে, যাতে সে অর্থোপার্জনের ঝামেলায় পড়ে সামাজিক অনর্থের কারণ না হয়; বরং সে ঘরের মধ্যে থেকে জাতিগঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। ঘরের পরিবেশ সমাজগঠনের এমন ভিত্তি, যার উপর গোটা সভ্যতার ইমারত প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি এই ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ক্ষতি গোটা সমাজেই সংক্রমিত হয়। পক্ষান্তরে এক মুসলিম নারী যদি নিজ গৃহের পরিবেশ সুচারুরূপে গড়ে তোলে এবং সেই নবজাতকদের সুষ্ঠু শিক্ষাদান করে, যাদেরকে আগামী দিনে দেশ ও জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে, তবে গোটা জাতি আপনা-আপনিই শুধরে যেতে পারে। এভাবে একদিকে নারী-পুরুষ উভয়ের মান-সম্ভ্রম রক্ষা পায়। সেইসংগে এর মাধ্যমে এমন এক সুন্দর ও সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনও গড়ে ওঠে, যা পরিণামে গোটা সমাজের পবিত্রতা ও সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করে।

কিন্তু যে পরিবেশে সামাজিকসুষ্ঠুতা ও পবিত্রতার কোনও মূল্যই নেই এবং যেখানে নীতি-নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের বদলে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকেই জীবনের লক্ষবস্তু মনে করা হয়, সেখানে এই কর্মবণ্টন পর্দা ও লজ্জাশীলতাকে কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়; বরং পথের কাঁটা গণ্য করা হয়।

সুতরাং পাশ্চাত্যে যখন যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ থেকে মুক্তির বাতাস বইতে শুরু করল, তখন নারীর গৃহে অবস্থানকে পুরুষেরা নিজেদের জন্য ডবল মসিবত মনে করতে লাগল। একদিকে তো পুরুষের লোভাতুর স্বভাব নারীর কোনও দায়িত্বগ্রহণ করা ছাড়াই কদমে কদমে তার দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ আহরণ করতে চাচ্ছিল, অন্যদিকে সে তার আইনসম্মত স্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণকেও একটা বাড়তি বোঝা মনে করছিল। সুতরাং এই উভয় সংকটের নির্লজ্জ যে সমাধান সে খুঁজে বের করল, তারই আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর নাম হল 'নারীমুক্তির আন্দোলন'।

নারীকে সবক দেওয়া হল, তোমরা এ যাবতকাল ঘরের চারদেয়ালে বন্দি থেকেছ। এখন মুক্তির যুগ। এখন তোমাদেরকে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অংশ নিতে হবে। এতদিন তোমাদেরকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এবার বাইরে চলে এসো। জীবনের সকল শাখায় তোমরা নেমে পড়। মানুষ হিসেবে তোমাদের যে মর্যাদা প্রাপ্য, নিজ ক্ষমতাবলে তা কেড়ে নাও। তোমরা জাগতিক মর্যাদার উচ্চশিখরে পৌছে যাও। সকল ক্ষেত্রে উঁচু উঁচু পদ তোমাদের অপেক্ষা করছে।

বেচারী নারী এই চিত্তাকর্ষী শ্লোগানে মাতোয়ারা হয়ে ঘরের বাইরে নেমে আসল। যাবতীয় প্রচারমাধ্যমে শোর তুলে তার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মানো হল যে, শতশত বছরের দাসত্ব থেকে আজ সে মুক্তিলাভ করতে যাচ্ছে। তার দুঃখ-কষ্টের চির অবসান হতে যাচ্ছে। এই হৃদয়কাড়া শ্লোগানের আশ্রয়ে নারীকে টেনে-হেঁচড়ে রাস্তায় নামানো হল। তাকে অফিসে, আদালতে পিয়ন ও ক্লার্ক বানিয়ে দেওয়া হল। তাকে পরপুরুষের প্রাইভেট সেক্রেটারি বানানো হল। তাকে স্টেনোটাইপিস্ট বনার 'মর্যাদা' দেওয়া হল। তাকে হাজারও মানুষের আজ্ঞা পালনের জন্য এয়ারহোস্টেস পদে নিযুক্ত করা হল। ব্যবসা চমকানোর জন্য তাকে সেলসগার্ল ও মডেল গার্ল হওয়ার মর্যাদা দান করা হল এবং তার একেকটি অঙ্গকে প্রকাশ্য বাজারে লাঞ্ছিত করে গ্রাহকদের আহ্বান জানানো হল, এসো আমাদের কাছ থেকে পণ্য কেনো। এমনকি যেই নারীর মাথায় প্রকৃতি একদিন ইজ্জত-আব্রুর মুকুট রেখেছিল এবং যার গলায় চরিত্র ও পবিত্রতার হার পরিয়েছিল, সেই নারীই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শো-পিস এবং পুরুষের ক্লান্তি নিবারণের বিনোদন সামগ্রীতে পরিণত হল।

নাম তো দেয়া হয়েছিল নারীমুক্তির এবং বলা হয়েছিল তার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতির দুয়ার খুলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, এই সময়কালে খোদ পাশ্চাত্য দেশসমূহে কতজন নারী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে পেরেছে? কতজন নারীকে জজ বানানো হয়েছে? অন্যান্য উঁচু উঁচু পদ কতজন নারীর ভাগ্যে জুটেছে? পরিসংখ্যানে দেখতে পাবেন, এমন নারীর সংখ্যা লাখে মাত্র কয়েকজন হবে। এই গনাগুনতি কয়েকজন নারীকে কয়েকটি পদ দেয়ার নামে বাকি লাখো নারীকে যেই নিষ্ঠুরতার সাথে সড়কে ও বাজারে টেনে নামানো হয়েছে তা নারীমুক্তি প্রহসনের এক বেদনাদায়ক ইতিহাস।

আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে দেখুন, দুনিয়ার যত নিম্নস্তরের কাজ তা সব নারীর কাঁধে চাপানো। রেষ্টুরেন্টসমূহে পুরুষ ওয়েটার কদাচ দেখা যাবে। এই সেবার প্রায় সবটাই নারীরাই আঞ্জাম দিচ্ছে। হোটেলে অতিথিদের কামরা পরিষ্কার করা, তাদের বিছানা-বালিশ পাল্টানো এবং রুম এটেন্ডেন্টের দায়িত্বপালন, এসবই নারীদের প্রতি ন্যস্ত। দোকানে পণ্য বিক্রির জন্য খুব কম সংখ্যক পুরুষই চোখে পড়বে। এ কাজও নারীদের দ্বারাই নেওয়া হচ্ছে। অফিসে রিসিপসনিস্ট হিসেবে সাধারণত নারীদেরকেই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বেয়ারা থেকে ক্লার্ক পর্যন্ত প্রতিটি পোষ্ট বেশিরভাগ এ নম্র-কোমল শ্রেণীরভাগেই পড়েছে আর এসবের মাধ্যমে তাদেরকে গৃহের অবরোধ থেকে মুক্তিদান করা হয়েছে।

প্রোপাগাণ্ডার শক্তিতে মানুষের মন-মস্তিষ্কে এ আজব দর্শন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নারী যদি নিজ ঘরে নিজের, নিজ স্বামীর, পিতা-মাতার, ভাই-বোনের ও সন্তান-সন্ততির পারিবারিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়, তবে এটা হল তার জন্য অবরোধ ও লাঞ্ছনা। আবার এই নারীই যখন পরপুরুষের জন্য খাবার রান্না করে, তাদের কামরা সাফ করে, হোটেল ও জাহাজে খাদ্য পরিবেশন করে, দোকানে মধুর হাসি দিয়ে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অফিসে বসের আদেশ-আবদার রক্ষা করে, তবে এটা নাকি কোনও লাঞ্ছনা নয়; বরং তার মুক্তি ও মর্যাদা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

তদুপরি নিষ্ঠুর পরিহাস হল, অর্থোপার্জনের জন্য আট-আট ঘন্টা কঠোর ও লাঞ্ছনাকর ডিউটি আদায় করা সত্ত্বেও গৃহস্থালির কাজকর্ম থেকে কিন্তু নারী আজও মুক্তি পায়নি। ঘরের যাবতীয় কাজ আজও আগের মতই তার দায়িত্বেই ন্যস্ত। এমনকি ইউরোপ-আমেরিকায়ও অধিকাংশ নারীই এমন, যাদেরকে আট ঘন্টার ডিউটি শেষে নিজ ঘরে এসে খাবার রান্না করা, বাসনপত্র ধোয়া এবং ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। এই হচ্ছে তথাকথিত নারীমুক্তির পরিণাম, যা খোদ নারীকে তার ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ করতে হচ্ছে। সেইসংগে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যে চরিত্রহীনতা, নৈতিক অপরাধ, বিপথগামিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলার ধ্বংসাত্মক মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, তা কোনও সচেতন ব্যক্তির অজানা নয়। পারিবারিক-ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে ভাঙন। বংশ ও গোত্রের কোনও ধারণা নেই। সতীত্ব ও চরিত্র অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের আধিক্য ঘর-সংসারকে উজার করে দিয়েছে।

যৌবনের উন্মাদনা কাল্পনিক সীমারেখাকেও অতিক্রম করে ফেলেছে এবং অশ্লীলতার ভয়ঙ্কর দানব মানবিক মূল্যবোধ একেকটি করে খেয়ে সাবার করেছে।

এসব কোনও কল্পজগতের ঘটনা নয়; বরং পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনঃস্বীকার্য পরিস্থিতি, যে-কেউ সেখানে গিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যাদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি, তাদের কাছেও বিভিন্ন মাধ্যমে এসব সংবাদ অবশ্যই পৌঁছে থাকে। পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রেমী যেসকল লোক প্রথমদিকে সেখানে গিয়ে অভিবাসিত হয়েছে, কিছুকাল পর্যন্ত সেখানকার চাকচিক্য উপভোগ করার পর যখন নিজেরা সন্তান-সন্ততির অধিকারী হয়েছে এবং নিজ সন্তানদের দূরাবস্থা তাদের সামনে এসে গেছে, তখন তাদের যে কী পরিমাণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, তা এখানে বসে কল্পনাও করা যাবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের অন্তরে ঈমানের কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে, এরকম কোনও মুসলিম কি এটা পসন্দ করবে যে, আল্লাহ না করুন, এই ঘৃণ্য-কদর্য অবস্থার পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশ ও আমাদের সমাজেও ঘটুক? যদি তা পসন্দ না করে থাকে এবং নিশ্চিত করেই বলা যায় 'পসন্দ করবে না, তবে এটা কী পরিহাসের কথা যে, আমরাও ধীরে ধীরে পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার সেই পথেই চলছি, যা পাশ্চাত্যকে সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক দেউলিয়াত্বের শেষ সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে?

একটা সময় ছিল, যখন মুসলিম পরিবারসমূহের নারীগণ যানবাহনেও পর্দা ছড়িয়ে চলাফেরা করত এবং যখন পর্দাকে আভিজাত্য ও মর্যাদার নিদর্শন মনে করা হত। অথচ আজ সেই অভিজাত পরিবারসমূহের মেয়েরা বাজারে খোলামাথায় ঘোরাফেরা করছে। বড় বড় শহরের অবস্থা তো এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, বোরকা পরিহিতা নারী কদাচিতই চোখে পড়ে। পর্দাহীনতার সয়লাব লজ্জা-সম্ভ্রমের শেষ চিহ্নটুকুও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এমনকি দ্বীনদার পরিবারেও পর্দার গুরুত্ব উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। কিছুলোক পর্দাহীনতার সমর্থনে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের পর্দাহীনতাকে ইউরোপ-আমেরিকার পর্দাহীনতার সাথে তুলনা করা যায় না, এখানকার পর্দাহীনতা ওই পরিস্থিতি কিছুতেই সৃষ্টি করতে পারবে না, যা পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের এসব কথা নিতান্তই অন্তসারশূন্য। বস্তুত পাশ্চাত্যে যা-কিছু হয়েছে বা হচ্ছে, তা স্বভাব-প্রকৃতির সাথে বিদ্রোহ করার অপরিহার্য ফল।

এই বিদ্রোহ যেখানেই হবে, একই পরিণতি সেখানেও ঘটতে বাধ্য। অসার যুক্তি-দর্শন দ্বারা তা রোধ করা যাবে না। যারা পর্দাহীনতার প্রচলন ঘটানোর পর সমাজে চরিত্র ও সতীত্ব বজায় রাখার দাবি করে, তারা হয়ত নিজেরা আহাম্মকীর স্বর্গে বাস করছে অথবা অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবতা এ কথার সাক্ষী যে, যখন থেকে আমাদের সমাজে পর্দাহীনতার রেওয়াজ বাড়ছে, তখন থেকেই গৃহত্যাগ, কুপথে চলা, ধর্ষণ-ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের হার অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে আর এভাবে আমরা পর্দাহীনতার দিকে যতই অগ্রসর হচ্ছি, সেই অনুপাতে পাশ্চাত্য সমাজের অভিশাপও আমাদের এখানে বিস্তার লাভ করছে।

সেই অভিশাপ প্রতিরোধ করার কোনও রাস্তা যদি থেকে থাকে তবে তা কেবলই এই যে, আমরা পর্দা প্রসঙ্গে নিজেদের বর্তমান নীতি বদলে ফেলব। আমরা পুনরায় স্বভাবধর্মের সেই শিক্ষার দিকে ফিরে আসব, যা আমাদেরকে শুচি-শুদ্ধ জীবনযাপনের পথ দেখিয়েছে।

পরিতাপের বিষয় হল, প্রোপাগাণ্ডা ও নষ্ট পরিবেশের প্রভাবে দিন-দিন পর্দাহীনতার মন্দত্ব মানুষের মন-মানসিকতা থেকে মুছে যাচ্ছে। যেসব পরিবার সম্পর্কে কখনও পর্দাহীনতার কল্পনাও করা যেত না, এখন সেখান থেকেও পর্দা উঠে যাচ্ছে। ঘরের যে অভিভাবক, ব্যক্তিগতভাবে পর্দাহীনতাকে খারাপ মনে করে তিনি এই সয়লাবের সামনে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পন করছেন।

আমাদের দৃষ্টিতে এই আত্মসমর্পনই পর্দাহীনতার সয়লাবকে আরও বেশি বেগবান করছে। যদি এসকল লোক আত্মসমর্পন না করে ঘরের লোকজনের মন-মানসিকতা গঠনের চেষ্টা করত, তাদেরকে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান স্মরণ করিয়ে দিত, সে বিধান অমান্যকরণের কঠিন পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করত এবং তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিত যে, তারা নিজ জীবদ্দশায় ঘরের মহিলাদের পর্দাহীনতা দেখতে প্রস্তুত নয়, তবে পরিস্থিতি এতদূর গড়াত না। কিন্তু সময় শেষ হয়ে যায়নি। এখনও যদি তারা এ কাজ করে, তবে ইনশাআল্লাহ এ সয়লাব অবশ্যই প্রতিহত হবে।

আমাদের খতীব ও ওয়ায়েজগণও দীর্ঘদিন যাবত এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ রেখেছেন। এই ইসলামী বিধানের তালীম ও তাবলীগেও যথেষ্ট শিথিলতা এসে গেছে। সম্ভবত ধারণা করা হচ্ছে এ ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহত এখন বেআছর হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সত্যিকারের যে দাঈ, এভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া তার কাজ নয়। এভাবে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে

যাওয়ার পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজ দায়িত্ব আদায়ে রত থাকাই সত্যিকারের দা'ঈ ও মুবাল্লিগের কাজ। ফলাফল তো আল্লাহ তা'আলার হাতে, দা'ঈ কেবল চেষ্টাই করতে পারে। সুতরাং তার কর্তব্য দা'ওয়াতের কাজে উদ্যম না হারানো। অভিজ্ঞতা সাক্ষী, ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে যে কথা বলা হয়, তা একদিন না একদিন ফলপ্রসূ হয়েই থাকে। কুরআন মাজীদে ওয়াদা আছে–

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

অর্থ : 'উপদেশ দাও। নিশ্চয়ই উপদেশ মু'মিনদের উপকৃত করে।'[৬৫]

পরিস্থিতি নিশ্চয়ই উদ্বেগজনক। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমাদের সমাজ এখনও পর্যন্ত ওই পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যেখানে সংশোধনের কোনও আশা বাকি থাকে না। হাজারও উদাসীনতা ও ত্রুটিসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী যে, এখনও মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস অবশিষ্ট আছে। ঈমানের এই মহাসম্পদের কারণে এখনও পর্যন্ত দা'ওয়াত ও তাবলীগের দিক থেকে মানুষের কান বিলকুল বন্ধ হয়ে যায়নি।

এখন প্রয়োজন ইখলাস ও হিকমতের সাথে হৃদয়গ্রাহী পন্থায় অক্লান্তভাবে সত্যের দা'ওয়াত দেওয়া। এ দা'ওয়াত বিশেষ কোনও এক পন্থায় নয়; বরং বহুমুখী পন্থায় হওয়া উচিত। আল্লাহ না করুন, এখনও যদি আমরা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে থাকি, তবে ইসলাহী প্রচেষ্টা ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং এক পর্যায়ে আমাদের সমাজেও সেই সুরতহাল জন্ম নেবে, পাশ্চাত্যজগত আজ যাতে নাজেহাল। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে সেই দিন না দেখান। তিনি ইসলাহ ও সংশোধনমূলক কার্যক্রমের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এ কাজে লাগিয়ে রাখুন– আমীন।

وما علينا الا البلاغ

তারিখ– ২৪ শাওয়াল, ১৪০১ হি.
সূত্র : ইসলাহে মু'আশারাঃ, ৩৫-৩৯পৃ.

---

৬৫. সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পর্দা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্যের ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব সম্প্রতি তার বেলুচিস্তানসফরে এমন দু'টি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, যা আজকাল সর্বত্র আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে একটা তো অতি চমৎকার, প্রশংসনীয় ও আনন্দদায়ক আর দ্বিতীয়টি নেহায়েত দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও কষ্টদায়ক।

তিনি যে প্রশংসনীয় কাজটি করেছেন তা হচ্ছে তার সেই ঘোষণা. যার মাধ্যমে বেলুচিস্তানে শতশত বছর থেকে চলে আসা মোড়লী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে। ওই এলাকার মোড়ল এ যাবতকাল জনগণের উপর স্বতন্ত্র শাসক ও রাজা-বাদশার ক্ষমতা ব্যবহার করত; বরং এমন কিছু দৃষ্টান্ত আছে, যার দ্বারা বোঝা যায় তারা কার্যত নিজেদেরকে প্রভু ও না'উযুবিল্লাহ ঈশ্বর বানিয়ে রেখেছিল। ওই শাসনব্যবস্থার অধীনে যে ভয়াবহ জুলুম-নিপীড়ন চলত এবং সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল নানা বিপর্যয়, তা কোনও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না। এই মোড়লগণ জনগণের কাছ থেকে ভ্যাট-কর আদায় করত, তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগাত, নিজস্ব আদালতে তাদের বিচার করত এবং নিজস্ব জেলখানায় বন্দি করে রাখত। সাম্প্রতিক এই অর্ডিন্যান্সের কারণে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। এখন থেকে তারা আর এসব অন্যায়-অনাচার করতে পারবে না। শতশত বছরের এই স্বৈরশাসনের অবসান নিশ্চয়ই বর্তমান সরকারের এক বিশাল ঐতিহাসিক কৃতিত্ব, যা সর্ববিচারেই আনন্দদায়ক ও ধন্যবাদার্হ। এ অর্ডিন্যান্স যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ এর সুফল হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মোড়লী শাসনের অবসান কেবল একটা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সাধিত হতে পারে না। এটা এমনই এক শাসনব্যবস্থা, যা শতশত বছর থেকে ওই অঞ্চলে শেকড় গেড়ে আছে। ওই পশ্চাদপদ সমাজের শিরা-উপশিরায় তা ঢুকে আছে। সুতরাং যেসকল অসহায়

ও নিরীহ জনগণ এই ব্যবস্থার আওতায় জুলুম-নিপীড়নের শিকার, তাদের একটা বড় অংশ সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং এমনই অন্ধ-অজ্ঞ, যারা নিজ সরদারদের ছাড়া আর কাউকে জানে না, যারা প্রচলিত সরকার, শাসনব্যবস্থা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। তারা তাদের সরদারের উপর অন্য কোনও শক্তির কল্পনাও করতে পারে না। সরদারের বিপরীতে কারও কাছে যে কোনও রকম সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করা যায়, তাদের চিন্তায়ই তা আসে না। সুতরাং যারা কখনও মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস গ্রহণের কথা কল্পনাও করেনি, সেই অসহায় জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তিদানের জন্য কেবল একটা আইনই যথেষ্ট নয়। এই আইন মূলত ওই ব্যবস্থাকে নির্মূল করার প্রথম পদক্ষেপ। এরপর প্রয়োজন হবে দীর্ঘমেয়াদি. গঠনমূলক কার্যক্রম, যার মাধ্যমে ওই দলিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মাঝে আত্মসচেতনতা তৈরি করা হবে এবং তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মানো যাবে যে, তারা মায়ের পেট থেকে তাদের সরদারদের চিরদাসত্বের পরোয়ানা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেনি। এই ভূপৃষ্ঠে তারা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাস নয়। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সরদারদের দাসত্ব নয়; বরং আল্লাহর বন্দেগী করা। নিশ্চয়ই এ কাজের জন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির এবং দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা। তাদেরকে সঠিক তালীম-তারবিয়াত দেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ না করুন যদি এসব কাজে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়, তবে ঘোষিত আইন নিষ্ফলও সাব্যস্ত হতে পারে। আমাদের মতে এ কাজের জন্য 'উলামায়ে কিরাম এবং মসজিদের ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দলীয় কর্মসূচির গণ্ডিতে না থেকে তাদেরকে যদি প্রয়োজনীয় আসবাব-উপকরণ সরবরাহ করা যায় এবং এ কাজের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়, তবে তারা প্রতিটি জনপদে ও গ্রামে-গ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

আমরা আন্তরিকভাবে দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন এই পদক্ষেপকে পূর্ণ সফলতা দান করেন এবং এর সুফল ও কল্যাণ দ্বারা দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি সাধন করেন। আমীন।

বেলুচিস্তানের এ সফরে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় যে কাজটি করেছেন, তা এতটাই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক, যা প্রকাশ করার কোনও ভাষা আমাদের নেই। তার সে কাজটি হল, পর্দার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা এবং পর্দানশীন নারীদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করা।

'দৈনিক জঙ্গ' পত্রিকার ভাষ্যমতে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ–

কোয়েটায় পিপল্স পার্টির যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমন্ত্রিত নারীদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা ছিল। অভিজাতদের প্রতিটি সমাবেশের মত এখানেও মহিলাদের বসার জন্য পুরুষদের থেকে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ ব্যবস্থার উপর আপত্তি তুলে নিজ ভাষণে বলেন–

"এটা ইসলামী সাম্যনীতির পরিপন্থী। একদিকে আমরা পরিবর্তনের কথা বলছি এবং বলছি বৈষম্য দূর হওয়া উচিত, উচিত সাম্যের প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে নারীদেরকে দু'দিন যাবত পর্দার কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। কায়েদে আযমের বোন মাদারে মিল্লাত (ফাতেমা জিন্নাহ) নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন, রা'না লিয়াকত আলী খান আপওয়ার চেয়ারম্যান এবং প্রাদেশিক গভর্ণর হতে পারেন, বেগম লিয়াকত ও বেগম ভুট্টো রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে পারেন, এসবই হতে পারছে অথচ এই মহিলাদেরকে ডবল বোরকা পরিয়ে রাখা হয়েছে। তাদেরকে মূল প্যাণ্ডেলের পিছনে রাখা হয়েছে। এটা কেমন কথা? একদিকে আমরা বৈষম্যমূলক কথা বলছি, অন্যদিকে মোড়লী শাসনব্যবস্থার অবসান চাচ্ছি। আমার সাফকথা, মোড়লী শাসনব্যবস্থা লোপ করার আগে এই বৈষম্য দূর কর। নারীদেরকে ঘরের বাইরে নামিয়ে আন।"[৬৬]

সত্যিকথা হল, প্রাধনমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে মুসলিম উম্মাহ'র অন্তরে এমন কঠিন আঘাত লেগেছে, যদ্দরুন সরদারি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্তির ঐতিহাসিক ঘোষণার আনন্দ তাতে ম্লান হয়ে গেছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে খুব সম্ভব এটাই প্রথম ঘটনা যে, কোনও সরকারপ্রধানের পক্ষ থেকে পর্দার মত কুরআনী বিধানের বিপরীতে এরকম বিষোদগার করা হল। আল্লাহ তা'আলা যেই বিধানের জন্য কুরআন মাজীদে দুই রুকূ' পরিমাণ আয়াত নাযিল করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীছ দ্বারা যার গুরুত্ব প্রমাণিত এবং যার উপর রয়েছে প্রতিযুগের মুসলিমদের ঐকমত্য, তাকে 'জেলে বন্দি করা', 'বৈষম্য' প্রভৃতি শব্দবানে বিদ্ধ করা কতই না ন্যাক্কারজনক। আশ্চর্যের কথা হল, প্রধানমন্ত্রী বার বার ঘোষণা করছেন এ দেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হবে, অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণের জন্য এভাবে প্রকাশ্য ডাক দিচ্ছেন এমনকি একে মোড়লী শাসন বিলুপ্তির উপরও অগ্রাধিকার দিচ্ছেন! যদি এই কর্মপন্থারই নাম হয় 'প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা', তবে নাজানি ইসলাম-বিরোধিতা বলা হবে কোন্ জিনিসকে! কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নারীদের লক্ষ করে বলছেন–

---

৬৬. দৈনিক জঙ্গ, করাচি, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থ : 'নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'[৬৭]

আর পুরুষদের লক্ষ করে ইরশাদ করেন–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ'

অর্থ : 'তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাবে। এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে।'[৬৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ'

অর্থ : 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মু'মিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়।'[৬৯]

আর এ বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ এত বিপুল সংখ্যক, যা উদ্ধৃত করতে হলে স্বতন্ত্র এক পুস্তিকার দরকার হবে।

প্রধানমন্ত্রী বড় আজব কথা বলেছেন যে, নারীদেরকে পর্দার ভেতর রাখাটা ইসলামী সাম্যের পরিপন্থী! দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তির এরূপ দায়িত্বহীন কথাটি আমরা কী হিসেবে নেব, তা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। 'সাম্যনীতির' অর্থ যদি এটাই হয়ে থাকে যে, নারীদেরকে পর্দার ভেতর থেকে বের করে পুরুষের লোভ-লালসা চরিতার্থের উপঢৌকন বানিয়ে দেওয়া হবে, এই নম্র-কোমল শ্রেণীর মাথায় ঘরের ভেতর ও বাহির উভয় স্থানের কর্মভার চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরুষদেরকে নারীর দায়িত্বভার বহনের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের লোভ-লালসা প্রশমনের সুযোগ করে দেওয়া হবে আর সেই সুযোগে তারা নারীদেরকে অর্থনৈতিক শ্রম-মেহনতের জাতাকলে পিষ্ট করতে থাকবে, তবে আল্লাহ তা'আলাই জানেন জুলুম, নিপীড়ন, বেইনসাফী ও প্রতারণা আর কাকে বলে। আমাদের

---

৬৭. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩
৬৮. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৩
৬৯. সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯

প্রধানমন্ত্রী মুহতারামা ফাতিমা জিন্নাহ, বেগম রা'না লিয়াকত আলী খান এবং বেগম ভুট্টোর উদাহরণও বেশ চমৎকারভাবে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন, পর্দার মত শর'ঈ মাসআলায় এসব বেগমের কর্মপন্থাকে দলীল হিসেবে পেশ করার দ্বারা জনাবের উদ্দেশ্য কী। আজকের মুসলিম নারীগণ কি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা (রাযি.) এবং নারীশ্রেষ্ঠা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর পরিবর্তে এইসব বেগমের অনুসরণ শুরু করে দেবে?

নারীমুক্তির নামে আজ সারাবিশ্বে নারীদেরকে যেভাবে লাঞ্ছিত ও কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে এবং চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষার প্রতিটি বিধানকে জেলখানা ও বৈষম্য সাব্যস্ত করে পাশ্চাত্য-জগত যেভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের শেষ সীমানায় পৌছে গেছে, তার বেদনাদায়ক অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী আমাদের চেয়ে আরও বেশি জানেন বৈকি। তা সত্ত্বেও কি তিনি চাচ্ছেন এসব সৌভাগ্য আমাদের দেশের নারীদেরও অর্জিত হয়ে যাক? পাকিস্তানের শরীফ, সতীসাধ্বী ও চরিত্রবতী নারীগণও নির্লজ্জতা ও অশালীনতার সেই পথে নেমে পড়ুক, যা পাশ্চাত্য ও তার অন্ধ অনুসারীদের জীবন থেকে লজ্জা-শরম, আখলাক-চরিত্র ইজ্জত-সম্ভ্রমের শব্দমালা খারিজ করে দিয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বুদ্ধি, মেধা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বিপুল কর্মোদ্দীপনা দান করেছেন। তিনি নিজ শাসনকালে অনেক সাহসী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জানি না, কখনও কখনও তিনি কেন ভুলে যান যে, এখন তিনি কেবল গরম মেজায কতিপয় তরুণের লিডার নন; বরং তার কাঁধে সমগ্র দেশের দায়িত্বভার, তিনি আজ সাত কোটি মুসলিমের প্রতিনিধি, যাদের প্রতিটি হৃদস্পন্দনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এশ্‌ক ও মহব্বত ধ্বনিত হয়, তারা কুরআন-সুন্নাহ'র স্পষ্ট বিধানের বিপরীতে ধৃষ্টতামূলক কোনও অভিব্যক্তি বরদাশ্‌ত করার নয়। তাই তার উচিত হবে প্রতিটি কদমে বিচক্ষণতা ও ভারিক্কীর পরিচয় দেওয়া এবং এমন কোনও কাজ না করা, যা মুসলিম উম্মাহ'র হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায় আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার আমলনামায় একটা দুষ্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রীকে তার চারপাশ থেকে এমন একদল লোক ঘিরে রাখে, যারা তার প্রতিটি পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানায়, কথায় কথায় তার প্রতি ভক্তি ও প্রশংসার ফুল ছিটায় এবং সম্ভবত তারা এই পদক্ষেপটির ব্যাপারেও তাকে ধারণা দিয়ে থাকবে যে, আপনি পাকিস্তানী জনগণের বিশেষত নারীদের মনের কথা বলেছেন, তাদের কাঙ্ক্ষিত কাজটিই আপনি করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে এরূপ মোসাহেবদের বিভ্রান্তিকর স্তুতি-প্রশংসা

সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ দেশের জনগণের প্রকৃত মতামত এজাতীয় উড়ুক্কে জ্বি-হুজুরদের দ্বারা অনুমান করা যাবে না। এটা অনুমান করা যেতে পারে কেবল আমাদের মত ঝুপড়িবাসীদেরই দ্বারা। এমনিভাবে এ দেশের নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব যারা হোটেলের, নাইটক্লাবের এবং অনুষ্ঠানাদির শোভা শো-পিস হয়ে নিজেদের নারীমর্যাদা ধূলিসাৎ করেছে, তারা নয়; বরং সেইসব গরিব অথচ মূল্যবোধ সচেতন নারীই করে থাকে, যাদের কাছে নিজ গৃহের জেলখানা হোটেল-ক্লাবের স্বর্গ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রিয়।

'আল-বালাগ'-এর পাঠকমাত্রই ভালোভাবে জানেন, আমরা কখনও কেবল বিরোধিতার জন্য সরকার-বিরোধিতাকে আমাদের নীতি বানাইনি। আমরা এ নীতিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি যে, কেবল 'উচিত কথা বলা'-এর প্রশংসা ও সুখ্যাতি কুড়ানোর লক্ষে কারও ন্যায়-অন্যায় সব কাজের নির্বিচার বিরোধিতাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে নেওয়া হবে। সুতরাং আমরা বর্তমান সরকারের সমালোচনা করার সাথে সাথে তার ভালো কাজের প্রশংসা করতেও কখনও কার্পণ্য করিনি। তবে আমরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, সরকারের যে সমস্ত কাজের প্রশংসা বা তার যেসকল সঠিক কাজের সহযোগিতা আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে তা কখনও কোনও রকম প্রলোভন বা রক্তচক্ষুর কারণে নয়; বরং যে নীতি দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর মনে হয়েছে, আমরা সেটাই গ্রহণ করেছি। আর সে কারণেই কুরআন-সুন্নাহ'র এরূপ প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে নীরব থাকতে পারিনি।

প্রধানমন্ত্রী সমীপে আমাদের সহৃদয় বক্তব্য হল, আমাদের দেশ ইতিমধ্যেই কঠিন কঠিন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। জাতির নাজানি কত সংকট এখনও এমন রয়েছে, যার আশুসমাধান প্রয়োজন এবং বলতে গেলে সেগুলো এই জাতির জীবন-মরণ সমস্যা। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য কুরআন-সুন্নাহ ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বিরুদ্ধে এমন স্পর্শকাতর বিষয়কে উসকে দেওয়ার চেষ্টা না করা। কেননা এ প্রসঙ্গে নিজ ব্যক্তিগত মতামত যদি প্রধানমন্ত্রীত্বের মসনদ থেকে সাধারণ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে উম্মতের হৃদয়ে আঘাত করা এবং জাতির মধ্যে অহেতুক বিশৃংখলা জন্মানো ছাড়া দেশের আর কোনও উপকার হতে পারে না।

وما علينا الا البلاغ

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারাঃ, ১১১ পৃ.

নারীর মর্যাদা ও তার কর্মক্ষেত্র

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্যের ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

জনৈক দরদী মুসলিম আমাদের কাছে একটি জাতীয় সংবাদপত্রের দু'টি কাটিং পাঠিয়েছে, তাতে দু'টি প্রতিষ্ঠান তাদের শূন্যপদে নিয়োগদানের জন্য আগ্রহী মহিলাদের কাছে দরখাস্ত তলব করেছে। এজন্য তারা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে। সে বিজ্ঞপ্তির ভাষা নিম্নরূপ–

"পাকিস্তানে নিজস্ব ধরনের প্রথমরিভলভিং রেস্তোরাঁ এবং আন-নাজরা ব্যাংকুইট হল ও সেহের কফিশপের জন্য ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুন্দরী হোস্টেস দরকার। স্মার্ট হওয়ার সাথে সাথে ভালো ইংরেজি বলতে পারা আবশ্যক। ইন্টারভিউর জন্য ওমেদার নারীগণ অবশ্যই বায়োডাটাসহ নিজে সরাসরি দুপুর ১১ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত সময়ের ভেতর সাক্ষাত করুন।"

দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি হল–

"আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য ন্যূনতম মেট্রিক বা এফ.এ. পাশ সেল্‌সগার্ল প্রয়োজন। প্রশিক্ষণকাল হবে ছয় মাস থেকে এক বছর। প্রার্থীনীগণ বায়োডাটাসহ নিজ হাতে লেখা দরখাস্ত এবং পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।"

এই হচ্ছে আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতায় ঘরের চারদেয়াল থেকে মুক্ত নারীর মর্যাদা ও কর্মক্ষেত্র। এ সভ্যতার দাবি হল, সে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং তাকে ঘরের অবরোধ থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার দৃষ্টিতে নারী যদি নিজ ঘরে স্বামী-সন্তান ও বাবা-মায়ের জন্য পানাহার-সামগ্রী তৈরি করে এবং সন্তানের লালন-পালনে ব্যস্ত থাকে, তবে এটা তার পক্ষে নেহায়েত লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপদতা। কিন্তু এই নারীই যদি জাহাজে ও রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন হাজারও ফূর্তিবাজ পুরুষের জন্য নাস্তা ও খাবারের ট্রে সাজিয়ে নিয়ে যায়, দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল বিক্রি করে এবং নিজের ভাবভঙ্গী দ্বারা

দোকানের প্রতি গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে এটা তার জন্য অতি সম্মানজনক ব্যাপার এবং এতেই তার স্বাধীনতা ও প্রগতি। কবি সুন্দর বলেছেন–

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد   جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

'বুদ্ধির নাম রাখলে পাগলামী আর পাগলামীর নাম বুদ্ধিমত্তা
আপনার যা ইচ্ছা তাই করেন হে রূপের কারিগর!'

এসব বিজ্ঞাপনে সেল্‌সগার্ল ও বেয়ারার কাজের জন্য বিশেষভাবে মহিলাদের কাছেই দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে। কোনও পুরুষকে এ কাজে নিয়োগ দান করা হবে না। এটা কি এ কারণে যে, পুরুষরা এসব কাজ করতে পারবে না? বলাবাহুল্য ব্যাপারটা তা নয়। অতএব বিশেষভাবে মহিলাদের কাছে দরখাস্ত চাওয়ার অর্থ তো কেবল এটাই হতে পারে যে, নিজ ব্যবসা চমকানোর জন্য তাদের নারীত্বকে ব্যবহার করাই উদ্দেশ্য। ব্যাপারটা এতটুকুই নয়, যেসব মহিলাকে এ কাজের জন্য নিয়োগ দান করা হবে, তাদের অবশ্যই সুযোগ্য ও স্মার্ট হওয়ার সাথে সাথে সুন্দরীও হতে হবে। কেননা তাদের নারীত্বকে নিজেদের যেই আর্থিক স্বার্থের ভেট বানানো উদ্দেশ্য, তা সাধারণ রূপ ও সৌন্দর্যের নারী দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং তাদের রং ও চেহারা গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়া এবং তাদের স্মিত হাসি রেস্তোরাঁয় বেশি বেশি লোভাতুর খদ্দের টানা এবং তাদের পকেট থেকে বেশি বেশি টাকা খসানোর যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবে যদি নারীর সহজাত সতীত্ব ও পবিত্রতা পদদলিত হয় এবং এর ফলে সমাজে লোভ-লালসার বিষাক্ত জীবাণু ছড়ায়, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। পাশ্চাত্য-সভ্যতা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে সভ্যতার দৃষ্টিতে নারীর কাজই হল তার আকর্ষণীয় চেহারা এবং রং ও রূপ দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন করা আর নারীত্বসুলভ ভাবভঙ্গীকে অন্যের অর্থলালসা মেটানোর জন্য লালসার আগুনে নিজেকে দগ্ধীভূত করা, তার কাছে নারীর সতীত্ব ও চরিত্রের কিই বা মূল্য থাকতে পারে?

যেসকল বিজ্ঞাপনের বক্তব্য আমরা উপরে উল্লেখ করলাম, এটা এ বিষয়ক প্রথম বিজ্ঞাপন নয়, আরও আগে থেকেই এ রকমের বিজ্ঞাপন প্রচার হয়ে আসছে। অতঃপর এ জাতীয় বিজ্ঞাপনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। এখন এগুলো হরহামেশাই সকলের নজরে আসছে।

আমাদের দৃষ্টিতে সমাজগঠনে যাদের কিছুমাত্র অংশীদারিত্ব আছে, তাদের সকলেরই এখন এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার, তা সরকার হোক বা জনগণ, 'উলামা হোক বা বুদ্ধিজীবীগণ, দ্বীনী জামাত হোক বা জনকল্যাণমূলক সংগঠন। এদের সকলেরই এ বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যে, নারীসমাজের ব্যাপারে আমাদের সমাজ কোন্ পথে চলছে। বর্তমানে যা চলছে, তা যদি অব্যাহত ধারায় চলতেই থাকে, তবে শেষপর্যন্ত পরিণতি কী দাঁড়াবে?

আরও প্রশ্ন হচ্ছে, এ দেশের নারীসমাজকে শেষ পর্যন্ত কোন্ মঞ্জিলে পৌছানো আমাদের উদ্দেশ্য? আমরা কি তাদের জন্য অমর্যাদা, নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের সেই মঞ্জিলকেই স্থির করে নিয়েছি, যা আজ পাশ্চাত্য-নারীদের একটা বিশাল সংখ্যা বরং বলা যায় অধিকাংশেরই নিয়তিতে পরিণত? ওই মঞ্জিলে পৌছার পর পাশ্চাত্যের নারী তাদের নারীত্বের অমূল্য রত্নই খুইয়ে বসেনি; বরং প্রকৃতির সংগে বৈরিতার পরিণামে সেখানকার পরিবারব্যবস্থাও এখন ভেঙে চুরমার।

পাশ্চাত্য-সমাজে নারী এখন রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিচ্ছে, হোটেলে অতিথিদের বিছানাপত্র পাল্টে দিচ্ছে। সেখানে এখন নারীদেহের প্রদর্শনী দ্বারা দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সবকিছুতে চমক সৃষ্টি করা হচ্ছে। এককথায় দুনিয়ার এমন কোনও হীন কাজ নেই, যা নারীর দ্বারা আদায় না করা হচ্ছে। আজ সেখানে শিশু তার মাতৃকোলের মমতা থেকে বঞ্চিত। নারী ছিল ঘরের শোভা, পরিবারের ব্যবস্থাপিকা, কিন্তু পাশ্চাত্যের ঘর-সংসারে আজ সেই শোভা ও সৌন্দর্যের কোনও অস্তিত্ব নেই। তা চলে গেছে সড়কে, দোকানে ও বাজারে। সেখানে আজ নারী এসব ক্ষেত্রে নিজ রূপ ও সৌন্দর্য বিকিরণ করছে। নারীর সাজসজ্জা এবং রূপ ও শোভা ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে পরিণত। তার একেকটি অঙ্গকে লোভ-লালসার নিশানা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সুন্দরী সেল্‌সগার্লকে দেখিয়ে খদ্দেরদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, এসো, এই সেবার বিনিময়ে আমাদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করো।

পাশ্চাত্যে এই খেল-তামাশা নারীমুক্তির নামেই দেখানো হয়েছে। নারীকে এই পরিণতিতে পৌছানোর জন্যই চারদেয়ালে বন্দিত্বের কেচ্ছা ফাঁদা হয়েছে। এই কেচ্ছাকে পথেঘাটে চালু করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে সময়ের এমন এক ফ্যাশন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর বিপরীতে মুখ খোলা যাবে না। খুললে তা হয়ে যাবে পশ্চাদপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। গুয়েভল্‌সীয়

প্রচারনীতির মাধ্যমে নারীকে ঘর থেকে টেনে বের করে রাস্তায়, দোকানে ও রেস্তোরাঁয় কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অফিসে তার উপর উপরস্থ কর্মকর্তার ফায়-ফরমাশ খাটার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

সেই শ্লোগানই আজ আমাদের দেশে চালু হয়ে যাচ্ছে এবং ওই নারীমুক্তির প্রতারণামূলক শ্লোগানের মাধ্যমে রেস্তোরাঁয় বেয়ারার কাজ করার জন্য সুদর্শনা নারীদের কাছে দরখাস্ত তলব করা হচ্ছে। আল্লাহ না করুন, এসব কর্মকাণ্ড যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে নারীসমাজের ব্যাপারে পাশ্চাত্য-সমাজের যাবতীয় অভিশাপ আমাদের দেশে পৌঁছতে সময় লাগবে না।

নারীদেরকে ঘর থেকে বের করার জন্য আজকাল একটা চলতি যুক্তি দেখানো হচ্ছে, জাতীয় নির্মাণ ও উন্নয়নের এই যুগে আমরা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেককে বেকার বসিয়ে রাখতে পারি না। কথাটি এমনই দাপট ও দৃঢ়তার সাথে বলা হচ্ছে, যেন এরচে' বড় কথা আর নেই। যেন দেশের সকল পুরুষের কোনও না কোনও কাজ জুটে গেছে। একজন পুরুষও বেকার নেই। সমস্ত পুরুষেরই আয়-রোজগারের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারপরও কাজ রয়ে গেছে বিস্তর। রোজগারের অনেক ক্ষেত্র কর্মীর অপেক্ষায় আছে। বিপুল ম্যানপাওয়ারের দরকার। সুতরাং ওই শূন্যস্থানসমূহ পূরণ করার জন্য নারীদের এগিয়ে আসতে হবে।

এসব কথা এমন এক দেশেই বলা হচ্ছে, যেখানে ভালো ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ রাস্তায় রাস্তায় জুতা ক্ষয় করে বেড়াচ্ছে, যেখানে কোনও চাপরাশি বা ড্রাইভারের পদ খালি হলে সেখানে উমেদার হিসেবে গ্রাজুয়েটদেরও লাইন লেগে যায়। কোথাও কোনও ক্লার্কের পদ সৃষ্টি হলে সেখানে মাষ্টার ও ডক্টরেটের ডিগ্রীধারীরা পর্যন্ত দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয়। আমাদের কথা হচ্ছে, প্রথমে দেশের পুরুষ নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজে পুরোপুরি লাগিয়ে দিন, তারপর বাকি অর্ধেক সম্পর্কে চিন্তা করুন, বাস্তবেই তারা বেকার কিনা।

যেসব নারী নিজ ঘরে থেকে জাতির পরিবারব্যবস্থার ভিত রক্ষা করছে, যারা নিজেদের কোলে আগামী দিনের তরুণদের লালন-পালন করছে, যাদের মহিমময় নারীত্ব সমাজে পবিত্রতা, শুচিতা, নৈতিকতা ও সাধুচরিত্রের পুষ্টিসাধনে জলসিঞ্চনের কাজ করছে, তাদেরকে 'বেকার অঙ্গ' সাব্যস্ত করার মত অশোভন উক্তি আর কী হতে পারে? বস্তুত এটা পাশ্চাত্যের কুযুক্তিরই কারিশমা, যার দৃষ্টিতে কাজের লোক কেবল সেই, যে বেশি বেশি টাকা-পয়সা

কামাই করতে পারে। তা করতে গিয়ে সে যদি সারাদেশে চরিত্রহীনতার বিস্তার ঘটিয়ে বেড়ায়, তাতে কিছু আসে যায় না। পয়সা কামাচ্ছে এটাই বড় কথা। যে ব্যক্তি টাকা-পয়সা কামাই করে আনে না, সে সম্পূর্ণ বেকার অঙ্গ, তাতে সে সমাজের নৈতিকতা নির্মাণ ও আখলাকের উৎকর্ষতা সাধনে যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করুক না কেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবারব্যবস্থা এই সমাজেরই কোনও অংশ কিনা? ব্যক্তির নিজ আখলাক-চরিত্র এই সমাজের হেফাজতযোগ্য কোনও সম্পদ কি না? সন্দেহ নেই প্রত্যেকে এর ইতিবাচক জবাবই দেবে। অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। অবশ্য পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে করে যারা তাদের অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজ চিন্তা-চেতনা বিকৃত করে ফেলেছে, তাদের কথা আলাদা। না হয় সুস্থ মানসিকতার প্রতিটি লোক স্বীকার করবে যে, পারিবারিক ব্যবস্থা ছাড়া একটা সুষ্ঠু সমাজ চলতে পারে না এবং নীতি-নৈতিকতা মানুষের অমূল্য সম্পদ। সুতরাং যেসকল ভদ্র মহিলা এই মহামূল্যবান সম্পদের হেফাজত করছে, তাদেরকে বেকার অঙ্গ বলে নিন্দা করা বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

আমাদের সমাজে সরকার থেকে শুরু করে জনগণ পর্যন্ত সকলেই প্রত্যহ অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ইসলামের নাম নিয়ে থাকে। কিন্তু কার্যত আমরা যে পথে চলছি, তা আদৌ মক্কা মুকার্‌রামা ও মদীনা তায়্যিবাগামী পথ নয়। এ পথ চলে গেছে নিউয়র্ক ও মস্কোর দিকে। ইসলাম তার সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সূচনা করেছে ঘর থেকে। কেননা ঘরই সেই ভিত্তিপ্রস্তর, যার উপর সভ্যতার গোটা ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। আর নারীকে এই ঘরেরই মূল স্তম্ভ সাব্যস্ত করে তাকে তালীম দেওয়া হয়েছে–

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থ : 'নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'[৭০]

সুতরাং এখন করণীয় কাজ এটাই যে, নারীকে তার সত্যিকারের মর্যাদা দিয়ে একনিষ্ঠতার সংগে তাকে তার সেই দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের সুযোগ দেওয়া হোক, যা প্রকৃতি তার কাঁধে অর্পণ করেছে এবং যার উপর গোটা সমাজের উন্নতি-অবনতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এ

---

৭০. সূরা আহযাব, '

কাজ না করব, ততদিন পর্যন্ত আদর্শ ইসলামী সমাজগঠনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। আমরা একদিকে অত্যন্ত সরলতার সাথে দাবি করছি আমাদের উদ্দেশ্য দেশে আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠন করা, অন্যদিকে সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ নারীসমাজকে এমন জায়গায় নিয়ে বসাচ্ছি, যেখানে কেবল একটা খাঁটি জড়বাদী-সমাজ তথা পাশ্চাত্য-সমাজেরই ইমারত স্থাপিত হতে পারে, আত্মিক মূল্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত কোনও দ্বীনী সমাজ গঠনের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

একথা সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হবে সরকারকে। যে সরকার সাত বছর যাবত দেশে ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জীবন ও বিস্তারদানের ওয়াদা করে যাচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার কিছুটা চেষ্টাও করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকার এখনও পর্যন্ত নারীর সত্যিকারের ইসলামী মর্যাদা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যতই দিন যাচ্ছে, তার তরফ থেকেও নারী সম্পর্কে ওই চলতি শ্লোগান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, যে শ্লোগানকে পাশ্চাত্য মন-মানসিকতার লোক একটা ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সেই ফ্যাশন আমাদের সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার তৎপরতা চালাচ্ছে।

বাস্তবিকই যদি এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও তার উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে নারীকে ব্যবসা-বাণিজ্য চমকানো ও লোভ-লালসা প্রশমিতকরণের মাধ্যম বানানোর যেক্রমবর্ধমান প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে, তা এখনই রোধ করতে হবে। তাকে সেই তালীম ও তারবিয়াত দিতে হবে, যার মাধ্যমে সে তার সত্যিকারের স্বভাবগত দায়িত্ব অর্থাৎ পরিবারব্যবস্থার গঠন ও সংশোধনকার্য আঞ্জাম দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। যদি নারীকে এভাবে গড়ে তোলা যায়, তবে আমরা নিশ্চিত আশা করতে পারি, তাদের মাধ্যমে সমাজে নীতি-নৈতিকতা, পবিত্রতা এবং অন্যান্য মহোত্তম গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত এ কাজ 'উলামায়ে কিরাম, বুদ্ধিজীবী মহল এবং দ্বীনী ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের উপর বর্তায়। তাদের উচিত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সামনে আত্মসমর্পণ না করে দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবেলা করা। নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা যে সামাজিক ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার এখনই সময়। তাদেরকে এই মসিবত থেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। তাদেরই কর্তব্য, নারীর ইসলামপ্রদত্ত মর্যাদা ও তার প্রকৃত স্বভাবসম্মত দায়-দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে

দেওয়া ও সর্বমহলে তা প্রচার করা। এ প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষামালার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে মানুষকে তার সুফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এভাবে এ বিষয়ে জনগণের চিন্তা-চেতনা সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয়ত এ দায়িত্ব বর্তায় পরিবারের অভিভাবকের উপর। অভিভাবকেরই কর্তব্য নিজ নিজ ঘরের মহিলাদেরকে আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসাত্মক ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা নিজ মর্যাদা এবং সমাজ নির্মাণে তার ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারে। তার আগে তাদের নিজেদেরও চিন্তা-চেতনার সংশোধন দরকার। তাদেরকে পাশ্চাত্যধারার নারীজীবনকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে। কেননা ওই ধারার জীবন নারীর নারীমর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলার শুকর, হাজারও অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের ব্যাধি এখনও দূরারোগ্য পর্যায়ে পৌছায়নি। এখনও হিকমত ও কৌশল এবং নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে ঔদাসিন্য ও অবহেলা যে মাত্রায় চলছে, তা থেকে যদি আমরা ঘুরে না দাঁড়াই, তবে আল্লাহ না করুন একটা পর্যায় এসে যেতে পারে, যখন পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের মত আমাদেরও আত্মিক ও নৈতিক ব্যাধি নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আপন আপন পরিমণ্ডলে এই বিপজ্জনক মানসিকতার বিরূদ্ধে জিহাদ ও প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া ফরয ও অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আপন আপন দায়িত্ব বোঝার ও যথোপযুক্তভাবে তা আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন– আমীন।

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারাহ, ১২৩-১২৮ পৃ.

মসজিদে মহিলাদের উপস্থিতি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ

'উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, বর্তমানের নারীগণ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা যদি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন, তবে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'আমরাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদেরকে (বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে) কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হাঁ।'[৭১]

বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় মহিলাগণ মসজিদে এসে নামায পড়ত এবং তাদের কাতার হত পুরুষদের কাতারের পিছনে। এক হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর বান্দীগণ যদি তোমাদের কাছে মসজিদে এসে নামায পড়ার জন্য অনুমতি চায়, তবে অনুমতি দিও। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দেন। হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে। এতে কোনও সাহাবী আপত্তি তুলেনি; বরং তারা সমর্থন করেছেন। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর এ হাদীছ দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায়। এতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, বর্তমানকালের নারীগণ যা করছে তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলে তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এর দ্বারা বোঝা যায়, হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) যা করেছিলেন তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছানুরূপই করেছিলেন।

---

৭১. বুখারী, হাদীছ নং ৮২২; মুসলিম, হাদীছ নং ৬৮৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ৪৯৫; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮২; আহমাদ, হাদীছ নং ২৪৪৩২; মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ৪১৮

বনী ইসরাঈলের নারীগণ একসময় তাদের 'ইবাদতখানায় যেত এবং তাদের জন্য যাওয়ার অনুমতিও ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদেরকে যেতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। কারণ তারা মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পদস্খলন ঘটানো ও তাদেরকে ফিতনায় ফেলার কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) যে যুগ সম্পর্কে বলেছেন যে, নারীদের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন এসে গেছে, সে যুগটা তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের খুবই কাছাকাছি ছিল। তার ওফাতের পর তখনও ছয় বছর পূর্ণ হতে পারেনি। এই অল্প সময়ের ভেতরে এমন কী পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, যদ্দরুন তাদের দেখলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আসতে বারণ করতেন? আমি বলব, এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল দুই রকমের–

এক. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় মহিলাগণ সাধারণত মাগরিব, এশা ও ফজর– এই তিন ওয়াক্তের নামাযেই মসজিদে আসত। যে নামায অন্ধকারকালে আদায় করা হয়। তাও তারা আসত চাদরে আবৃত হয়ে। যেমন এক বর্ণনায় আছে–

مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ

'অর্থাৎ তারা চাদরে আবৃত হয়ে আসত।'[৭২]

দুই. তারা মসজিদে আসত সাজসজ্জা ছাড়া। কোনওরূপ সুগন্ধিও ব্যবহার করত না। তাদের প্রতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ ছিল–

لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

'মহিলাগণ সুগন্ধি না লাগিয়ে মলিন সাধারণ বেশে আসবে।'

আল্লাহ তা'আলা সে সময়ে নারীগণকে সঠিক বুঝ দান করেছিলেন। তাদেরকে এমনভাবে তারবিয়াত করা হয়েছিল, যদ্দরুন তারা এসব হুকুম পালনে পুরোপুরি যত্নবান থাকতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর তারা তাদের আসল স্বভাবের দিকে ফিরে আসে। তাদের স্বভাবই হল বাইরে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা করা এবং ভাল-ভাল কাপড় পরে সুন্দর ও পরিপাটি হয়ে বের হওয়া। এই অবস্থাটাই তখন দেখা দিয়েছিল।

---

৭২. বুখারী, হাদীছ নং ৫৪৪; মুসলিম, হাদীছ নং ১০২০

তো এক পরিবর্তন হল এই যে, নারীগণ রাতের বেলায় মসজিদে আসত, পরবর্তীকালে দিনের বেলায়ও আসা শুরু করে দেয়।

নবীযুগে মসজিদে মহিলাদের আগমন

নিঃসন্দেহে নবীযুগে মসজিদে মহিলাদের আসার অনুমতি ছিল। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার তাগিদ করতেন যে, মহিলাদের জন্য নিজ নিজ গৃহে নামায পড়াই উত্তম। মসজিদে আসার জন্য বড়জোর অনুমতি ছিল। কখনওই উৎসাহ দেওয়া হত না; বরং উৎসাহ দেওয়া হত ঘরে নামায আদায়ের জন্য, যেহেতু সেটাই তাদের জন্য উত্তম। এক হাদীছে তো এ কথাও আছে যে, মহিলাদের জন্য সাধারণ কক্ষে নামায পড়া অপেক্ষা তার গোপন কক্ষে নামায পড়া উত্তম,আবার বারান্দায় নামায পড়া অপেক্ষা সাধারণ কক্ষে নামায পড়া উত্তম, আর বাড়ির চত্বরে নামায পড়া অপেক্ষা বারান্দায় পড়া উত্তম। অর্থাৎ যতবেশি গোপনে পড়বে ততই উত্তম হবে।[৭৩]

যাহোক মহিলাদের জন্য মসজিদ অপেক্ষা ঘরে নামায পড়া উত্তম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে যে সকল নারী মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায পড়ত, তাদের এই বাস্তব অবস্থার অনুভূতি অবশ্যই ছিল যে, তারা উৎকৃষ্ট অবস্থা ছেড়ে আসছে। আর সেই ছাড়ার পিছনে তাদের একটা ওজরও ছিল। ওজর হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামত তো সাধারণ কোনও ব্যাপার ছিল না, আবার তাঁর প্রতি গভীর মহব্বত ও ঈমানী সম্পর্কের ব্যাপারটা তো ছিলই। এ কারণেই তারা ঘরে নামায না পড়ে মসজিদে এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায পড়ত।

হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহ.)-এর ঘটনা

অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কারণে উত্তম অবস্থার পরিবর্তে সাধারণ অবস্থাকেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মহব্বত ও ভালোবাসাও তার একটা কারণ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহ.)-এর একটা উক্তি স্মরণ রাখার মত। হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহ.) বিতরের পর দু'-রাক'আত নফল বসে বসে পড়তেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মাসআলা

---

৭৩. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৩

লিখেছেন যে, এ দুই রাক'আতও অন্যান্য নফলের মত দাঁড়িয়ে পড়াই উত্তম। অন্যদিকে রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এ দু'-রাক'আত বসে বসে পড়া। কোনও এক ব্যক্তি হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি এ দু'রাকআত নামায বসে বসে পড়েন কেন? আপনার দৃষ্টিতে কি বসে বসে পড়লেই বেশি ছওয়াব? তিনি বললেন, না ভাই, মাসআলা তো এটাই যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেই ছওয়াব বেশি। সে লোক ফের জিজ্ঞেস করল, তাহলে আপনি বসে পড়েন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন। তিনি যেভাবে পড়তেন আমার সেভাবে পড়তেই বেশি ভালো লাগে, তাতে ছওয়াব কমই হোক না কেন।

এটা হল মহব্বতের ব্যাপার। তিনি বসে পড়তেন নবীপ্রেমের কারণে, যদিও উত্তম দাঁড়িয়ে পড়াই। এ ব্যাপারটাই ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে। তখনও মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই উত্তম ছিল এবং তাতেই বেশি ছওয়াব ছিল। মাসআলা এটাই। কিন্তু তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামত, তাঁর সংগে সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি মহব্বতের একটা ব্যাপারও ছিল। এ কারণেই তারা ঘরে নামায না পড়ে মসজিদে এসে নামায পড়তেন।

কিন্তু এখন অবস্থা বদলে গেছে। এখন মহিলারা মনে করছে তাদের জন্যও মসজিদে এসে নামায পড়া উত্তম। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সেই সঙ্গে ওই ওজরও তো শেষ গেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতে ও তাঁর মহব্বতে মসজিদে এসে নামায পড়া হবে। একদিকে ওজরও নেই, অন্যদিকে চিন্তারও পরিবর্তন। যেখানে ঘরে নামায পড়া উত্তম, সেখানে মনে করা হচ্ছে মসজিদে নামায পড়া উত্তম। এ কারণেই হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলছেন, যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানকালের নারীদের অবস্থা দেখতেন, তবে তাদেরকে মসজিদে এসে নামায পড়তে নিষেধ করে দিতেন।

হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তাঁর নিজের সময়ের কথা বলছেন। যে সময়টাকে 'খায়রুল-কুরূন' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠযুগ বলা হয়ে থাকে। সেই তুলনায় আমাদের যুগের কী অবস্থা? সবদিক থেকেই মারাত্মক অবক্ষয়-অধঃপতন। এ যুগে মসজিদে নারীদের যাতায়াত কতটুকু পসন্দনীয় হতে পারে? এজন্যই

'উলামায়ে কেরাম বলছেন, মসজিদে মহিলাদের যাওয়া পসন্দনীয় নয়। তাদের জন্য এটা মাকরূহ। কাজেই বাধা দেওয়াও উচিত।

তবে কোনও মহিলা যদি মসজিদের আশেপাশেই থাকে এবং জামাতে শামিল হওয়ার সুযোগও থাকে আর সে শামিল হয়ে যায়, তবে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। কোনও গুনাহ হবে না।

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মাসয়ালা

হারামাইন শরীফাইনের বেলায় কী হবে? এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, নারীরা যখন হজ্জে যায় এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের নিয়তে মসজিদে হারামে যায়, নামায পড়ার নিয়তে না যায়, তবে কোনও অসুবিধা নেই। যখন নামাযের সময় হবে সে তাতে শামিল হয়ে যাবে।

নারীর ঈদগাহে গমন

তাদের ব্যাপারে ঈদগাহে যাওয়ার হুকুম কী? তারাও কি পুরুষদের মত ঈদের নামাযে শামিল হবে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার জন্য বলতেন। কিন্তু এটা সেই সময়ের কথা। পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনের ফলে যেমন তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন ঈদগাহে যাওয়াও নিষেধ করে দেওয়া হয়।[৭৪]

নারীদের তাবলীগ জামাতে যাওয়া ও মহিলা মাদ্‌রাসা প্রসঙ্গ

মহিলাদের যেমন নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া বারণ, তেমনি তাদের মহিলা মাদ্‌রাসায় পড়তে বা পড়াতে যাওয়াও কি নিষিদ্ধ হবে? এমনিভাবে তাদের তাবলীগ জামাতে যাওয়ার হুকুম কী? নামাযের জন্য যাওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এসব জায়েয হবে কিভাবে?

নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এ কারণে যে, তাদের জন্য জামাতে নামায আদায় করা আদৌ ফযীলতের কাজ নয়; বরং তাদের জন্য সর্বদা এটাই উত্তম ছিল ও আছে যে, তারা ঘরে নামায পড়বে। মসজিদে যাওয়া বড়জোর জায়েয ছিল। কিন্তু ফিতনার কারণে তাও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় নারীদের জন্যও কাম্য এবং যেসব কাজের জন্য তারা আদিষ্ট, তা পালনার্থে তারা যদি পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে

---

৭৪. 'উমদাতুল-কারী ৪খণ্ড, ৬৫০পৃ.

বের হয় তবে এটা সম্পূর্ণ জায়েয হবে। কেননা জরুরতের কারণে বের হওয়া তো এমনিতেও জায়েয। তো যেসব কাজ শরী'আতে কাম্য বা আদিষ্ট, তাও জরুরতের অন্তর্ভুক্ত বৈকি। সুতরাং এজন্য বের হলে তা নাজায়েয হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

'ইলমে দ্বীন হাসিল করাও একটি জরুরি কাজ। নারীরাও এর জন্য আদিষ্ট। কাজেই তারা যদি পর্দা রক্ষা করে এর জন্য বের হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই; বরং এটা জায়েয ও কাম্য। এমনিভাবে যে কাজ শরী'আতে আদিষ্ট নয়, তবে কাম্য ও পসন্দনীয়, সেজন্যও তারা বাইরে যেতে পারবে, যেমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ। এটা তাদের দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব পুরুষদের উপরেই অর্পিত। তাদেরকে হুকুম করা হয়নি যে, দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য তোমরা বের হয়ে পড়। কিন্তু হুকুম করা না হলেও এমনিতে এটা একটা ভাল কাজ এবং দ্বীন ও শরী'আতে এটা কাম্য। মুসলমানদেরকে হকের দিকে ডাকা একটি ভাল কাজ। শরী'আতে এটা কাম্য। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ কোনও ভেদাভেদ নেই। সাধারণভাবেই বলা হয়েছে–

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

অর্থ : 'তারা একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।'[৭৫]

বর্তমানকালে নারীদের মধ্যে বেদ্বীনী কর্মকাণ্ড অত্যধিক বিস্তার লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ তাদের দ্বীনী চিন্তা-ভাবনায় মারাত্মক অবক্ষয় ঘটিয়েছে। তাদের এই দ্বীনী অবক্ষয় তাদের সন্তান-সন্ততির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। কাজেই নারীদের নিজেদের সুরক্ষা এবং তাদের সন্তান-সন্ততির হেফাজতের জন্য তাদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি করা এবং ইসলামী অনুশাসনের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করে তোলা এখন সময়ের সর্বাপেক্ষা বড় দাবি। এই দাবি পূরণের লক্ষে যদি নারীগণ ঘর থেকে বের হয় এবং পর্দার ব্যাপারেও পুরোপুরি সচেতন থাকে, তবে তা মোটেই নাজায়েয হবে না।

আসলে দ্বীনের মেজায বোঝা খুবই জরুরি। দ্বীনের মেজায সম্পর্কে অবহিত না থাকলে অনেক সময় শরী'আতের হুকুম বোঝাও কঠিন হয়ে

---

৭৫. সূরা 'আসর, আয়াত ৩

দাঁড়ায়। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সফরে গেলে সেখানে দেখতে পেলাম নারীরা বেপর্দা বাজারে ঘোরাফেরা করছে। এমনকি 'উলামায়ে কিরামের স্ত্রী-কন্যারাও পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত শিথিল। এহেন পরিস্থিতিতে জামাতের লোকজন তাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করার প্রয়োজন বোধ করল। তারা কয়েকটি ইজতিমা'ও করল। কিন্তু একব্যক্তি ফতোয়াও দিয়ে দিল, মহিলাদের জন্য ইজতিমায় যাওয়া জায়েয নয়, কেননা তাদের জন্য হুকুম হল ঘরের মধ্যে থাকা। ইজতিমায় যেতে হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের হতে হবে। আর তাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার হুকুম নেই।

চিন্তা করে দেখুন, মহিলারা বেপর্দা বাজারে ঘোরাফেরা করছে, দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে তারা চরম উদাসীন। সেই উদাসীনতা থেকে ফিরিয়ে আনাই ছিল দাওয়াতের লক্ষ। অথচ ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে, তারা এই দাওয়াতের প্রোগ্রামে শরীক হতে পারবে না। তার মানে দাঁড়াল, তোমরা বাজারে যাও, হোটেলে যাও, ক্লাবে যাও এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পার, কিন্তু জামাতে বের হয়ে দাওয়াতের কাজ করতে পারবে না। আসলে এটা দ্বীনের মেজায সম্পর্কে অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন।

সূত্র : ইন'আমুল-বারী ৩খণ্ড, ৫৫২-৫৫৬ পৃ.

অশ্লীলতার সয়লাব : আমাদের করণীয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই জগত সংসারের অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম শেষনবীর প্রতি, যিনি এই বিশ্বজগতে সত্যের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন।

যে সমস্ত কর্ম ও চিন্তার উপর ইসলামের ভিত্তি, নৈতিকতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা তার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইসলামী শিক্ষামালার অসংখ্য ধারা একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ইসলাম বিশেষভাবে তার অনুসারীদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানুষের জন্য যেই সমাজ নির্মাণ করতে চায় তা এমনই এক শুদ্ধ ও পবিত্র সমাজ, যার মাথায় থাকবে নৈতিকতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার মুকুট এবং যার কর্ম ও চিন্তার কোনও দিকেই অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার অবকাশ থাকবে না। এই লক্ষ পূরণের জন্য ইসলাম তার আইনী ও চারিত্রিক শিক্ষার ভেতর অসাধারণ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও অকল্পনীয় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছে। যে সকল চোরা পথে সমাজে কোনও রকম অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, তার প্রত্যেকটির প্রবেশমুখে ইসলাম কঠোর প্রহরী নিযুক্ত করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থান অর্থাৎ মুখ এবং দুই পায়ের মধ্যস্থান অর্থাৎ লজ্জাস্থানের ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে (যে, আল্লাহর নাফরমানির কাজে তা ব্যবহার করবে না), আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেই।'[৭৬]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রাজ্ঞোচিত বাণী সমাজের ঠিক ক্ষত স্থানটিতে যথোচিত ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এ জগতে যত গুনাহ ও যত রকমের অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূল কারণ দুটি–

---

৭৬. বুখারী, হাদীছ নং ৫৯৯৩

এক. মুখের অসংযত ব্যবহার। যার ভেতর অন্যায়-অনুচিত কথাবার্তার সাথে সাথে পেটের চাহিদা পূরণে অবলম্বিত সবরকম অসংগত পন্থা দাখিল।

দুই. কামেচ্ছা ও যৌনচাহিদা পূরণে সীমালংঘন।

এই উভয়বিধ সীমালংঘনের ফলেই সমাজে যতসব অন্যায়-অনাচারের বিস্তার ঘটে থাকে এবং পরিশেষে তা সমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এ কারণেই ইসলাম এই দুই ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এর কোনও একটিতে মানুষ যাতে সীমালংঘনের শিকার না হয়, সেজন্য ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং আরোপ করেছে অত্যন্ত পরিপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী ও সার্বজনীন বিধি-বিধান।

যৌনচাহিদা মানুষের একটি স্বভাবগত চাহিদা। এটা যদি সীমার ভেতর থাকে এবং পবিত্রতা ও শুদ্ধতার সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত মধুর ও আনন্দময়। তখন এটা হয়ে ওঠে মানবপ্রজন্ম রক্ষার একটি পবিত্র মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক এবং বিস্তার লাভ করে আত্মার আত্মীয়তা। কিন্তু এই চাহিদাই যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং পশুত্বের পথ অবলম্বন করে, তবে তার পরিণামে গোটা জীবনব্যবস্থা লোপাট হয়ে যায়। সমাজ হয়ে পড়ে দূষিত, ছড়িয়ে পড়ে নৈরাজ্য। পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন। আন্তরিকতা পর্যবসিত হয় কৃত্রিমতায়। মানুষের বংশ ও গোত্রীয় শৃংখলা যায় ধ্বংস হয়ে। বংশীয় পরিচয় হয় সংশয়-সন্দেহের শিকার। চরিত্র হয় অবক্ষয়ের শিকার। সর্বত্র রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটে। মানবজাতি নতুন-নতুন মহামারির শিকার হয়। সেই মহামারি কেবল শারিরিক রোগ-ব্যাধিরই নয়, নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক অধঃপতনেরও। মানবচরিত্র পশুর স্তরে নেমে যায়। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে শত্রুতার আগুন জ্বলতে থাকে। ঐক্য ও সম্প্রীতি ধ্বংস হয়ে যায়। সামগ্রিক কর্মশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। আর এভাবে আশরাফুল-মাখলূকাত মানুষ তার মানবীয় মর্যাদা থেকে স্খলিত হয়ে কুকুর-বিড়ালের কাতারে নেমে যায়।

ইসলাম বৈরাগ্যবাদের মত মানুষের জৈব চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং একদিকে সে মানুষের এই স্বভাবগত চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়েছে, তার বিশুদ্ধ ব্যবহারের লক্ষে বিবাহের শুদ্ধ ও পবিত্র ব্যবস্থা দান করেছে, এর জন্য নানারকম সুবিধা ও সহজতা সরবরাহ করেছে

এবং বিবাহের আহকাম ও রীতি-নীতির ভেতর এ বিষয়ের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখেছে, যাতে এই শুদ্ধ ও পবিত্র ব্যবস্থা মানুষের স্বভাবগত আবেগ ও চাহিদা প্রশমিত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে ওইসকল সীমালংঘন ও স্বেচ্ছাচারিতার উপর কঠিন-কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, যদ্দরুন মানুষের চিন্তা-ভাবনা বিপথগামী হয়, তার কামনা-চাহিদা বেশামাল হয়ে যায়, যদ্দরুন ইন্দ্রিয়পরবশতা পাশবিক ক্ষুধায় পর্যবসিত হয় এবং যা পরিবেশ-পরিমণ্ডলে যে-কোনও পর্যায়ের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বিস্তারে দায়ী বলে চিহ্নিত হতে পারে।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা

এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'র ভেতর নৈতিক ও আইনগত শিক্ষার এক দীর্ঘ সিলসিলা রয়েছে। যার সূচনা হয়েছে এই উপদেশ দ্বারা যে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۝

অর্থ : 'মু'মিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা-কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।'[৭৭]

[এর পাশাপাশি নারীদের প্রতি ইরশাদ হয়েছে] –

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

অর্থ : 'এবং মু'মিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে...।'[৭৮]

মুসলিম নারীদের হুকুম দেওয়া হয়েছে–

وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থ : 'নিজ গৃহে অবস্থান কর, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহিলী যুগে প্রদর্শন করা হত।'[৭৯]

---

৭৭. সূরা নূর, আয়াত ৩০
৭৮. সূরা নূর, আয়াত ৩১
৭৯. সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩

বরং এর আগে নারীদের লক্ষ করে এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে–

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

অর্থ : 'তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে. আর তোমরা বল ন্যায়সংগত কথা।'[৮০]

সমাজের ভাল-মন্দ চিন্তাভাবনা এবং পসন্দনীয় ও নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তারে প্রচার-প্রচারণার অনেক বড় ভূমিকা থাকে। তাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র রাখার লক্ষে প্রচারমাধ্যমসমূহ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : 'স্মরণ রেখ, যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক– এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।'[৮১]

এ জাতীয় অসংখ্য উপদেশ-অনুশাসন দ্বারা মানুষের কান, চোখ, মন-মস্তিষ্ক, আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনার উপর আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা নামক পাহারাদার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অনুশাসনের চূড়ান্ত ঘটেছে একশত বেত্রাঘাত ও পাথর মেরে হত্যা করার ভয়াবহ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে। এ শাস্তি ইসলাম ব্যভিচারীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, যাতে এই ন্যাক্কারজনক ও জঘন্য কাজের পথে কেউ পা বাড়ানোর সাহস না করে।

পবিত্র ও আদর্শ সমাজের নমুনা

কুরআন-হাদীছের এই উপদেশ-অনুশাসন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালীম-তারবিয়াতের বদৌলতে এমন এক ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছিল, শুচিতা-শুদ্ধতা, নৈতিকতা, চরিত্রবত্তা এবং জৈবচাহিদার ভারসাম্যে যা ছিল দুনিয়ার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় সমাজ। আজ থেকে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত দ্বীনদারী ও আখলাকী হাজারও অবক্ষয়-

---

৮০. সূরা আহযাব, আয়াত ৩২
৮১. সূরা নূর, আয়াত ১৯

অধঃপতন সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে শ্লীলতা ও লজ্জা-শরমের একটা ব্যাপার ছিল। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার তাগিদ তাদের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত ছিল। দুনিয়ার আর সব জাতির থেকে মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবেই দৃশ্যমান ছিল। দ্বীনী বিধি-নিষেধ ছাড়াও এ ব্যাপারে পারিবারিক ও বংশীয় ঐতিহ্য তাদের ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকর ছিল। এ ঐতিহ্য রক্ষার প্রতি সাধারণ মুসলিমগণ বেশ সচেতন ছিল। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহের নৈতিক দেওলিয়াত্ব এবং নগ্নতা ও বেহায়াপনার যে সমস্ত ঘটনা শোনা যেত, মুসলিম দেশসমূহে সেগুলোকে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক মনে করা হত। সাধারণভাবে সকলেই তাকে নিন্দা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত।

মুসলিম সমাজের বর্তমান অবক্ষয়

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা বড়ই দুঃখজনক। অন্যান্য হাজারও অন্যায়-অপকর্মের সাথে সাথে এ ব্যাপারেও আমাদের সামাজিক চিন্তা-ভাবনা এবং আমাদের রুচি-মেজাযের ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটছে এবং তা ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, যেসকল লা'নত ও কদর্যতা পাশ্চাত্যকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের সর্বশেষ সীমানায় পৌছিয়ে দিয়েছে, আমাদের সমাজেও তা উত্তরোত্তর ধ্বংসকর গতিতে ক্রমবিস্তার লাভ করছে। এমনকি যেসকল খান্দান ও বংশ-গোত্রকে শরাফত ও ভদ্রতা, সম্ভ্রম ও শ্লীলতাবোধ এবং চারিত্রিক পূতঃপবিত্রতায় আদর্শস্থানীয় মনে করা হত, বর্তমানে তাদের মধ্যেও পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, ইন্দ্রিয়পরায়নতা ও চরিত্রহীনতার অভিশাপ জায়গা করে নিয়েছে। এবং তা জায়গা করে নিয়েছে তার সবরকম ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এবং ফিতনা বিস্তারের যাবতীয় উপায়-উপকরণসহ। এই উদ্বেগজনক বিপথগামীতার কারণ এত বৈচিত্র্যময় এবং তার ধরন এত রকমারি, যা বন্ধ ও প্রতিহত করার জন্য বিশেষ কোনও এক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার বহুমুখী কর্মসূচী এবং সম্ভাব্য সবরকমের প্রচেষ্টা। বিশেষত যেসকল উপকরণ ও মাধ্যম অশ্লীলতা বিস্তারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী, সেসব ব্যাপারে সুচিন্তিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তো এখনই সময়।

অশ্লীলতা বিস্তারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী যেসকল মাধ্যম

এক. সিনেমাহাউস :

দেশের ছোট-বড় প্রতিটি শহরে সিনেমাহাউস প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাতে প্রতিদিন লজ্জা-শরম হরণকারী ফিল্ম দেখানো হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে

মানুষের শরাফত ও চারিত্রিক দৃঢ়তা জবাই করে দেওয়া হচ্ছে। এসব ফিল্মের মাধ্যমে মূলত নগ্নতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার তালীম দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষত বিদেশী ফিল্মসমূহে যেসব উত্তেজক ও প্রলুব্ধকর দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে, তা নবীন প্রজন্মের জন্য প্রাণঘাতী বিষের চেয়েও বেশি কিছু। শত-সহস্র লোক যখন পাশাপাশি বসে এই লজ্জাষ্কর দৃশ্য দেখে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এটা যে একটা নিকৃষ্ট ও কদর্য ব্যাপার, সেই বোধও ধীরে ধীরে খতম হয়ে যায়। মানুষের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে এই মানবতা বিধ্বংসী দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর এভাবে চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচারবৃত্তি সংক্রামক ব্যাধির আকারে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

দুই. টেলিভিশন :

টেলিভিশন এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে যে, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার যেসকল বিষয় সিনেমাহল, নাইটক্লাব ও নাট্যশালার ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল, এখন আর তা কেবল এসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। টেলিভিশনের মাধ্যমে তা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। যারা সিনেমাহলে যেতে সংকোচ বোধ করে, এখন তারা ড্রয়িংরুমে বসে তা উপভোগ করছে। এর ফলে বড়-ছোট ও আপন-পরের পার্থক্যও ঘুচে গেছে। বাবা-মেয়ে ও ভাই-বোন পর্যন্তও এখন একসাথে বসে বসে উলঙ্গ নৃত্য ও যৌন উত্তেজক ফিল্ম দেখছে। কেবল দেখছেই না, পরস্পরে এর উপর পর্যালোচনা ও মতবিনিময়ও করছে। ব্যাপারটা কোনও কোনও পরিবারে তো এ পর্যন্তও গড়িয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম দেখার জন্য বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলে একত্র হয়ে যায় এবং নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে তা উপভোগ করে। তাতে পর্দা-পুশিদার কোনও বালাই থাকে না এবং মেলামেশারও থাকে না কোনও রাখঢাক।

তিন. সংবাদপত্র :

নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রচারে পত্র-পত্রিকাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই প্রচারকার্য যেন এখন পত্র-পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক সময় ফিল্মের বিজ্ঞাপন প্রচারে কয়েক পৃষ্ঠা পর্যন্ত বরাদ্দ রাখা হয়। এসব পৃষ্ঠায় প্রতিদিন পাশবিকতা ও হিংস্রতার অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাতে এমন এমন ছবি ও এমন এমন ভাষা মুদ্রিত হয়, শয়তানও যা থেকে পানাহ চায়। আজকাল তো পত্র-পত্রিকা কেবল মধ্যবিত্তই নয়, হতদরিদ্রেরও জীবনের অংশ হয়ে গেছে। যদ্দরুন এই অশ্লীলতা ও নগ্নতার ময়লা-আবর্জনা এমন এমন ঘরেও পৌঁছে যায়, যেখানে টেলিভিশনের পৌঁছার সুযোগ নেই। বলাবাহুল্য,

ঘরের ছেলেমেয়েরাও সেসব দেখে ও পড়ে। তাদেরকে তো কেউ এর থেকে বিরত রাখতে পারে না। ফলে ভালো-ভালো দ্বীনদারদের পরিবারেও নগ্নতা ও অশ্লীলতার এই নাপাকী শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই চোখে কিছু না কিছু পড়ে যায়।

চার. ম্যাগাজিন ও সাময়িকী :

ম্যাগাজিন ও সাময়িক পত্রিকাসমূহ নগ্নতাকে ব্যবসায়ের একটা স্বতন্ত্র মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। নগ্ন ছবি, অশ্লীল গল্প ও নির্লজ্জ বিষয়বস্তুকে পুঁজি করে এ ধরনের কত ম্যাগাজিন যে চলছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এর দরুন প্রতিনিয়ত মানুষের ইন্দ্রিয়পরবশতা ও যৌনস্বেচ্ছাচারিতা আগ্রাসী রূপ ধারণ করছে।

পাঁচ. পণ্যপ্রচার :

আজকাল পণ্যের প্রচারণা এক স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত হয়েছে। যার এক অপরিহার্য অনুসংগ বিভিন্ন ভঙ্গীতে নারীরূপ প্রদর্শন। এর ফলে নারীগণ অর্থোপার্জনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এখন যেন দুনিয়ার কোনও পণ্যেরই প্রচারণা নারীর ছবি ছাড়া সম্পন্ন হয় না। কুদরতের এই পবিত্র সৃষ্টিকে এক তুচ্ছ খেলনার মত ব্যবহার করা হচ্ছে। তার একেকটি অঙ্গকে নগ্নরূপে প্রদর্শন করে গ্রাহকদেরকে মালক্রয়ের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই সভ্যতা বিবর্জিত প্রদর্শন এমন মহামারিতে পরিণত হয়েছে যে, একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তার নজর হেফাজত করে রাস্তায় চলাচল করা কঠিন হয়ে গেছে। বিশেষত ফিল্মের প্রচারণার জন্য দেয়ালে দেয়ালে ও রাস্তায় রাস্তায় যেসব সাইনবোর্ড টানানো থাকে, তা তো প্রতিক্ষণ অশ্লীলতার প্রচার করে যাচ্ছে।

ছয়. নগ্ন ছবির বেচাকেনা :

আজকাল কেবল অর্ধনগ্নই নয়; বরং সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবিও বেচাকেনা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এসব ছবি দেদারসে কিনছে। এর বড়-বড় অ্যালবামও পাওয়া যায়। তাতে এমন এমন ছবিও আছে, যাতে মানুষকে কুকুর-গাধার মত অশ্লীলকাজে রত দেখানো হয়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা এসব অ্যালবাম খোলামেলাই সংগ্রহ করে থাকে।

সাত. ব্লু-ফিল্ম :

আজকাল বিভিন্ন জায়গায় নীল ছবি প্রদর্শিত হয়। বিশেষ বয়সের দর্শকরা মোটামোটা অংকের বিনিময়ে তা দেখে থাকে। তাতে মানবদেহে কাপড়ের কোনও নামগন্ধ থাকে না। তা দেখলে পশুরও লজ্জাবোধ হওয়ার

কথা। আইনত এসব ছবি নিষিদ্ধ বটে এবং কখনও কখনও এ ধরনের আড্ডায় পুলিশও হানা দিয়ে থাকে, কিন্তু এ ধরনের আকস্মিক বা আইওয়াশমূলক পদক্ষেপের বিন্দুমাত্র প্রভাব মানবতাবিধ্বংসী এসব কর্মকাণ্ডের উপর পড়েনি; বরং এই উড়োখবরও কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল যে, এ ধরনের ফিল্ম বর্তমানে আমাদের দেশেও তৈরি হচ্ছে এবং টিভি ও ফিল্মের কিছু অসাধু কর্মচারী এতে জড়িত আছে। পরে যদিও এর প্রতিবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধঃপতনের গতি যদি এ ধারায় চলতে থাকে তবে অসম্ভব নয় যে, একদিন এ সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হবে। কোনও কোনও পত্রিকা এসব সংবাদের নগদ লাভও হাতিয়ে নিয়েছে। তারা ব্লু-ফিল্মের পরিচয় ও তার ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে এবং নমুনা স্বরূপ কিছু ছবি মুদ্রণ করে কিছুদিনের জন্য বাড়তি আমদানির ব্যবস্থা করে নেয়– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

ভয়ঙ্কর অশ্লীলতা

অশ্লীলতার এই যে ফিরিস্তি দেওয়া হল, এসব তো কেবল যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং স্বল্পআয়ের লোক, তাদের মহলেই পরিচিত। অশ্লীলতার এরচে' আরও ভয়ঙ্কর রূপও আছে, যা এই মহলের আওতার উর্ধ্বে। যারা বিত্তবান এবং তথাকথিত উঁচু সোসাইটির লোক, তাদের ভেতরে যে কী হচ্ছে তা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে। মডেলগার্লস ও সিঙ্গারগার্লসের মাধ্যমে চরিত্রের বিকিকিনি তাদের সংস্কৃতিরই একটা অংশ হয়ে গেছে। অধঃপতন ও নীচতা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, ওই উঁচু মহলে স্ত্রী-বদলের যথারীতি ক্লাবও স্থাপিত আছে। তাতে দায়ূসীকে একটা শিল্প বানিয়ে নেওয়া হয়েছে– লা হাওলা ওয়ালা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল-'আলিয়্যিল-'আযীম।

এই অশ্লীলতা কোন্ দেশে

বড়ই বেদনাময় ও দুঃখজনক ব্যাপার হল যে, সম্ভ্রমহনন ও মানবতাবিধ্বংসী এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তার এমন এক দেশেই ঘটছে, যেখানে কেবল চরিত্রহীন, নির্লজ্জ ও আত্মমর্যাদাবোধহীন কিছু লোকেই বাস করে না এবং সত্যিকথা হচ্ছে, খাঁটিমনে এসব অশ্লীলতাকে যারা পসন্দ করে তাদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়; বরং গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলিম এমন, যারা এসব ভ্রষ্টতাকে ঘৃণার চোখেই দেখে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, তারাই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তবে এই কদাচার সর্বমহলে এভাবে ছড়িয়ে পড়ল কিভাবে? কিভাবে মানুষের

সামনে এসব ঘটতে পারছে? উত্তর হল, ভদ্রলোকদের এই ভীড়ের ভেতর আল্লাহর এমন কোনও বান্দা খুঁজে পাওয়া কঠিন, যারা অশ্লীলতার দালালদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে– তোমরা এই বিপর্যস্ত জাতিকে কোন্ ধ্বংস-গহ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছ? কেনই বা নিয়ে যাচ্ছ? আমরা তো এমনই অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছি যে, সকাল-সন্ধ্যা নিজেদের শিশু ও যুবক ছেলেমেয়েদেরকে চোখের সামনে অশ্লীলতার ক্লেদ ও পঙ্কে আচ্ছন্ন হতে দেখছি। তা সত্ত্বেও এই মসিবত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কোনও চেতনা অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছে না। এই নবীন প্রজন্মের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনও রকমের দয়ার সঞ্চার হচ্ছে না। তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনও চিন্তা আমাদেরকে স্পর্শ করছে না। ধ্বংসের এই সয়লাব রোধ করার জন্য আমাদের বুকে কোনও সংকল্প ও কোনও কর্মস্পৃহা জাগছে না। খুব বেশি বোধসম্পন্ন যদি কেউ থাকে, তবে এই সুরতহাল দেখে সে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দেয়। কিন্তু ব্যস এতটুকুই। তারপর সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ। কিছু সারাশব্দ যদি করেও বা, তবে তার স্থান হয় কোনও ওয়াজের মাহফিল। সেখানে এসব কদাচার সম্পর্কে নিন্দামূলক দু'-চারটি কথা শুনিয়ে দেয়, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু এসব কেন হচ্ছে? এর জন্য দায়ী কে? এগুলো রোধ করার দায়িত্ব কার? রোধ করার জন্য বাস্তবমুখী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা কেউ ভাবছি না। আমাদের আকল-বুদ্ধি, আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের অন্তর্দৃষ্টি, আমাদের কর্মশক্তি এবং আমাদের তাকওয়া-পরহেযগারীর যাবতীয় আবেগ-স্পৃহা যেন সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে গেছে।

বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যমান এই পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কেবল সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ও প্রচারমাধ্যমসমূহের বিরূদ্ধে আপত্তি জানানোই যথেষ্ট নয়। সরকারের উদাসীনতা সম্পর্কে অভিযোগ তোলার দ্বারাও কিছু হয়ে যাওয়ার নয়। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই সর্বনাশের জন্য ওইসব উপকরণই দায়ী, কিন্তু সেই সংগে এর অনেক দায়ভার আমাদের উপরও যে বর্তায় সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। আমরা যদি আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা এই নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিরূদ্ধে প্রতিরোধমূলক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারতাম, তবে এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এতটা খোলামেলা ও স্পর্ধার সাথে এই কদাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হত না; বরং নির্লজ্জতার এই অভিশাপকে যারা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে তারা বুঝতে পারত যে, তাদের এই দুষ্কর্ম কেবল আখিরাতের

দুর্ভোগেরই কারণ হবে না; বরং দুনিয়ায়ও জনমানুষের গযব ও আক্রোশ ডেকে আনবে।

কিন্তু আমাদের অবস্থা বড় আজব। যদি বাসভাড়া কয়েক পয়সা বেড়ে যায়, তবে আমরা ইট-পাথর নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। যদি বেতনে সামান্যকিছু কম পড়ে, তবে দাবি-দাওয়া নিয়ে আসমান-যমীন মাথায় তুলি। যদি খাদ্যদ্রব্যের দাম একটু বেড়ে যায়, তবে আমাদের চিৎকার সাতসাগরের ওপারে পৌঁছে যায়। এসকল ক্ষেত্রে আমরা যে ক্ষোভ ও আক্রোশ প্রকাশ করি এবং যে পন্থায় করি, তার আঘাত থেকে দেশের কোনও প্রান্ত নিরাপদ থাকে না। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার এসব প্রতিষ্ঠান যখন আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইন্দ্রিয়পূজার এ মহামারি বিস্তার করছে, তখন আমাদের কানে কোনও আওয়াজ ঢোকে না। অর্থের পূজারীরা যখন যুবকদের চরিত্র হনন করার জন্য উন্মুক্ত সড়কে নগ্নছবি টানায়, তখন কোনও হাত তা বাধা দেওয়ার জন্য একটুও নড়ে ওঠে না। যখন কোনও কামতাড়নার রোগী টেলিভিশনের নগ্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের ঈমান ও আখলাকের উপর দস্যুবৃত্তি চালায়, তখন কোনও জবান তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না। সংবাদপত্রসমূহ যখন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের শিশুদেরকে অশ্লীল-বেহায়া হওয়ার সবক দান করে, তখন আমাদের রক্তের ভেতর কোনও আলোড়ন জাগে না। আজ তো আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক এখনও আছে, যারা অন্ততপক্ষে মনে মনে হলেও এই সুরতহালকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমাদের উদাসীনতা যদি এভাবে চলতেই থাকে তবে আশংকা রয়েছে দিলের এই বোধটুকুও খতম হয়ে যাবে। সেদিন কোনও ভালো লোক যদি চিৎকার করে করেও এসব কদাচারের নিন্দা জানায়, তবে ময়লা-আবর্জনার স্তূপে গড়ে উঠা এই জাতি তাকে বদ্ধ পাগল সাব্যস্ত করবে। পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্রসমূহ মূর্তিমান শিক্ষা হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। তারা অশ্লীলতার এই দানবকে অবাধ ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে অবক্ষয়ের এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ তাদের চিন্তাশীলেরা গলা ছেড়ে চিৎকার করছে, কিন্তু তাতে কান দেওয়ার কেউ নেই।

বস্তুত মানুষের কামেচ্ছা যখন উদ্দাম হয়ে ওঠে, তখন তা কোনও সীমারেখায় থামতে চায় না এবং থামানো যায়ও না। বিদ্যমান পরিস্থিতিই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষের যৌনচাহিদা যখন সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির সীমারেখা অতিক্রম করে যায় তখন তা এক অন্তহীন ক্ষুধা ও অনিবারণীয়

পিপাসায় পর্যবসিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ ভোগ-উপভোগের কোনও স্তরেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। তখন সে 'আরও চাই, আরও চাই'– এর অনন্ত ক্ষুধা মেটানোর জন্য বেসামাল হয়ে পড়ে। সে মানবতা ও ভদ্রতাবোধের প্রতিটি ধাপ পদদলিত করে পশুর মত ছুটতে থাকে, কিন্তু কোনও কিছুতেই তার ক্ষুধা মেটে না, কোনও কিছুতেই তার তৃপ্তি আসে না। সে 'ইসতিস্কা' রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মত হয়ে যায়। চারপাশে যত কলস ও কুঁজো থাকে, সব খালি করে ফেলার পরও তার পিপাসা নিবারণ হয় না। সেই অনিবারণীয় পিপাসার অসহনীয় কষ্ট নিয়েই সে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

সুতরাং এখনও সময় আছে। বিপথগামিতার এই সয়লাব ক্রমবিস্তার লাভ করছে ঠিকই, কিন্তু এখনও বিপদসীমা অতিক্রম করেনি। চেষ্টা করলে এখনও তা রোধ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু পানি যখন মাথার উপরে চলে যাবে, যখন বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাবে তখন আইন ও নীতি-নৈতিকতার যতরকম হাতিয়ার আছে, তার কোনওটিই কাজে আসবে না। এই সয়লাব রোধের সকল প্রচেষ্টাই তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমাদের করণীয় : কিছু প্রস্তাবনা

আমাদের দৃষ্টিতে সবার আগে যা প্রয়োজন তা এই যে, জাতির প্রতি মমতা রাখে এমন কিছু লোক এই অশ্লীলতা রোধের জন্য ময়দানে নেমে পড়বে। তারা এটাকেই নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-চরিত্রের একমাত্র বিষয় বানিয়ে নেবে। দুনিয়ায় লক্ষ করা যায়, ছোট-ছোট ও তুচ্ছ-তুচ্ছ বিষয়ের জন্যও বড়-বড় সমিতি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু অশ্লীলতা রোধের জন্য কোনও সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কোথাও তো নজরে আসছে না। অথচ এটা এখন সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। যদি এই উদ্দেশ্যে কোনও সংগঠন দাঁড়িয়ে যায় এবং তার সদস্যগণ প্রতিদিন কিছুটা সময় এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তবে এখনও সংশোধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং সংশোধন হবে বলে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী হতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে এরূপ সংগঠনের কর্মপন্থা হতে পারে নিম্নরূপ–

এক. জনগণের মধ্যে নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক চেতনা সৃষ্টি করা। এর জন্য বক্তৃতা-বিবৃতি ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে হবে এবং হ্যাণ্ডবিল ও দাওয়াতী প্রচারপত্র বিতরণ করতে হবে।

দুই. সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগে সাক্ষাত করে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যে, তারা যেন নিজেদের পত্রিকায় অশ্লীল ছবি ও নগ্ন বিজ্ঞাপন এবং অনৈতিক সংবাদ ও চরিত্রহননমূলক কোনও লেখাজোখা প্রকাশ না করে; বরং এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে চলে। সম্পাদকদের অধিকাংশই এটা গ্রহণ করে নেবে বলে আশা করা যায়। কেননা তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে অশ্লীলতার প্রচারণাকে পসন্দ করে না এবং এর কোনও আগ্রহও তারা রাখে না। তাদের পত্রিকায় তারা যে এসব প্রকাশ করছে তা মোটেই সুচিন্তিতভাবে নয়; বরং কালের স্রোতে ভাসছে মাত্র। তাদেরকে যদি ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, তবে আশা করা যায় তাদের অন্তরে অনুভূতি জাগবে এবং নিজেদের নীতি বদলাবে।

তিন. যেসকল সংবাদপত্র তাদের এই অনৈতিক কার্যক্রম থেকে নিবৃত্ত হবে না, তাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন করতে হবে, যাতে জনগণ এসব পত্রিকা সম্পূর্ণ বয়কট করে।

চার. রেডিও-টিভির দায়িত্বশীলদের সাথে গণ্যমান্য লোকদের একটা প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করবে এবং তাদেরকে নগ্ন ও অশ্লীল প্রোগ্রাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করবে।

পাঁচ. জনগণের একটা প্রতিনিধিদল সরকারি দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাত করবে এবং বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজেদের আবেগ-অনুভূতি তাদের সামনে তুলে ধরবে। প্রচারমাধ্যমসমূহ প্রতিটি বিষয়ে সরকারি নীতি-পলিসির গতিবিধি লক্ষ করে থাকে এবং সেই মোতাবেক নিজেদের কাজের রূপরেখা তৈরি করে। বর্তমান লাগামহীনতার একটা বড় কারণ হল এই যে, তারা বিশ্বাস করে সরকার তাদের এ জাতীয় কর্মকাণ্ডকে অপসন্দ করে না। আর সেই বিশ্বাস থেকেই তারা লাগামহীনভাবে এসব অনাচার করে যাচ্ছে। কাজেই তাদেরকে যদি এ ধারণা দেওয়া যায় যে, এই নগ্ন ও অশ্লীলকার্যক্রম সরকারি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তবে এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা কিছু না কিছু সংযত হবেই।

ছয়. ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে উভয় দল সম্মিলিতভাবে অশ্লীলতা রোধে এমন কোনও আইন পাশ করে, যার মাধ্যমে নগ্নতা ও অশ্লীলতামূলক যে-কোনও কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ করা সম্ভব হয়।

সাত. দেশের জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চালাতে হবে যাতে তারা টেলিভিশনের এমন সব প্রোগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে, যা লজ্জা-শরমের ব্যাপারে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস

এ কাজ যে দু'-একদিনেই হয়ে যাবে এমন নয়, এর জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনার। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বতন্ত্র একটি দল এই কাজের জন্য লেগে না পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না; বরং ততক্ষণ পর্যন্ত যারা এ কাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, তারাও আজ, কাল ও পরশু করে করেই সময় পার করতে থাকবে।

তবে একটা বিষয় খুবই জরুরি। তা এই যে, যে সমিতি বা সংগঠন এই কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবে, তাদের উপর কোনওরকম রাজনৈতিক ছাপ থাকতে পারবে না; বরং দল-মত নির্বিশেষে সব মহলের লোকই এতে শামিল থাকবে। এ সংগঠনের অন্য কোনও কর্মসূচি থাকবে না; বরং সুনির্দিষ্টভাবে নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধেই তার কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে। কাজ শুরু করে দেওয়ার পর দেখা যাবে নতুন-নতুন পথ সামনে আসছে এবং একটি একটি করে সফলতার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। অন্তরে যদি ইখলাস থাকে, উম্মতের প্রতি সত্যিকারের দরদ থাকে এবং থাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের আগ্রহ, তবে ইনশাআল্লাহ এই চেষ্টা বৃথা যাবে না, বৃথা যেতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা অনুভূতিসম্পন্ন কিছু অন্তরে এই কাজের গুরুত্ব সৃষ্টি করে দিন, যারা সময়ের এই সর্বাপেক্ষা দরকারি কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। এই বিনীত আরয যদি কোনও বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে কিছুটা নাড়া দিতে সক্ষম হয় এবং এ প্রসঙ্গে কোনও কাজ করার ইচ্ছা তার মনে জাগ্রত হয়, তবে অনুরোধ থাকল পরামর্শের জন্য সে যেন এই অধমকেও স্মরণ করে। স্মরণ করলে ইনশাআল্লাহ তাকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখা হবে।

وما توفيقي الا بالله

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারাহ, পৃষ্ঠা ৭-১৬

অশ্লীলতার অভিশাপ : এইডস

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্যের ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّا فَشَا فِيْهِمِ الطَّاعُوْنُ وَ الْاَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا

'যখন কোনও জাতির ভেতর অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে এবং তারা খোলামেলাভাবে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ এবং এমনসব রোগ, যা আগে তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে দেখা দেয়নি।'[৮২]

আজ পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন রোগ জন্ম নিচ্ছে। এমন অনেক রোগ-ব্যাধি দেখা যাচ্ছে, পূর্বে যা কল্পনাও করা যেত না, কেউ কখনও নামও শোনেনি। কোনও কোনও রোগ হয়ত দু'-একজনের মধ্যে দেখা যেত এবং সে বিরল রোগটিকে নিয়ে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেত। অবাক হয়ে মানুষ ভাবত, এটা কেমন রোগ, কখনও তো এর নামও শুনিনি। কিন্তু সেই রোগ এখন আর কোনও বিরল বিষয় নয়। এলাকার পর এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের দেশে দেশে তার বিস্তার ঘটেছে। অসংখ্য লোক তাতে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীছটি উপরে উল্লেখ করলাম, এসব রোগ-ব্যাধির জন্য তা প্রযোজ্য হতে পারে এবং তা হওয়া যথার্থ। কেননা দুনিয়ায় যেভাবে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটছে এবং যত দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ছে, আমরা লক্ষ করছি একই দ্রুততার সাথে নিত্য-নতুন রোগ-ব্যাধিও জগতে হানা দিচ্ছে। কাজেই এটা যে উল্লিখিত হাদীছে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন, তাতে সন্দেহ কী?

---

৮২. ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪০০৯

সম্প্রতি অর্থাৎ ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের পর একটি ভয়ানক রোগ আমেরিকাসহ আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাকে অশ্লীলতার আসমানী আযাব ছাড়া অন্য কোনও নামে অভিহিত করা যায় না। রোগটির নাম 'এইডস'। অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাধি। ইদানীং সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হঠাৎ করেই ওজন কমে যায়, জ্বর দেখা দেয়, খাদ্য হজম হয় না, এ ছাড়াও আছে নানা উপসর্গ। এতে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। তবে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বৈশিষ্ট্য হল, এরূপ রোগীর শরীর থেকে সবরকম প্রতিরোধশক্তি শেষ হয়ে যায়, ফলে ছোট ছোট রোগেও সে কাহিল হয়ে পড়ে। কোনও রোগই সে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাধিও তার পক্ষে প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই বর্তমানে এইডসে আক্রান্ত হওয়াকে অনিবার্য মৃত্যুর কারণ গণ্য করা হয়। আজ পর্যন্ত এর কোনও চিকিৎসাও আবিস্কৃত হয়নি। গবেষণা ও অনুসন্ধান করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই যে, এ রোগের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হল 'ইঞ্জেক্‌শনের মাধ্যমে শিরায় মাদকগ্রহণ' এবং 'অবাধ যৌনাচার'। সাধারণত সমকামিতার ফলে এ রোগ জন্ম নিয়ে থাকে। এমনসব পুরুষও এতে আক্রান্ত হয়, যারা কোনও বাছ-বিচার ছাড়া সবরকম নারীর সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। এমনিভাবে যেসব নারী সবরকম পুরুষের সাথে বা বেশি সংখ্যক পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে, তারাও এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। আমেরিকায় যখন প্রথম এ রোগের উদ্ভব হয়, তখন থেকে সেখানকার সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহে এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ চলছেই। প্রতিটি পত্রিকার দ্বিতীয় কি তৃতীয় সংখ্যায় এইডসের খবর, এইডস সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে মানুষের অভিমত ছাপা হচ্ছে। তবে এবারের আমেরিকার 'টাইমস' পত্রিকা তার ১৬-ই ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় এ বিষয়ে তিনটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। প্রতিটি নিবন্ধ অত্যন্ত সারগর্ভ ও তথ্যবহুল। নিবন্ধগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় তার চৌম্বক অংশ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। একটি নিবন্ধের শিরোনাম পত্রিকাটির প্রচ্ছদে বড় হরফে ছাপা হয়েছে। শিরোনামটি এরূপ –

ভয়ঙ্কর বিপদ

অবাধ যৌনাচারীগণ কিভাবে এইডসের গ্রাসে পরিণত হচ্ছে

একটি নিবন্ধ লিখেছেন টাইমসেরই এক নিবন্ধকার মার্থা স্মিলজিস (Martha Smilgis)। দ্বিতীয়টি লিখেছেন পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক

ক্লদিয়া ওয়াল্স। তারা উভয়ই এইডসের প্রভাব সম্পর্কে এক সাংবাদিকসুলভ জরিপ করার পরই নিজ নিজ নিবন্ধ তৈরি করেছে। তৃতীয় নিবন্ধটি লিখেছেন মিকাইল এইচ সিরাল। তিনি তার নিবন্ধে আফ্রিকায় এই রোগের ব্যাপকধ্বংসলীলা সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন।

এসব নিবন্ধে প্রদত্ত হিসাবমতে বর্তমানে আমেরিকায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি সংখ্যক লোক এ রোগে আক্রান্ত। আটলান্টার চিকিৎসাকেন্দ্রের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক যারা নির্বিচারে বিভিন্ন লোকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত করে, এই রোগের কারণে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এই রোগের সর্বাপেক্ষা ভীতিকর দিক হল, এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর বাহ্যিক রোগের আকৃতি ধারণ করতে করতে বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়কাল পার হয়ে যায়। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের ধারণামতে এ সময়টা দশ বছর পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। যার অর্থ দাঁড়ায়– যার দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করে, খুব শীঘ্রই যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমনটা হওয়া অনিবার্য নয়; বরং ব্যাধিরূপে এর উপসর্গ প্রকাশ পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে। এমনিক তা দশ বছর পরেও হতে পারে। এদিকে লক্ষ করেই স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের ধারণা, আমেরিকায় দশ লাখেরও বেশি লোক এইডসের জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি এমন, যাদের এই ঘোর বিপদ সম্পর্কে কোনও খবর নেই, যেহেতু তার উপসর্গ এখনও তাদের শরীরে প্রকাশ পায়নি।

আমেরিকা ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশেও এই রোগ অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সেখানে ইতোমধ্যে বিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত মানুষ এইডসে আক্রান্ত হয়ে গেছে। আমেরিকার স্বাস্থ্য ও সেবামন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি ওয়াল্টস অর্বাউনের বক্তব্য হল–

"আমরা যদি এ রোগের প্রতিরোধে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারি, তবে আগামী দশ বছরের ভেতর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য এই সর্বগ্রাসী ব্যধি ভয়াবহ মৃত্যুপরোয়ানারূপে আবির্ভূত হবে।"

জন পপ কিংস ইউনিভার্সিটির সুদক্ষ মহামারি বিশেষজ্ঞ বি. ফ্র্যাঙ্ক পক বলেন–

> "কোনও কোনও দেশের সর্বমোট জনসংখ্যার পঁচিশ শতাংশ এই মহামারিতে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এখনও পর্যন্ত এই রোগের কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। অনেক চেষ্টা-শ্রমের পর যে দু'-চারটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবলই সাময়িক ও তাৎক্ষণিক একটা ব্যবস্থামাত্র। স্বল্প সময়ের জন্য তা রোগের তীব্রতাকে দমন করে রাখে মাত্র, আদৌ স্থায়ী আরোগ্য লাভ হয় না; বরং কোনও কোনও ওষুধে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করে, যেমন– অস্বাভাবিক রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি করা, সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কোনও কোনও ওষুধ ব্যবহারকালে প্রতি সপ্তাহে রোগীর শরীরের সমস্ত রক্ত বদলানো অপরিহার্য হয়ে যায়।

অন্যদিকে এই সাময়িক চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমেরিকায় এইডস রোগীদের সেবাযত্নে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার পরিমাণ আনুমানিক দশকোটি ডলার। অনুমান করা যাচ্ছে, এই ব্যয় ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বার্ষিক ১০৪ কোটি ডলার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[৮৩]

অন্য এক অনুসন্ধানমতে আমেরিকায় এইডসের প্রতি দশজন রোগীর চিকিৎসায় চার লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার ব্যয় হয়। এই অংক আফ্রিকার রাষ্ট্র জায়ারের সর্ববৃহৎ হাসপাতালের সারা বছরের বাজেট অপেক্ষাও বেশি।[৮৪]

এভাবে এইডসে আক্রান্ত দেশসমূহের জন্য এই মরণব্যাধি এক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জেও পরিণত হতে যাচ্ছে। এই রোগ থেকে আত্মরক্ষার কোনও নিশ্চিত উপায় সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত কোনও অবগতি লাভ হয়নি। আমেরিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, আমেরিকার যে ব্যক্তিই কোনও নতুন সঙ্গীর সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয় কিংবা এমন কোনও পুরোনো সাথীর সংগে যার অতীত অবস্থা জানা নেই, সেই এইডসের খতরার মুখে আছে।[৮৫]

আমেরিকার সমাজে নির্বিচার যৌনাচারের যে ন্যক্কারজনক সয়লাব বয়ে চলছে, তার পরিণামে স্বামী-স্ত্রীও এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কারণ অনেক সময় তাদেরও বিগত যৌনজীবন সম্পর্কে পরস্পরের কিছু জানা থাকে না। ফলে এই খতরা এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। উভয় জীবনসঙ্গী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল-টেস্ট না করিয়ে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিবাহিত দম্পতিও, যারা কিনা ভবিষ্যতে আর কোনও রকম ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গিকার করে নিয়েছে, এই খতরা থেকে মুক্ত নয়। বর্তমানে আটলান্টার স্বাস্থ্যকেন্দ্রই এইডস রোধে সর্বাপেক্ষা বেশি তৎপর। এর জনৈক দায়িত্বশীল অফিসারের বরাতে মার্থা স্মিলজিস লেখেন–

---

৮৩. নিউইয়র্কটাইমস, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, পৃ. ২৮, কলাম ৩

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, কলাম ২

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, কলাম ২

"আমরা ১৯৬০-এর দশকে যে পাপ করেছিলাম, এখন তার মূল্য শোধ করছি। তখন তো অবস্থা এই ছিল যে, রাত আসামাত্র কোনও রকম দায়িত্বহীনভাবে যৌনাচারে লিপ্ত হওয়াকে এক আকর্ষণীয় ফ্যাশন মনে করা হত।"[৮৬]

এখন অনেকেই এই কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবছে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকার এরই মধ্যে মনে করছে যে, স্বভাব-প্রকৃতিবিরোধী নির্বিচার যৌন সংসর্গের চলমান কদাচার আর নয়,তার এখনই অবসান হওয়া উচিত। মার্থা স্মিলজিস লেখেন–

"যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সর্বাবস্থায় এ বিষয়ের অনুকূলে কথা বলছে, যা কিনা এখন বলতে গেলে প্রায় সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, তথাপি আমেরিকার স্বাস্থ্য ও সেবামন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি ওয়াল্টস অর্বাউন বলেন, জীবনপ্রণালীতে পরিবর্তন আনা এখন এক অপরিহার্য প্রয়োজন। এর উপর যতবেশিই গুরুত্ব দেওয়া হোক, তাকে কমই বলতে হবে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালীন আমেরিকার জন্য এর অর্থ দাঁড়ায়, বিগত শতাব্দির শেষ প্রান্তে যে যৌনবিপ্লব দেখা দিয়েছিল তা অবশ্যই রহিত করে দেওয়া হোক।"[৮৭]

নির্বিচার যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার পরিণামে যারা এই আশংকাবোধ করছে যে, তাদের ভেতর এইডসের জীবাণু এসে গেল কিনা, তারা এখন যে-কোনও যৌনকর্মেই ভীতসন্ত্রস্ত। কেউ কেউ তো নিজের ভেতর এইডসের জীবাণু থাকার সংবাদ শোনামাত্রই তার ভবিষ্যত কষ্টের আশংকায় আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। আটলান্টার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যা কিনা এখন এ জাতীয় লোকদের আশ্রয়স্থলে পরিণত, সকাল-সন্ধ্যায় এরকম অসংখ্য লোকের ফোন এসে থাকে। কেন্দ্রের ডাইরেক্টর মেরি মিলিমাঙ্গ বলেন–

"অতীত জীবনে যেসকল নারী অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত ছিল, তাদেরকে আমি ভীষণ ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাচ্ছি। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তারা অবশিষ্ট জীবনে সম্পূর্ণরূপে পুরুষসঙ্গ বর্জন করে চলবে।"[৮৮]

কিন্তু আমেরিকান সমাজে অবাধ যৌনাচারের সংস্কৃতি যেভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং তা এখন যে পর্যায়ে পৌছে গেছে, আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন। যেসকল চিন্তাশীল ব্যক্তি এ অবস্থার সংশোধনকল্পে

---

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, কলাম ২৪
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, কলাম ১
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, কলাম ৩

বিভিন্ন রকম চেষ্টা করছে, বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে তারা অনেকটা হাতাশাই প্রকাশ করছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভব, এটা যেন তারা এখন ভাবতেই পারছে না। কেননা যেসকল লোক এখনও পর্যন্ত এই মহামারির সম্মুখীন হয়নি, তারা তাদের ইন্দ্রিয়াসক্তিতে কোনও রকম পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত নয়; বরং এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে তারা যথারীতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। টাইমসের উল্লিখিত নিবন্ধে এর কিছু উদাহরণও পেশ করা হয়েছে। তাই স্বাস্থ্যবিভাগ বাধ্য হয়েই এখন অন্য চিন্তা করছে। এখন তাদের চেষ্টা হল মানুষ যেন যৌনসংসর্গকালে অন্ততপক্ষে এমন কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করে, যা দ্বারা এইডসের আক্রমণকে প্রতিহত করা যাবে। সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ভেতর কনডম ব্যবহারের কথাও আছে। সুতরাং নিরাপদ যৌনকর্ম (Safe Sex) শিরোনামে সর্বত্র এর প্রচার ও প্রশিক্ষণ চলছে।

কিন্তু এসব কৌশলের তালীম ও প্রচার অশ্লীলতা হ্রাসে কোনও ভূমিকা রাখতে পারেনি; বরং তাতে অশ্লীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা মার্থা স্মিলজিসের ভাষায়–

"এভাবে প্রেসে এবং টেলিভিশনের পর্দায় মানুষের কসরত এবং কনডমের মত যৌনসামগ্রী ব্যবহারের বিশদ বিবরণ এসে যাওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে যৌনকলার চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা এখন ঘরে ঘরে এমন খোলামেলা হয়ে গেছে যে, এক বছর আগেও বিষয়টার এমন খোলামেলা চর্চা কল্পনাও করা যেত না।"[৮৯]

এতদসত্ত্বেও এ রোগের সাথে যাদের নিকটতম কোনও সম্পর্ক নেই, তারা এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণে মোটেই প্রস্তুত নয়। যখন এইডসের ভয়াবহতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা এই বলে কথা উড়িয়ে দেয় যে, আমরা তো এমন এমন করি, আমাদের কিছুই হবে না।

কিন্তু তথাপি এই প্রচার-প্রচারণার এসব পণ্ডশ্রম কোনও সীমারেখা মানছে না। নিউয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কী করেছে দেখুন। সেখানকার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ডাইরেক্টর ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে স্থাপনাসমূহের টয়লেটে কনডম সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাছাড়া ৩১ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকাও বিতরণ করেছে, যাতে নিরাপদ যৌনক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য এমন খোলামেলা কথা লেখা হয়েছে যে, 'টাইম'-এর নিবন্ধে

---

৮৯. পৃষ্ঠা ২৫, কলাম ১

তার যেসব বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, এস্থলে তার উল্লেখ করার ক্ষমতা আমার কলমের নেই।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে সপ্তাহ দুয়েক আগে 'এইডস ও কলেজ ক্যাম্পাস' শিরোনামে একটি সেম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। তাতে নব্বইটি কলেজের চারশ' পঁয়ত্রিশজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ওই সেম্পোজিয়ামে একটি ফিল্ম প্রদর্শিত হয়, যাতে 'নিরাপদ যৌনক্রিয়া'-এর বাস্তব নমুনা দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রগণ এ সেবা গ্রহণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তারা উপরিউক্ত পুস্তিকাটি ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয় এবং কনডমকে অতৃপ্তির কারণ সাব্যস্ত করে। একুশ বছর বয়সী এক ছাত্রকে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে উত্তর দেয়, কামোত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠলে মানুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন আর আত্মসংযম সম্ভব হয় না। পাঁচ বছর পরে কী ঘটবে তা চিন্তা করার মত মানসিকতা তখন থাকে না। তখন তো চিন্তা করা যায় কেবল সেই মুহূর্ত সম্পর্কেই।

ঔপন্যাসিক এরিকা জেবিংগ, যিনি যৌন স্বাধীনতার একজন বলিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন, 'ওয়াশিংটন পোষ্ট'-এর কলামে উপরিউক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন–

"এখন তো এ কাজটি বড় কঠিন হয়ে গেল। কেননা প্রথমে সঙ্গীর অতীত যৌনজীবন ও মাদক ব্যবহারের ইতিহাস জানতে হবে। তাছাড়া তার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ফলাফলও জেনে নিতে হবে। সেইসংগে তার হাতে কনডম ধরিয়ে দিতে হবে। এত্তসব ঝামেলার চেয়ে এটাই কি বেশি সহজ নয় যে, যৌনকর্ম সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে কোনও ধর্মসংঘের সদস্য হয়ে যাও?"[১০]

এই হচ্ছে বিদ্যমান পরিস্থিতি। এ কারণেই মেরী শারমিন নাম্নী জনৈক স্বাস্থ্যশিক্ষিকা বলেন–

"আমাদের ও কনডমের মধ্যে গোটা এক প্রজন্মের দূরত্ব।"

সুতরাং সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও লস এঞ্জেল্সের 'এইডস প্রজেক্ট'-এর ডাইরেক্টর ড. জার্মান মীসোনিটের অনুমান–

"গড়পড়তা প্রতি পাঁচ সেকেণ্ডে একজন আমেরিকান অত্যন্ত বিপজ্জনক যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।"

---

১০. পৃষ্ঠা ২৫, কলাম ১

আমেরিকান কলেজ হেল্‌থ এসোসিয়েশন এইডস রোগের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। তার চেয়ারম্যান ড. রিচার্ড কেলিং শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ব্যাপারে এই বলে নিজ হতাশা প্রকাশ করেন যে–

"স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে একটি হতাশাকর দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ভীতিকর পর্যায়ে না পৌঁছাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এইডস রোগ সমাজের অবশিষ্ট লোকজনের জন্য ব্যক্তিগত সমস্যায় পরিণত হবে না এবং তারা সুচিন্তিতভাবে নিজ কর্মপন্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনবে না।"[৯১]

এই ছিল টাইম ম্যাগাজিনে মুদ্রিত উপরিউক্ত তিনটি প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সারসংক্ষেপ। এই সারসংক্ষেপের কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করতে আমাকে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বার বার কলম থমকে গেছে এবং লজ্জা-শরমে নিজেকেও থমকাতে হয়েছে, কিন্তু তারপরও এই চিন্তা করে তা লিখতে বাধ্য হয়েছি যে, আমেরিকান সমাজের এই বাস্তবচিত্র আমাদের সমাজের ওইসকল লোকের সামনে নিয়ে আসা একান্তই দরকার, যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুগমন করাকে নিজেদের জন্য মুক্তির রাজপথ মনে করে। উপরে যেসব তাজা ঘটনা এবং পশ্চিমা সমাজের যে আধুনিক রূপ তুলে ধরা হল, তার কোনও পর্যালোচনা করার দরকার পড়ে না। এই ঘৃণ্য ও কদর্য ঘটনাবলীর পূতিগন্ধময় আবর্জনা এর উপযুক্তই নয় যে, কোনও দ্বীনী ও 'ইলমী পত্রিকায় তা উদ্ধৃত করা হবে। তথাপি দু'টি কারণে মন ও দিলের উপরে চাপ সৃষ্টি করে এই অরুচিকর পদক্ষেপ আমাকে নিতে হয়েছে –

এক. এসব অবস্থা জানার পর মানবতার দরদীবন্ধু হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরিউক্ত হাদীছটি আরেকবার পড়ুন, যা দ্বারা আমাদের এ সম্পাদকীয় লেখা শুরু করেছিলাম। এরপরও কি কুরআন মাজীদের এই বাণীতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে যে –

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থ : 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশি থেকে এসব বলেন না; বরং এটা কেবলই ওহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।'[৯২]

---

৯১. পৃষ্ঠা ২৭, কলাম ১

৯২. সূরা নাজ্‌ম, আয়াত ৩-৪

এতটুকু কথা তো নিজ চিন্তা-ভাবনা থেকেও বলা যায় যে, অশ্লীলতা দ্বারা রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। কিন্তু এ কথাও কি বলা সম্ভব যে, এমন রোগ-ব্যাধিও ছড়ায় যা অতীতকালে কখনও দেখা দেয়নি এবং অতীতের মানুষ কখনও দেখেনি? এটা বলা যেতে পারে কেবলই ওহীর আলোকে। যে ওহী কোনও নবীকে শতশত বছর পরের চালচিত্র দেখার যোগ্যতা দান করে।

দুই. দ্বিতীয়ত আমি এসব কথা লিখেছি এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে আমাদের সমাজ এখনও পর্যন্ত অধঃপতনের ওই স্তরে নামেনি। যা টাইমসের ওই প্রবন্ধগুলোতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এমন অনেক কারণ ও অনুঘটক আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা আমাদের সমাজকে অধঃপতনের ওই স্তরে টেনে-হেঁচড়ে নামানোর জন্য কার্যকর রয়েছে। শুদ্ধতা ও শুচিতা এবং আখলাক ও শরাফাতের মূল্যবোধ অতিদ্রুতই নিঃশেষ হতে চলেছে। পর্দাহীনতা, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, পেক্ষাগৃহ, সহশিক্ষা এবং বিভিন্ন রকমের নাচ-গানের আসর আজ যেভাবে চরিত্রহননে ভূমিকা রাখছে, তাতে অধঃপতনের সর্বশেষ সীমানায় পৌছাতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার সবরকম বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এরকম আরও কত আয়োজন সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে, যা আমাদের গতিবেগকে অতি ক্ষীপ্রতার সাথে ধ্বংসের পথে ধাবিত করছে। সে আয়োজনের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেই শূন্যঘরকে ভিডিও ফিল্ম পূরণ করে দিয়েছে। চরম পরিহাসের কথা হল, ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার সরকারের আমলেই ভি.সি.আর. আমদানির পথ পর্যন্ত সুগম করে দেওয়া হয়েছে। এর উপরে আইনের যা-কিছু কড়াকড়ি ছিল তা শিথিল করে ফেলা হয়েছে, যাতে আমেরিকান সংস্কৃতিরঘৃণ্য-কদর্য চিত্র আমাদের সমাজের লোকজন ঘরে বসে বসে দেখতে পারে আর এভাবে অবাধ যৌনাচারের গলিত আবর্জনা এ দেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ সবকিছুই হচ্ছে যুগচাহিদার নামে। শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, আমরা সেই ইসলাম চাই, যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং যা মডার্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণোদ্যমে আমরাও যেন ওই মহামারিকে স্বাগত জানাচ্ছি, পশ্চিমা দেশসমূহ থেকে যার উদ্ভব ঘটেছে।

উপরিউক্ত বাস্তবতার নিরিখে কেউ যদি এখন বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এই জাতির প্রতি রহম কর, এখান থেকে পর্দাহীনতা, নগ্নতা ও

অশ্লীলতাকে বিদায় কর, সহশিক্ষার অভিশাপ থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা কর, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে দাও, ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে আখলাক-চরিত্র ধ্বংসের যে মহাযজ্ঞ চলছে তা বন্ধ কর, গান-বাজনা ও নাট্যরঙ্গের আসরসমূহে বিধি-নিষেধ আরোপ কর এবং এভাবে এ জাতিকে ধ্বংস ও পতনের ওই অতল গহ্বর থেকে রক্ষা কর, যেখানে পৌঁছে পাশ্চাত্য দেশসমূহ তার মানবিক অস্তিত্ব শেষ করে ফেলেছে, তবে সেই ব্যক্তিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, সংকীর্ণমনা ও প্রাচীনপন্থী সাব্যস্ত করা হয়, তাকে উন্মাদ ঠাওরানো হয় এবং বলা হয়, সে যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে জানে না। কাজেই তার ডাক ও চিৎকার আধুনিক জীবনের উদ্দাম-উল্লাসের ডামাডোলে হারিয়ে যায় এবং যে-কোনও মূল্যে তা হারিয়ে যাওয়াই উচিত।

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

'বুদ্ধির নাম রাখলে পাগলামী আর পাগলামীর নাম বুদ্ধিমত্তা
আপনার যা ইচ্ছা তাই করেন হে রূপের কারিগর!'

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারাঃ, পৃষ্ঠা ২৫-৩৩
২৭ জুমাদা ছানিয়াঃ, ১৪০৭ হি.

মুসলিম উম্মাহ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

মুহতারাম সভাপতি জনাব ডক্টর জাফর ইসহাক আনসারী সাহেব
এবং উপস্থিত সুধিবৃন্দ!

আজ আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, দেশের এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত এ মহতী মজলিসে একজন তালিবে 'ইলম হিসেবে আমার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ হয়েছে। এখানে সারাদেশ থেকে চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। তাদের উপস্থিতিতে এমন একটি বিষয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে আলোচনার সৌভাগ্য দান করা হয়েছে, যে বিষয়টি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মুহতারাম ভাই ডক্টর জাফর আনসারী সাহেব আমার সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা আমার সম্পর্কে তার সুধারণা ও মহব্বতেরই বহিঃপ্রকাশ। আমার ব্যাপারে তিনি যে অনুভূতি ও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সে সম্পর্কে আমি কেবল এতটুকুই আরয করতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা যেন বাস্তবিকই তার উপযুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করেন– আমীন।

মুসলিম উম্মাহ'র পরস্পর বিরোধী দু'টি দিক

আপনাদের সকলেরই জানা আছে, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হল 'মুসলিম উম্মাহ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে'। এটা এমনই এক ব্যাপক জিজ্ঞাসা, যার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। যেমন, রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলিম উম্মাহ'র অবস্থান আজ কোথায়? অর্থনৈতিক দিক থেকে সে কোথায় আছে? নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে সে কোন্ জায়গায় আছে? এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে মুসলিম উম্মাহ'র অবস্থান সম্পর্কে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে। এর প্রত্যেকটি বিষয়ই বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে। সবগুলো দিক

সম্পর্কে এক মজলিসে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি এবারের মত কেবল একটা প্রশ্ন সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিছু আরয করতে চাচ্ছি। প্রশ্নটি হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ আজ চিন্তা-চেতনার দিক থেকে কোথায় দাঁড়িয়ে?

আজ আমরা যখন মুসলিম উম্মাহ'র বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করি, তখন পরস্পর বিরোধী দু'টি ধারণা আমাদের সামনে আসে। একটি ধারণা তো এই যে, মুসলিম উম্মাহ আজ চরম অবক্ষয় ও অধঃপতনের স্বীকার। তাই চারদিকে আজ এ জাতির দূরাবস্থার কথাই শোনা যায়। তার অধঃপতন ও দুর্দশার কথাই আজ মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু অপরদিকে এই পরিস্থিতির ভেতরও ইসলামী জাগরণ, যাকে আরবীতে 'আস্-সাহওয়াতুল-ইসলামিয়্যাঃ' নামে অভিহিত করা হয়, এর কথাও সোচ্চারভাবে আলোচিত হচ্ছে। প্রথমোক্ত ধারণার সারকথা হল, মুসলিম উম্মাহ আজ অধঃপতিত। সবদিক থেকেই সে আজ দুর্দশাগ্রস্ত। আর দ্বিতীয় ধারণার সারকথা হল, মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে অস্বাভাবিক আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে এবং শোনানো হচ্ছে সীমাতিরিক্ত সম্ভাবনার বাণী। অনেক সময় প্রথমোক্ত ধারণায় প্রভাবিত ও পরাভূত হয়ে আমরা হতাশার শিকার হয়ে পড়ি,আবার কখনও কখনও দ্বিতীয় ধারণার প্রভাবে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আশান্বিত হই এবং অপরিমিত সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি।

বাস্তবতা এ দুই প্রান্তিকতার মাঝখানে

আমার বিনীত আরয এই যে, সত্য ও বাস্তবতা মূলত এ দুই প্রান্তিকতার মাঝখানে। একদিক থেকে এ কথাও সঠিক যে, একটি জাতি হিসেবে আমরা আজ অধঃপতন ও অবক্ষয়ের শিকার। অন্যদিক থেকে এ কথাও সত্য যে, এই অধঃপতন ও অবক্ষয়ের ভেতরও ইসলামী নবজাগরণের ঢেউ মুসলিম জাহানে সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছে।কিন্তু আমাদেরকে মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করতে হবে। সুতরাং আমাদের এতটা হতাশ হওয়া চলবে না, যা আমাদেরকে সম্পূর্ণ নিরুদ্যম ও কর্মবিমুখ করে দেয়। এমনিভাবে ইসলামী নবজাগরণের কেবল শ্লোগান ও নামসর্বস্বতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এতবেশি আশান্বিত হওয়া উচিত হবে না, যার ফলে আমরা আত্মশুদ্ধি থেকে গাফিল হয়ে যাই এবং নিজেদের সংশোধন করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ি। বস্তুত সত্য এই দুই 'চরম'-এর মাঝখানে। আর এই কারণেই এ আলোচ্য বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। 'মুসলিম উম্মাহ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে' এই প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্ন আপনা-আপনি উঠে আসে। তা হচ্ছে, এই উম্মতের গন্তব্য কোথায়? তাকে

কোথায় পৌঁছতে হবে? এ বিষয়ের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে আমি উভয় প্রান্তিকতা থেকে কিছুটা সরে দাঁড়াতে চাই। আমি এতদুভয়ের মাঝখানে একটি ভারসাম্যমান পন্থা অবলম্বন করতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যদিও এ কথা সত্য যে, আমরা জীবনের বহু শাখায় ভয়াবহ অধঃপতনের শিকার, কিন্তু তারপরও আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্র এই অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে যে, আমাদের উচিত আমাদের মূলের দিকে ফিরে যাওয়া এবং একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই ভূপৃষ্ঠে দ্বীনে-ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট থাকা। এই অনুভূতিকেই আজকাল পরিভাষায় 'আস্-সাহওয়াতুল-ইসলামিয়্যাঃ' বা ইসলামের নবজাগরণ নামে অভিহিত করা হয়।

ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি উদাহরণ

এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক আজব কারিশমা যে, আজ মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক বাগডোর যাদের হাতে তাদের দিকে লক্ষ করলে প্রতিয়মান হয় যে, আমরা ইসলাম থেকে চরমভাবে দূরে সরে পড়েছি। একটি ঘটনা খোদ আমার সঙ্গেই ঘটেছে। যদি আমার সঙ্গে না ঘটত, তবে এরূপ কিছু হতে পারে বলে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে মুশকিল হত, কিন্তু যেহেতু আমার নিজের সঙ্গেই ঘটেছে তাই বিশ্বাস না করে তো উপায় নেই। একবার একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক প্রসিদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রেযাওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তাকে একখানি কুরআন মাজীদ উপহার দেওয়া হবে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেওয়ার আগে প্রোটোকলের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। সুতরাং প্রতিনিধির পক্ষ থেকে প্রোটোকলকে জানানো হল, আমরা তাকে এই উপহার দিতে চাই। একদিন পর আতিথেয়তার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার আমাদেরকে জানালো যে, প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে কুরআন মাজীদ উপহার দেওয়া যাবে না, কেননা তাকে এই উপহার দেওয়া হলে দেশের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুরোধ জানানো হল আমরা যেন কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনও উপহার প্রদান করি। এই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্তরে আমাদের ইসলাম-সম্পৃক্ততার হাল। সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পর্যায়ে ইসলামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু, এ ঘটনা দ্বারাই তার চালচিত্র অনুমান করা যায়।

ইসলামী নবজাগরণের একটি দৃষ্টান্ত

ওই জবাব শোনার পর একই দিন সন্ধ্যাকালে নামায আদায়ের জন্য একটি মসজিদে যাওয়া হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক তরুণ ও যুবকদের দ্বারা মসজিদটি ভরা ছিল। বৃদ্ধদের তুলনায় নওজোয়ানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। নামাযের পর সমস্ত যুবক এক জায়গায় বসে তাদের মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এটা তাদের প্রাত্যহিক নিয়ম। নামাযের পর দ্বীন-সম্পর্কিত কোনও কিতাব পড়ে শোনানো হয় এবং নিজেদের মধ্যে সে নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদেরকে জানানো হল, পাঠচক্রের এই ব্যবস্থা কেবল সেই এক মসজিদেই নয়; বরং সারাদেশের সবগুলো মসজিদে এটা চালু আছে। তাদের কোনও আনুষ্ঠানিক সংগঠন নেই এবং পরস্পরে আনুষ্ঠানিক কোনও যোগসূত্রও নেই। তা সত্ত্বেও প্রতিটি মসজিদে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

মুসলিম জাহানের সামগ্রিক অবস্থা

এর দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারেন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের সাথে আমাদের আচরণ কী, অন্যদিকে নতুন প্রজন্ম ও তরুণদের ভেতর ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততার প্রকাশ কিরূপ ঘটছে। যাহোক, সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামের সাথে বিরোধভাবাপন্ন আচরণ করা হচ্ছে কিংবা অন্ততপক্ষে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ ইসলামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা হচ্ছে না। রাজনীতি ও রাষ্ট্র চলছে সম্পূর্ণরূপে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্করহিত অবস্থায়। সংশ্লিষ্ট কর্ণধারদের ইসলামের প্রতি কোনও আগ্রহই লক্ষ করা যাচ্ছে না। কিছু ব্যতিক্রমের কথা আলাদা। অন্যদিকে আমজনগণের ভেতর বিশেষত তরুণদের স্তরে নবজাগরণের ঢেউ দৃশ্যমান। তাদের ভেতর ইসলামী চিন্তা-চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনও জোরদারভাবে চলছে যে, কিভাবে ইসলামকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করা যায় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে কিভাবে বাস্তবরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

ইসলামের নামে ত্যাগ-তিতিক্ষা

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এ পথে মানুষ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করছে। কুরবানীর কোনও কমতি নেই। বহুদেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার

জন্য প্রবল আন্দোলন চলছে এবং সেসব আন্দোলন এমনভাবে চলছে যে, সেজন্য মানুষজনকে নিজেদের জান-মালের কুরবানী দিতে হচ্ছে এবং আবেগ-অনুভূতিরও কুরবানী পেশ করা হচ্ছে। তাদের সে ত্যাগ ও কুরবানী আমাদের জন্য রীতিমত গর্বের বিষয়। মিশর ও জায়ায়েরসহ পৃথিবীর দেশে দেশে যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে, তার জন্য এ জাতি গর্ববোধ করতেই পারে। এমনকি আমাদের দেশেও ইসলামী শরী'আত কার্যকর করার জন্য নিজেদের জান-মালের যে কুরবানী দেওয়া হয়েছে, তা ভবিষ্যত-আন্দোলনকারীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে আজও ঈমানের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ অবশিষ্ট আছে।

আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়

এই সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সাধনা ও সংগ্রাম সত্ত্বেও বিস্ময়কর ব্যাপার হল এমন একটি আন্দোলনও চোখে পড়ে না, যা সাফল্যের শেষ মঞ্জিলে পৌঁছতে পেরেছে। হয় সে আন্দোলন মাঝপথেই আপনা-আপনি থেমে গেছে অথবা তাকে দমন করে দেওয়া হয়েছে কিংবা সে আন্দোলন সামনে চলতে চলতে এক পর্যায়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, ফলে সে আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হতে পারেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ অবস্থার মূল কারণ কী? কেন এভাবে প্রতিটি ইসলামী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? নবজাগরণের এসব আন্দোলন বিপুল উদ্যমে উত্থিত হচ্ছে, কুরবানী দেওয়া হচ্ছে, এর পেছনে সময়, অর্থ ও মেহনতও খরচ হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সফলতার সুস্পষ্ট কোনও উদাহরণ চোখে পড়ছে না। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা। একজন সাধারণ তালিবে 'ইলম হিসেবে আমিও এ বিষয়ে চিন্তা করেছি। চিন্তা করার পর যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, এই মাহফিলে আপনাদের সামনে তা আরয করতে চাই। এ অবস্থার মূল কারণসমূহ কী কী এবং কী উপায়ে তা আমরা সে কারণসমূহ অপসারণ করতে পারি, সে বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র চিন্তার ফলাফল আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। বস্তুত এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে যা আরয করতে চাই তা অত্যন্ত নাজুক বিষয়। আমার এই আশংকাও আছে যে, এই নাজুক বিষয়টির প্রকাশে ও ব্যাখ্যাদানে যদি সামান্য একটু বিচ্যুতি ঘটে যায়, তবে তার ফলে অনেক বড় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সেই আশংকা থাকা সত্ত্বেও আমি দু'টি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা আমার দৃষ্টিতে এই

সুরতহালের মূল কারণ এবং যে বিষয়ে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় ও খাঁটি মনে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র

ইসলামী আন্দোলনসমূহ সফল না হওয়ার একটা কারণ তো সকলেরই জানা। তা হচ্ছে অমুসলিম শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র। তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে দাবিয়ে রাখার জন্য সর্বপ্রকারে চক্রান্ত চালাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার পড়ে না, যেহেতু প্রত্যেক মুসলিম এ বিষয়ে অবগত। তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হল, অমুসলিম শক্তিসমূহের চক্রান্ত মুসলিম জাতির কোনওরূপ ক্ষতি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধন করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদ এ জাতির ভেতরে কোনও ত্রুটি ও কমতি বিদ্যমান না থাকে। সবসময় বাইরের চক্রান্ত কেবল তখনই সফল হয় এবং তখনই তা ধ্বংসসাধনে সক্ষম হয়, যখন ভেতরে কোনও বড় ত্রুটি দেখা দেয়। বস্তুত অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও অধঃপতনই বাইরের চক্রান্তকে হাতছানি দেয় ও তার সফল হওয়ার সুযোগ করে দেয়। নয়ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এমন একটা কালও কি পাওয়া যাবে, যখন শত্রুশক্তি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র চালায়নি?

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفویؐ سے شرار بولہبی

'সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত লড়াই করে আসছে
নবী মোস্তফার প্রদীপের সাথে আবু লাহাবের অগ্নিশিখা।'

কাজেই এ চক্রান্ত কখনও বন্ধ হয়নি এবং কখনও বন্ধ হওয়ারও নয়। আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তার আগেই ইবলীস জন্ম নিয়ে ফেলেছিল। কাজেই চক্রান্ত কখনও বন্ধ হবে– এই আশা করা অতিবড় আত্মপ্রবঞ্চণা।

চক্রান্ত সফল হওয়ার কারণ

আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে সেই দোষ ও ত্রুটি কী, যদ্দরুন আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ষড়যন্ত্রসমূহ সফল হতে পারছে? এটা চিন্তা করা দরকার এ কারণে যে, আমরা যখন আমাদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করি তখন সবটা অভিযোগ ও দায়-দায়িত্ব বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কাঁধে

চাপিয়ে দেই। এটা অমুকের ষড়যন্ত্রে হচ্ছে, এটা অমুকের বপন করা বীজ, এর পিছনে অমুকে কলকাঠি নাড়ছে এবং এ জাতীয় আরও নানারকম মুখস্থ বুলি আওড়িয়ে আমরা খালাস হয়ে যাই। অথচ এভাবে খালাস না হয়ে চিন্তা করা দরকার ছিল আমাদের ভেতরও কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কি? এবং থাকলে তা কী, যদ্দরুন আমাদের সংগ্রাম বানচাল হয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র সফলতা পাচ্ছে? এ প্রসঙ্গে আমি দু'টি মৌলিক বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা আমাদের আন্দোলনসমূহ ব্যর্থ হওয়ার অনেক বড় কারণ।

ব্যক্তিগঠনে উদাসীনতা

প্রথম বিষয় হল ব্যক্তিগঠনের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাচ্ছি, লেখাপড়া জানা প্রতিটি লোকই অবহিত আছে যে, ইসলামের শিক্ষা, জীবনের প্রতিটি শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তার মধ্যে অনেক বিধানই সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে জড়িত আর অনেক বিধান মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক বিধান দেওয়া হয়েছে সমগ্র জাতিকে লক্ষ করে আর অনেক বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে লক্ষ করে প্রদত্ত। বিষয়টা তো এভাবেও ব্যক্ত করা যায় যে, ইসলামী বিধানাবলীতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ ভারসাম্য রয়েছে। এই ভারসাম্যকে রক্ষা করা হলেই ইসলামী শিক্ষামালার উপর যথাযথ আমল করা হয়। পক্ষান্তরে এর মধ্যে কোনও একটিকে উপেক্ষা করা হলে কিংবা কোনও একটির উপরে মাত্রাতিরিক্ত জোর দেওয়া হলে এবং অন্যটিকে খাটো করে দেখলে তাতে ইসলামের যথাযথ অনুসরণ হয় না এবং ইসলামী বিধানাবলীর যথার্থ প্রয়োগও সাধিত হয় না। ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে যে ভারসাম্য রয়েছে, আমরা নিজেদের কর্ম ও চিন্তায় সেই ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখিনি; বরং তাতে এমন গোলমাল করে ফেলেছি, যার পরিণামে বিধানাবলীর গুরুত্বের পর্যায়ক্রম উলট-পালট হয়ে গেছে।

সেক্যুলারিজমের খণ্ডন

একটা সময় ছিল যখন সেক্যুলারিজমের প্রোপাগাণ্ডার কারণে মানুষ ইসলামকে মসজিদ-মাদ্‌রাসা, নামায-রোযা ও 'ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। অর্থাৎ মানুষ মনে করেছিল ইসলাম কেবলই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেক্যুলারিজমের দর্শনও এটাই যে, ধর্মের সম্পর্ক কেবলই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও

সমাজনীতি কোনও ধর্মের অধীন হতে পারে না এবং তা হওয়াও উচিত নয়; বরং তা হবে সময়ের দাবি ও চাহিদার অধীন। ফলে যুগ বদলের সাথে সাথে এসবের নিয়ম-নীতিতেও বদল হতে থাকবে। এই ভ্রান্ত দর্শন ও গলদ চিন্তা রদকল্পে একদল চিন্তাশীল সামনে এগিয়ে আসেন। তারা এই দর্শন রদ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, ইসলামের 'ইবাদত ও আখলাক সংক্রান্ত বিধানাবলী মানবজীবনের কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা জীবনের সর্বক্ষেত্র জুরে ব্যাপ্ত। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেই গুরুত্ব দিয়েছে, সমান গুরুত্ব তার সমাজ ও সমষ্টিগত জীবনের উপরও আরোপ করেছে।

চিন্তার বাড়াবাড়ি ও তার পরিণাম

সেক্যুলারিজমের ধারণাকে রদ করার জন্য আমরা যেভাবে চিন্তা করেছি, তাতে অনেকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমরা সামষ্টিকতার উপর এতবেশি জোর দিয়েছি, যার পরিণামে ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত বিধানাবলী পিছনে পড়ে গেছে এবং তা অনেকটা আমাদের চোখের আড়ালেই চলে গেছে। অন্ততপক্ষে এতটুকু তো হয়েছেই যে, আমাদের কাছে কার্যত তা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। উদাহরণত একটা দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। বলা হত– 'কায়সারের প্রাপ্য কায়সারকে দাও এবং আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও' অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতির ভেতর টেনে এনো না, তা আনার কোনও প্রয়োজন নেই। এভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে।

আমরা ইসলামকে রাজনৈতিক বানিয়ে ফেলেছি

এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর রদ করতে গিয়ে এর সম্পূর্ণ বিপরীত একটা দৃষ্টিভঙ্গী সামনে এসে গেছে। সে দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনীতিকে এতবেশি জোর দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ইসলাম সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ধর্ম হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, দ্বীনের মূল লক্ষই হচ্ছে একটা বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এটা দ্বীনের একটা শাখাকে সমগ্র দ্বীন বানিয়ে ফেলার নামান্তর। এতটুকু কথা তো সঠিক ছিল যে, রাজনীতিও ইসলামের একটা শাখা, যে সম্পর্কে ইসলাম বিশেষ বিধি-বিধান দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টা যদি এভাবে বলা হয় যে, দ্বীন মূলত রাজনীতিরই নাম কিংবা একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকরণই দ্বীনের মূল লক্ষ, তবে এর দ্বারা

গুরুত্বের পর্যায়ক্রম উল্টে যায়। আমরা এ দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করে নিলে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, আমরা রাজনীতিকে ইসলামীকরণ করার পরিবর্তে ইসলামকেই রাজনীতিকরণ করে ফেলছি এবং দ্বীনের ভেতরে ব্যক্তিগত জীবনের যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য ছিল, আমরা নিজেদেরকে তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে ফেলেছি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিজীবন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের প্রতিটি শাখাই আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবন দুই ভাগে বিভক্ত। একটি মক্কী-জীবন, অন্যটি মাদানী-জীবন। তাঁর মক্কী-জীবন ছিল তের বছরের আর মাদানী-জীবন দশ বছরের। আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী-জীবন লক্ষ করলে সেখানে রাজনীতি নেই, রাষ্ট্র নেই, জিহাদ ও সংগ্রাম নেই, এমনকি চড়-থাপ্পরের জবাব চড়-থাপ্পর দ্বারাও নয়; বরং হুকুম দেওয়া হয়েছিল– কেউ যদি তোমার গায়ে হাত তোলে তবে তুমি তার গায়ে হাত তুলবে না; বরং –

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

অর্থ : 'এবং হে নবী! তুমি সবর অবলম্বন কর। তোমার সবর তো আল্লাহরই সাহায্যে হবে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।'[৯৩]

এভাবে মক্কী-জীবনে সবর ও ধৈর্যের তালীম দেওয়া হয়েছে। অথচ তখন মুসলমান যতই দুর্বল হোক এবং তাদের সংখ্যা যতই অল্প হোক, কিন্তু তারা এতটা তো হেলাফেলার ছিল না যে, কেউ তাদের উপর দু'হাত তুললে জবাবে তারা এক হাতও তুলতে পারবে না কিংবা অন্ততপক্ষে আঘাতকারীর হাত প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। অতটুকু শক্তি নিশ্চয়ই ছিল। তা সত্ত্বেও হুকুম দেওয়া হয়েছে 'সবর কর'।

মক্কা-মুকার্‌রামায় ব্যক্তিগঠনের কাজ হয়েছে

এই হুকুম কেন দেওয়া হয়েছে? দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে, গোটা মক্কী-জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগঠন করা। অর্থাৎ এমনকিছু লোক তৈরি করা দরকার ছিল, যারা পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজের ভার বইতে সক্ষম হবে।

---

৯৩. সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ১২৭

তের বছরের মক্কী-জীবনের সারনির্যাস ছিল একদল লোককে চুল্লির ভেতর তাপিয়ে-জ্বালিয়ে তাদের কর্ম ও ব্যক্তিত্ব এবং তাদের আখলাক-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে নেওয়া।এই তের বছরের দীর্ঘ সময়কালে সেই লোকগুলোর আখলাক, আকীদা-বিশ্বাস, কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার পরিশোধন ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। কিভাবে তাদের ব্যক্তিত্বের নির্মাণ হবে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, 'তা'আল্লুক-মা'আল্লাহ'-এর মহাসম্পদ অর্জিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি তাদের অন্তরে পয়দা হয়ে যাবে, এটাই ছিল তখনকার একমাত্র লক্ষবস্তু।

ব্যক্তিগঠনের পর কী রকম লোক তৈরি হল

দীর্ঘ তের বছর এভাবে ব্যক্তিগঠনের সাধনা-মেহনতের পর মাদানী-জীবন শুরু হল। তখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী আইন, বিচার, আদালত ইত্যাদি বিষয়গুলোও সামনে আসে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের যতরকম অনুষঙ্গ আছে, সবকিছুই অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এই সকল অনুষঙ্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও যেহেতু ওই ব্যক্তিবর্গকে একবার ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করার ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছিল, তাই তাদের কারও চিন্তা-চেতনাকে একটিবারের জন্যও একথা স্পর্শ করেনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা; বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিল। তারা দ্বীন কায়েমের শ্রম-সাধনা এবং যুদ্ধ ও জিহাদের ভেতরে আত্মনিবেদিত ছিলেন। ইতিহাসে তাদের সে অবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। ইয়ারমুকের রণক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বাহিনীকে যারা সামনা-সামনি প্রত্যক্ষ করেছিল সেই শত্রুপক্ষেরই একজন তাদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে নিজ কমান্ডারের সামনে এই বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিল যে –

رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ এরা এমন লোক, যারা দিনের বেলায় থাকে অশ্বারোহী, বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে, অসম সাহসিকতার সাথে প্রতিপক্ষের উপরে হামলে পড়ে আর রাতের বেলা হয়ে যায় সাধু-সন্ন্যাসী। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তখন তাদের সম্পর্ক হয় সুগভীর। চরম আত্মসমাহিত হয়ে 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে।

সারকথা সাহাবায়ে কিরাম দু'টো জিনিসকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন। কর্ম ও শ্রম এবং তা'আল্লুক-মা'আল্লাহ– আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক। এ দু'টি জিনিস একজন মুসলিম জীবনের জন্য অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এর একটি যদি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তখন আর ইসলামের সঠিক চিত্র সামনে থাকে না।

আমরা একদিকে ঝুঁকে পড়েছি

সাহাবায়ে কিরামের কল্পনায় কখনও এই ভাবনা আসেনি যে, আমরা যেহেতু এখন একটা উঁচু কাজের জন্য বের হয়ে পড়েছি, একটা বড় লক্ষে ময়দানে নেমেছি, জিহাদ শুরু করে দিয়েছি, সমগ্রবিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি, তখন ব্যক্তিগত কোনও আমলের আর প্রয়োজন নেই। এখন আর আমাদের তাহাজ্জুদ পড়ার কী প্রয়োজন? আল্লাহ তা'আলার সামনে কাতরতা প্রকাশ ও কান্নাকাটি করার কী দরকার? আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন ও তাঁর দিকে রুজূ' হওয়ার কী জরুরত? কোনও সাহাবীর অন্তরে এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা আসেনি। বরং তারা এসকল জিনিসকে শতভাগ ধরে রেখেই জিহাদ ও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের লক্ষে রাজনীতিতে নেমেছি, এ লক্ষ পূরণের জন্য শ্রম-সাধনায় লিপ্ত হয়েছি এবং সেক্যুলারিজমকে রদ করার জন্য রাজনীতিকে ইসলামের একটা অংশ সাব্যস্ত করেছি, তখন এ বিষয়ের উপরে মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে ফেলেছি। এমনও জোর দিয়েছি যে, অন্যদিকটি আমাদের কাছে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিকে রুজূ' হওয়া, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম রাখা, তাঁর সামনে কান্নাকাটি করা, বিনয়-নম্রতায় তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হওয়া এবং তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীর আস্বাদ লাভের যে দিকটি, তা চিন্তাগতভাবে আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেছে। অন্ততপক্ষে কর্মগতভাবে তো বটেই। আমরা আমাদের মন-মানসিকতায় এই ধারণা বসিয়ে নিয়েছি যে, এখন আর আমাদের ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা তো তারচে' আরও উঁচু ও আরও বড় লক্ষ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছি। কাজেই ব্যক্তিগত 'ইবাদত আমাদের জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং আরও বড় ও আরও উঁচুলক্ষ অর্জনের জন্য তা ত্যাগ করা যেতে পারে। অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় স্তরে তো রাখা যায়ই।

ব্যক্তির সংশোধন সম্পর্কে উদাসীনতা

মোটকথা সমাজ ও সমষ্টির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরিণামে ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত বিধান জারি করেছেন, আমরা তার প্রতি চিন্তাগতভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করছি আর কর্মগতভাবে পাশ কাটিয়ে তো চলছিই। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বর্তমানকালে যে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে, তার পিছনে ইখলাস এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকরণের জযবা সক্রিয় আছে বটে, কিন্তু যেহেতু এ দ্বিতীয় দিক উপেক্ষিত থাকছে তাই এ সমস্ত আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারছে না। দেখুন কুরআন মাজীদ কত স্পষ্টভাবে ইরশাদ করছে–

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

অর্থ : 'তোমরা যদি আল্লাহ (তা'আলার দ্বীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।'[৯৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহ'র সাহায্য, বিজয় ও অবিচলতাকে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের সাহায্যকরণ ও আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ' হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। যেন বলা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কেবল তখনই আসে, যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের যোগসূত্র পাকাপোক্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন আর সে সাহায্য লাভের উপযুক্ত থাকে না।

যা অন্তর থেকে ওঠে, তা অন্তরে গিয়েই পড়ে

ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী শিক্ষামালা ব্যক্তিকে এ বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলে যে, তার সামষ্টিক সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা-মেহনত যেন খালেস ও পরিশুদ্ধ হয়। ব্যক্তি-সংক্রান্ত শিক্ষামালার ভেতরে 'ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক-চরিত্র এবং মনের হাল-অবস্থা সবকিছুই দাখিল। মানুষ যদি পুরোপুরিভাবে এর উপর আমল না করে এবং এ সমস্ত শিক্ষায় তার তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায় আর এ অবস্থায় সে সমাজ-সংস্কারের পতাকা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে, তবে তার পরিণাম ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই হয় না। এ অবস্থায় তার কোনও পরিশ্রমই সফল হতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায় একজন ভালো

---

৯৪. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৭

মানুষ না হই আর এ অবস্থায় সমাজ-সংস্কারের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই, মানুষকে আত্মসংশোধনের দিকে ডাকি, তবে তাদের কাছে আমার কথার কোনও ওজন থাকতে পারে না। আমার কথার বিন্দুমাত্র প্রভাব তাদের উপরে পড়তে পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনকে সংশোধন করে ফেলেছে, নিজের আখলাক-চরিত্র, কাজকর্ম ও নীতি-নৈতিকতাকে পরিশুদ্ধ করে তুলেছে, সে যদি অন্যকে ইসলাহের দিকে ডাকে, তাদেরকে সংশোধন হয়ে যাওয়ার দাওয়াত দেয়, তবে তার সে দাওয়াত কখনওই বৃথা যায় না। মানুষের কাছে তার কথা অত্যন্ত ওজনদার সাব্যস্ত হয়। তার কথা কেবল তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না; বরং দিলের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে গিয়ে তা প্রভাব বিস্তার করে।

আখলাক-চরিত্রের সংশোধন ছাড়া কেউ অন্যকে ইসলাহ করার ফিকিরে নেমে পড়লে তার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, যখন কোনও ফিতনা ও কঠিন পরীক্ষা সামনে এসে যায় তখন সে হাতিয়ার ফেলে পরাজয় বরণ করে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে সে সৎসাহস, তেজময়তা ও উন্নত চরিত্রের স্বাক্ষর রাখতে পারে না; বরং এরূপ লোক বিষয়াসক্তি ও সুনাম-সুখ্যাতির মোহে পড়ে যায়, যে-কোনও রকমের ফিতনা তাকে সহজেই কাবু করতে সক্ষম হয়। এরূপ লোক কার্যক্ষেত্রে নামার পর মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যায় এবং কিভাবে ক্রেডিট নেওয়া যায় সেই ধান্ধায় পড়ে যায়। প্রতিটি গতি ও যতি তখন ক্রেডিট নেওয়ার মানসিকতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আর ক্রেডিট ও কৃতিত্ব নেওয়াই যখন উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে, তখন কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণে ভুল হয়ে যায়। ফলে যতসব দৌড়ঝাঁপ করা হয়, সেই ভুল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই করা হয়। এ অবস্থায় সাফল্য লাভ ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো কী করে সম্ভব হতে পারে? তা কিছুতেই সম্ভব হয় না; বরং সবকিছুই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হয়।

সবার আগে দরকার আত্মসংশোধনের ফিকির

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীছ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণভাবে তা আমাদের নজরের আড়ালে থেকে যায়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ ۚ لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন তোমরা কী কাজ করতে।'[৯৫]

বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাযিল হলে এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত তো বলছে 'নিজের ইসলাহ করার চিন্তা কর, অন্য লোক পথভ্রষ্ট হলে তাদের পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না', তাহলে কি আমরা 'আমর-বিল-মা'রূফ' ও 'নাহী 'আনিল-মুনকার'-এর কাজ ছেড়ে দেব? আমরা কি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করব না? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– ব্যাপারটা এরকম নয়। তোমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাক। তারপর বললেন–

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَ هَوًى مُتَّبَعًا وَ دُنْيَا مُؤْثَرَةً وَ إِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَ دَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ

'যখন তোমরা সমাজে চারটা জিনিস বিস্তার লাভ করতে দেখবে–

এক. যখন দেখবে বিষয়াসক্তির আনুগত্য করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ যা-কিছুই করছে, অর্থসম্পদের মোহে করছে।

দুই. মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা হচ্ছে।

তিন. প্রতিটি বিষয়ে দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং মানুষ আখিরাত সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাচ্ছে।

চার. প্রত্যেক ব্যক্তি আপন-আপন মতে আত্মপ্রসাদ বোধ করছে অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজেকে সমঝদার মনে করছে, তাই অন্যের কোনও কথায় কান দিচ্ছে না, নিজের মতকেই বড় মনে করছে, অন্যের মতকে পাত্তা দিচ্ছে না -

তখন তোমরা একান্তভাবে নিজের ফিকির করবে, নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টায় রত হবে এবং সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেবে।'[৯৬]

---

৯৫. সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫

৯৬. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৯৮৪; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৭৮; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪০০৪

নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে

কেউ কেউ এ হাদীছের ব্যাখ্যা করেন যে, একটা সময় আসবে যখন কারও প্রতি কারও নসিহত কোনও কাজে আসবে না, তাই তখন 'আমর বিল-মা'রূফ ও নাহী 'আনিল-মুনকার' এবং দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব বলবৎ থাকবে না। তখন প্রত্যেকের উচিত হবে নিজ ঘরে বসে আল্লাহ আল্লাহ করা এবং নিজেকে সংশোধন করার কাজে ব্যাপৃত থাকা, অন্যকিছু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামের মতে এ হাদীছে সেই সময়ের কথা বলা হয়েছে, যখন সমাজের সর্বত্র পচন ধরবে। অধঃপতন ও অবক্ষয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেকে আপন স্বার্থে মত্ত থাকবে, অন্যের কথায় কর্ণপাত করবে না। যখন এরকম সময় এসে যাবে, তখন প্রত্যেকের উচিত হবে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা এবং সাধারণের চিন্তা ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে; বরং এর মানে হচ্ছে তখন সমাজ-সংশোধন অপেক্ষা আত্মসংশোধনের দিকেই বেশি মনোযোগী হতে হবে, কেননা সমাজ মূলত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিরই নাম। ব্যক্তিবর্গ সংশোধন না হলে সমাজ ও সমষ্টির সংশোধন সম্ভব হতে পারে না, পক্ষান্তরে ব্যক্তিবর্গ যদি শুধরে যায় তবে সমষ্টি আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যায়। কাজেই এরূপ পরিস্থিতিতে সমাজের সংশোধন ও অবক্ষয় রোধের তরিকা হল, ব্যক্তির নিজের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির শ্রম-সাধনায় লিপ্ত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে এর ভেতরই সমষ্টির সংশোধন নিহিত। এরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিগঠন হয়, সমাজের সদস্যবর্গের নির্মাণ হয়। যখন ব্যক্তিবর্গের নির্মাণ হয়ে যাবে, তখন সমাজের ভেতর আপনা-আপনিই এমনসব ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, যারা নিজেরা উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মের অধিকারী হবে। এর ফলে সমাজের নষ্টামি ধীরে ধীরে খতম হয়ে যাবে। সুতরাং এ হাদীছ দাওয়াত ও তাবলীগকে রহিত করছে না; বরং এর একটি স্বয়ংক্রিয় পন্থা বাতলে দিচ্ছে।

আমাদের ব্যর্থতার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ

যাহোক আমি আরয করছিলাম, আমার দৃষ্টিতে আমাদের ব্যর্থতার একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, আমরা সমষ্টিকে শোধরানোর ফিকিরে পড়ে ব্যক্তি-সংশোধনের চেষ্টা বাদ দিয়ে দিয়েছি। গোটা সমাজকে ঠিক করে ফেলব- এই চিন্তার বাড়াবাড়িতে ব্যক্তির ইসলাহের কথা ভুলে গেছি। ব্যক্তিকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হল, সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার জন্য যেসব

দাবি পূরণ করার দরকার ছিল অর্থাৎ যথাযথভাবে 'ইবাদত-বন্দেগী করা, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা, আখলাক-চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা এবং এমনিভাবে ইসলামের আরও যা-কিছু শিক্ষা আছে সে অনুযায়ী আমল করা, এ সবকিছুকেই আমরা উপেক্ষা করে চলছি। সুতরাং আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের এই দাবি পূরণের দিকে মনোযোগী না হব তথা আত্মসংশোধনের চেষ্টায় যত্নবান না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনও আন্দোলন ও কোনও প্রচেষ্টা সফল হওয়ার নয়। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–

لَنْ يَّصْلُحَ اَمْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهٖ اَوَّلُهَا

'এই উম্মতের শেষ দিকের লোকদের ইসলাহ ও সংশোধনও কেবল সেভাবেই হতে পারে, যেভাবে প্রথম দিকের লোকদের ইসলাহ হয়েছিল।'

এর জন্য কোনও নতুন ফর্মুলা আবিষ্কৃত হবে না। প্রথম যমানা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের যমানায়ও ব্যক্তি-সংশোধনের পথ ধরেই সমাজের সংশোধন হয়েছিল। কাজেই আজও ইসলাহ ও সংশোধনের সেই পথই অবলম্বন করতে হবে।

আজ আমাদের মনোযোগ যেমন রাজনীতির দিকে, তেমনি অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুর দিকেই আছে, কিন্তু ব্যক্তিগঠন ও আপন ইসলাহের দিকে আমাদের মনোযোগ বলতে গেলে নেই-ই। সামান্য যা ব্যতিক্রম আছে, তার কথা আলাদা। এই ব্যক্তিগঠন ও আত্মসংশোধনের অভাবেই আমাদের আন্দোলনসমূহ আজ সফলতা পাচ্ছে না। কোনও না কোনও স্তরে পৌঁছে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ব্যর্থতা অনেক সময় এ কারণেও হয় যে, আমাদের ঐক্যে ভাঙন ধরে এবং আত্মকলহ শুরু হয়ে যায়। এর দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই আছে। আফগান জিহাদ আমাদের ইতিহাসের এক তেজস্বান অধ্যায়। এদিকে লক্ষ করলে কবির এই কথার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی

'ইয়া আল্লাহ, এমন অগ্নিস্ফূলিঙ্গও এই ছাইভস্মের মধ্যে ছিল!'

কিন্তু সাফল্যের শেষ মঞ্জিলে পৌঁছার পর যা-কিছু ঘটছে, তা অন্যের সামনে উল্লেখ করতেও লজ্জাবোধ হয়।

منزل سے دور رہرو منزل تھا مطمئن　　　منزل قریب آئی تو گھبرا کے رہ گیا

'মঞ্জিল থেকে যখন দূরে ছিল, তখন তো পথিক ছিল আশ্বস্ত
যেই না মঞ্জিল কাছে আসল, অমনি সে হয়ে পড়ল ভীতসন্ত্রস্ত।'

আজ আমাদের আফগান ভাইদের ভেতরে যেভাবে গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, তাতে প্রতিটি মুসলমানের হৃদয় কাঁপছে। কেন এমন ঘটল? এ কারণে যে, আমাদের চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার যা দাবি ছিল, আমরা তা পূরণ করিনি। সেই দাবি পূরণ করলে এটা সম্ভবই ছিল না যে, আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছার পর বিশ্ববাসীর সামনে হাস্যস্পদ হয়ে যাব। যাহোক, সমস্ত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত একটা স্তরে পৌছার পর থেমে যায়। তার কারণ কেবল এই, আন্দোলনকারীদের ভেতর ব্যক্তিনির্মাণের কোনও মেহনত থাকে না। ব্যক্তিবর্গের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধিতে মনোযোগ দেওয়া হয় না। ব্যস এ কারণেই সমস্ত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমাদের ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ

আমার দৃষ্টিতে আমাদের ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ হল, ইসলামের ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে হয়ত আমাদের কোনও কাজ নেই-ই কিংবা যা আছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। আমি এর দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি একদিকে তো আমরা সমাজ ও সামষ্টিকতার দিকে এতবেশি জোর দিয়েছি যে, তাকেই আমরা ইসলামের সবটা সাব্যস্ত করে ফেলেছি, অন্যদিকে এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা করা হয়নি যে, বর্তমানকালে তার প্রয়োগিক পন্থা কী হবে। বর্তমানকালে যুগচাহিদাকে সামনে রেখে ইসলামের যথাযথ প্রয়োগের পন্থা কী সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করিনি। এর জন্য দরকার ছিল চিন্তা ও গবেষণা করে বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করা, দরকার ছিল উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ণয় করা, কিন্তু আমরা হয় তা করিনি কিংবা বলা যায় যথেষ্ট পরিমাণে করিনি। আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না যে, ইসলাম এ যুগে অনুসরণযোগ্য নয়। ইসলামের শিক্ষা তো কোনও মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন নয়। এটা মানুষের সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের অধিপতির পক্ষ থেকে দেওয়া বিধান। যার জ্ঞান ও শক্তির বাইরে নয় স্থান ও কালের কোনও কিছুই। সুতরাং যে ব্যক্তি এ যুগে ইসলামকে অনুসরণযোগ্য মনে করবে না, সে তো ইসলামের আওতার ভেতরই থাকতে পারে না। তবে সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, এ যুগে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও সর্বত্র তার বিধান প্রয়োগ করার জন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই কর্মপন্থা সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ গবেষণা ও বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়নি। যতটুকু করা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম।

একেক যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পন্থা একেক রকম ছিল

আমরা ইসলামের জন্য কাজ করছি, এর জন্য চেষ্টা ও মেহনত করছি এবং তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য আন্দোলন করছি। কিন্তু আন্দোলনের আগে এবং আন্দোলন চলাকালীন সকলের মাথায় এই কথা থাকা উচিত যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার অর্থ হল কুরআন ও সুন্নাহ'র বিধানাবলী বাস্তবায়িত করা। যদি বলা হয় আমাদের কাছে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী আছে, তা সামনে রেখে ফয়সালা দিয়ে দেব, তবে তা নিতান্তই সরল একটা ভাবনা হবে। আমরা এরকম সরল চিন্তা-ভাবনা নিয়েই সামনে চলছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনও মূলনীতি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হওয়া এক কথা আর অবস্থা ও পরিস্থিতিভেদে সেই মূলনীতির প্রয়োগ আরেক কথা। ইসলাম যেই আহকাম, শিক্ষা ও মূলনীতি আমাদেরকে দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। প্রতিটি যুগেই তা প্রয়োগ ও কার্যকর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু তাকে কার্যকর করা ও বাস্তব প্রতিষ্ঠাদানের জন্য প্রত্যেক যুগের চাহিদা আলাদা হয়ে থাকে। উদাহরণ মসজিদ নির্মাণের কথাই ধরুন। মসজিদ আগেও নির্মাণ করা হত, আজও নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু আগে হত খেজুর পাতা ও কাঠের দ্বারা আর আজ হচ্ছে সিমেন্ট ও লোহা দ্বারা। তো দেখুন মসজিদ প্রতিষ্ঠার মূলনীতি আপনস্থানে আছে, কিন্তু তার কর্মপন্থা বদলে গেছে।কিংবা ধরুন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের (মোকাবেলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর।'[৯৭]

তো শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়– এটা হল মূল বিধান। অতীতে এই শক্তিসঞ্চয় করা হত তীর-তরবারির মাধ্যমে আর আজকাল করা হয় যুদ্ধবিমান, বোমা ও আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রের মাধ্যমে। বোঝা গেল বিধানের প্রয়োগিক পন্থা কালভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

ইসলাম প্রয়োগের পন্থা কী হবে

এমনিভাবে আধুনিক জীবনে যখন ইসলামী বিধানাবলী কার্যকর করা হবে, তখন নিশ্চয়ই তার কোনও কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। এখন দেখার

---

৯৭. সূরা আনফাল, আয়াত ৬০

বিষয় হল সেই কর্মপন্থাটি কী? আজ আমরা ইসলামের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিধানাবলী কিভাবে প্রয়োগ করব? এ ব্যাপারে আমরা আজও পর্যন্ত সুচিন্তিত এমন কোনও রূপরেখা তৈরি করিনি, যে সম্পর্কে আমরা বলতে পারব এই পন্থাটি অত্যন্ত পাকাপোক্ত ও বাস্তবসম্মত। এ ব্যাপারে সারাবিশ্বে চেষ্টা অবশ্যই করা হচ্ছে, আমাদের দেশেও এ ব্যাপারে মানুষ কাজ করছে, কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাকেই চূড়ান্ত বলা যাবে না। আর যেহেতু এরকম কোনও রূপরেখা আমাদের সামনে নেই, তাই এর ফল দাঁড়াবে অপরিহার্য ব্যর্থতা। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন যখন তার শেষধাপে উপনীত হবে, তখন সে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। মনে করুন, আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রক্ষমতাও হাতে এসে গেল। তখন রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইসলামের বিধানাবলী প্রয়োগ করার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্থান-কালের বদলের ফলে সেই প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা দেখা দেবে।

নতুন ব্যাখ্যা ও তার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী

এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টিভঙ্গী হল এই, যেহেতু আমাদেরকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই যুগে আর এই যুগটি আগের মত নয়, আগের থেকে অনেক কিছুই বদলে গেছে, তাই এ যুগে ইসলামকে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে এর নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোনও কোনও মহলের পক্ষ থেকে সেই নতুন ব্যাখ্যার কাজটি করাও হচ্ছে আর তা করা হচ্ছে এভাবে যে, এ কালে যা-কিছু ঘটছে ও যা-কিছু হচ্ছে তার সবকিছুতেই বৈধতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেমন সুদী লেনদেনকে হালাল সাব্যস্ত করা, জুয়াকে বৈধ ঘোষণা করা, মদপানকে হালাল বলা, পর্দাহীনতাকে শরী'আতসম্মত বলা ইত্যাদি। অর্থাৎ এসব হারাম ও অবৈধ বিষয়কে হালাল ও বৈধ সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন ও হাদীছের নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই নতুন ব্যাখ্যার কাজটি কোনও কোনও মহল করছে। এটা একটা মারাত্মক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় আজকাল যা-কিছু হচ্ছে তার সবই ঠিক আছে। এ অবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার অর্থ দাঁড়ায় কেবল শাসনক্ষমতা লাভ করা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানের হাতে থাকবে, এর বাইরে আর কোনও কাজ নেই। পাশ্চাত্যের তরফ থেকে যা-কিছু আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা যথাবৎ বাকি থাকবে এবং চালু থাকবে, তাতে কোনও রকমের পরিবর্তন দরকার নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিক মানা হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সবরকম চেষ্টাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সুতরাং বর্তমানকালে ইসলামের প্রয়োগিক পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অর্থ এই নয় যে, ইসলামের উপরে ছুরি চালানো হবে এবং তাকে কাটাছেঁড়া করে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়া হবে; বরং ইসলাম প্রয়োগের পন্থা নির্ণয়ের অর্থ হল, ইসলামের সমস্ত মূলনীতি ও সকল বিধি-বিধান আপনরূপে বহাল রেখে এবং কোনও রকম রদবদল না করে কেবল এই বিষয়টা স্থির করা হবে যে, বর্তমানকালে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাস্তবসম্মত কী পন্থা অবলম্বন করা হবে। উদাহরণত, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ফিকহী-গ্রন্থাবলীতে ইসলামের বিধান ও মূলনীতি পূর্ণাঙ্গরূপে লেখা আছে, কিন্তু আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে নতুন-নতুন পন্থা জন্ম নিয়েছে, সে সম্পর্কে ওইসব কিতাবে সুস্পষ্ট কোনও জবাব নেই। এর জবাব কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামী ফিকহের মূলনীতির আলোকে অনুসন্ধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাজ এখনও পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এ কাজ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারব না। এমনিভাবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান ও মূলনীতি রয়েছে, কিন্তু আমাদের এ যুগে যখন ইসলামী বিধান কার্যকর করা হবে, তখন তার বাস্তব রূপ কী হবে সে সম্পর্কে আমাদের কাজ এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সে অপূর্ণতার কারণেও অনেক সময় আমরা ব্যর্থতার স্বীকার হই।

সারকথা, আমার দৃষ্টিতে আমাদের ব্যর্থতার কারণ ওই দু'টিই, যে সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হল। দু'টিরই সম্পর্ক মূলত চিন্তা-চেতনার সাথে। প্রথম কারণ ছিল ব্যক্তির সংশোধন ও ব্যক্তিগঠন সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা এবং ইসলাহ ব্যতিরেকেই সমাজ ও সামষ্টিক বিষয়াবলীতে ঢুকে পড়া। আর দ্বিতীয় কারণ, ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ গবেষণা ও অনুসন্ধানের অভাব। আমরা যদি এ দু'টি কারণ যথাযথভাবে বুঝতে পারি এবং আমাদের অন্তরে এর সমাধান করার চিন্তা-ফিকির জন্ম নেয়, অতঃপর যথোচিতভাবে আমরা তা সমাধান করতে সক্ষম হই, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের সকল চেষ্টা-মেহনত ও আন্দোলন-সংগ্রাম সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদেরকে সেই দিন প্রত্যক্ষ করান, যখন নবজাগরণের আন্দোলনসমূহ যথাযথরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবে– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ৬ খণ্ড, ২৫১-২৭২পৃ.

মন্দ সরকারের আলামত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ اِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَ السُّفَهَآءِ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ : فَاَخْبَرَنِيْ اِبْنُ حَسَنَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّهٗ قَالَ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ: مَا اٰيَةُ ذَالِكَ؟ قَالَ: اَنْ تُقْطَعَ الْاَرْحَامَ وَيُطَاعَ الْمُغْوِي وَيُعْصَى الْمُرْشِدَ

'সা'ঈদ ইবন সাম'আন বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-কে শিশু ও নির্বোধদের শাসন থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি। অতঃপর সা'ঈদ ইবন সাম'আন বলেন, ইবনু হাসানাহ আল-জুহানী (রহ.) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার আলামত কী? তিনি বলেন, তার আলামত এই যে, তখন আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীদের আনুগত্য করা হবে এবং সুপথ প্রদর্শকের অবাধ্যতা করা হবে।'[৯৮]

মন্দ সময়ের তিনটি আলামত

হযরত সা'ঈদ ইবন সাম'আন একজন তাবি'ঈ। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট থেকে সরাসরি শুনে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) শিশু ও নির্বোধদের শাসন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছিলেন। এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করে দেন যে, সেই সময়টা অতি মন্দ

---

৯৮. আল-আদাবুল-মুফরাদ ১খণ্ড, ৩৭পৃ., হাদীছ নং ৬৬

হবে। কেননা অল্প বয়সের লোকের কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না আর নির্বোধ লোকের তো এমনিই কোনও যোগ্যতা থাকে না। তো সেই অল্প বয়স্ক ও নির্বোধ লোকেরা যদি দেশ শাসন করে, তবে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য। এ জন্যই তিনি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছিলেন যে, হে আল্লাহ! ওই রকম মন্দ সময়ের সম্মুখীন হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমার জীবনে যেন এমন সময় না আসে, যখন আমাকে এ জাতীয় শাসকদের মুখোমুখি হতে হবে। হযরত সা'ঈদ ইবন সাম'আন বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) যখন আল্লাহর কাছে এ পানাহ চাচ্ছিলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল এরূপ মন্দ সময়ের আলামত কী? অর্থাৎ কিভাবে বোঝা যাবে এটা নির্বোধ লোকদের শাসনকাল? উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) তিনটি আলামত বলে দিলেন–

اَنْ تُقْطَعَ الْاَرْحَامَ وَيُطَاعَ الْمُغْوِىْ وَيُعْصَى الْمُرْشِدَ

অর্থাৎ তার প্রথম আলামত হল, তখন মানুষ আত্মীয়-স্বজনের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তাদের প্রাপ্য আদায় করবে না এবং তাদের অধিকার পদদলিত করবে। দ্বিতীয় আলামত হল, যারা মানুষকে বিপথগামী করে, সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে, মানুষ তাদের আনুগত্য করবে,তাদের অনুগামী হবে ও তাদের পিছনে পিছনে চলবে। তৃতীয় আলামত হল, যারা সুপথ দেখায়, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে ডাকে, তাদের কথায় কর্ণপাত করা হবে না; বরং তাদের অবাধ্যতা করা হবে। যখন এই তিনটি আলামত কোনও কালে পাওয়া যাবে, তখন বুঝে নিবে এটা নির্বোধ ও ছোকড়াদের শাসনকাল।

কিয়ামতের একটি আলামত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের যেসকল আলামত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি আলামত হল–

اَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ

'যাদের পায়ে জুতা নেই, শরীরে কাপড় নেই, হতদরিদ্র ও বকরির রাখাল, তারা উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণে একে অন্যের সংগে অহংকারে লিপ্ত হবে।'[৯৯]

৯৯. মুসলিম, হাদীছ নং ৯; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৩৫; নাসাঈ, হাদীছ নং ৪৯০৪; আবূ ...ীছ নং ৪০৭৫; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২

অর্থাৎ যেসব লোকের অতীত ভালো নয়, আখলাক-চরিত্রও ভদ্রোচিত নয়, অতি মামুলি কিছিমের লোক, যাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলা হয়নি এবং যারা দ্বীনের ভালো অনুসারীও নয়– এ জাতীয় লোক শাসক হয়ে বসবে আর উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণে একে অন্যের উপরে বড়ত্ব দেখাবে।

যেমন আমল তেমন শাসক

যাহোক হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর এ বক্তব্য দ্বারা জানা গেল যাদের ভেতরে শাসনকার্যের যোগ্যতা নেই, তাদের শাসনাধীন হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া উচিত। কেউ যদি এ জাতীয় শাসকদের অধীন এসে যায়, যেমন আমরা বর্তমানে বিপদে আছি, সে ক্ষেত্রে করণীয় কী? এ ব্যাপারে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ রয়েছে–

"মনে রেখ, যখন মুসলিমদের উপরে নিকৃষ্ট শাসক চেপে বসে, তখন বুঝে নেবে এটা তোমাদেরই কর্মফল। তোমাদের আমলেরই পরিণাম।"

যেমন এক রেওয়ায়েতে আছে–

كَمَا تَكُوْنُ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ

'অর্থাৎ তোমরা যেমন হবে, তেমন শাসক তোমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে।'[১০০]

অপর এক বর্ণনায় আছে–

اِنَّمَا اَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ

'নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মই তোমাদের শাসকরূপে আবির্ভূত হয়।'[১০১]

সুতরাং তোমাদের আমল যদি ভালো হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালো শাসক দান করবেন আর তোমাদের আমল খারাপ হলে তোমাদের উপরে মন্দ শাসক চাপিয়ে দেবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীছে এ বিষয়টা ব্যক্ত করেছেন।

তখন আমাদের করণীয় কী

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই তালীমও দিয়েছেন যে, যখন তোমাদের উপরে মন্দ শাসক চেপে বসবে

---

১০০. কানযুল-উম্মাল ৬খণ্ড, ৮৯পৃ., হাদীছ নং ১৪৯৭২; জামি'উল-আহাদীছ ১৫খণ্ড, ৪০৩পৃ., হাদীছ নং ৫৮১২; কাশফুল-খাফা ২খণ্ড, ১২৬পৃ.

১০১. কাশফুল-খাফা ১খণ্ড, ১৪৬পৃ.

তখন তাদেরকে গালমন্দ করবে না, তাদের নিন্দা-সমালোচনা করবে না; বরং তখন আল্লাহর দিকে রুজূ' করবে, বলবে হে আল্লাহ! এই যে শাসক আমাদের উপর চেপে বসেছে, এটা আমাদের বদ আমলেরই পরিণাম। হে আল্লাহ আপনি নিজ দয়ায় আমাদের বদ আমলসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের সংশোধন করে দিন এবং আমাদেরকে নেক আমলের তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে নেক ও পরহেযগার শাসক দান করুন।

অশুভ শাসকদের কবলে পড়ার ক্ষেত্রে এটাই আমাদের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা। তিনি গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন, কারণ গালমন্দ করার তো কোনও ফায়দা নেই, তাতে পরিস্থিতি বদলায় না; বরং তখন কর্তব্য আল্লাহর দিকে রুজূ' হওয়া এবং নিজ আমলের ইসলাহ করা।

আমাদের কর্মপন্থা

এবার আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেই সকাল-সন্ধ্যায় একই গীত গাচ্ছে– আমাদের উপরে অশুভ শাসক চেপে বসেছে, আমরা অযোগ্য শাসকদের কবলে পড়েছি। যখনই কোথাও দু'-চারজন লোক বসে কথাবার্তা বলি, সামনে রাজনীতি এসে যায়। শাসকদের নিয়ে লেগে পড়ি। তাদের গালি দেই, লা'নত করি। সাধারণভাবে সকলেরই এই অবস্থা। ব্যতিক্রম বড় কম। কিন্তু আমরা নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করে কখনও দেখেছি? কখনও কি সাচ্চা দিলে আল্লাহর দিকে রুজূ' হয়ে বলেছি– 'হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই মসিবত চেপে বসেছে, আমরা এই বিপদে আক্রান্ত হয়েছি। হে আল্লাহ! এটা আমাদের বদ আমলেরই পরিণাম, আমাদের পাপের ফল। হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিন, আমাদেরকে নেক আমলের তাওফীক দিন এবং এই শাসকদের স্থলে আমাদেরকে নেক্‌কার শাসক দান করুন'? বলুন তো আমাদের মধ্যে কতজন এই দু'আ করে? অথচ নিন্দা-সমালোচনা সর্বক্ষণই করছে। যখনই কোনও আড্ডা হয়, এই একই গীত। সরকারের নিন্দা ও গালমন্দ ছাড়া আমাদের কোনও মজলিসই জমে না। আমরা আল্লাহর দিকে রুজূ' হওয়ার কথা ভাবিই না।

দেখুন আমরা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। নামাযের পর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ তো করিই, কিন্তু কখনও কি এই দু'আ করেছি যে,

'হে আল্লাহ! আমরা আমাদের কর্মের অশুভ পরিণাম ভোগ করছি, আমাদের থেকে এ বিপদ তুলে নিন'? আমরা যে নামাযের পরে এই দু'আ করছি না এর অর্থ এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যেই পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন আমরা তা পাশ কাটিয়ে চলছি, তার উপর আমাদের আমল নেই।

সুতরাং গালাগালি ও নিন্দা-সমালোচনা বাদ দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাঁর দিকে রুজূ' হোন আর নিজেদের অবস্থার সংশোধনের ফিকির করুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন।

আল্লাহর দিকে রুজূ' হোন

অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

"রাজা-বাদশা ও শাসকদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মুঠোর মধ্যে। তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ' হও এবং তাকে খুশি করতে পার, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর পরিবর্তন করে দেবেন এবং তাদের অন্তরে সদিচ্ছা জাগ্রত করবেন। যদি তাদের তাকদিরে ভাল হওয়া ও নেক বনে যাওয়া না থাকে, তবে তাদের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা ভাল শাসক দান করবেন।"[১০২]

সুতরাং নিন্দা-সমালোচনা ও গালমন্দ বন্ধ করুন, কেননা তা দিয়ে কিছু হয় না; বরং ভাল কিছু চাইলে আল্লাহর দিকে রুজূ' হোন। এটাই আসল কাজ। আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করতে পারলে অবস্থা আপনিই বদলে যাবে। আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দা কমই আছে, যারা এরকম অবস্থায় হৃদয়ে বেদনা বোধ করে এবং সেই বেদনার তাগিদে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং কাতর কণ্ঠে দু'আ করে– হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই মসিবত থেকে নাজাত দিন। আমরা যদি এরূপ করতে পারি এবং আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়ে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিই, তবে দয়াময় আল্লাহ পরিস্থিতি অবশ্যই বদলে দেবেন।

যাহোক এ হাদীছে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) এরূপ পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ করণীয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হওয়া এবং নিজেদের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা।

---

১০২. মাজমা'উয-যাওয়াইদ ৫খণ্ড, ৩০১পৃ.

মন্দ শাসকের প্রথম ও দ্বিতীয় আলামত

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) অশুভ শাসকবর্গের শাসনের যে আলামত বলেছেন তার মধ্যে একটা হল আত্মীয়তা ছিন্ন করা। তখন ব্যাপকভাবে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে। অর্থাৎ আত্মীয়দের হক আদায় করা হবে না। তাদের অধিকার পদদলিত করা হবে। দ্বিতীয় আলামত বলেছেন, যারা মানুষকে বিপথগামী করে তাদের আনুগত্য করা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যতবড় গোমরাহ হবে, তার অনুসারী সংখ্যা ততবেশি হবে। বর্তমানকালে আমরা তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। এই আলামত বর্তমানে ষোল আনাই সঠিক পাওয়া যাচ্ছে। আজ যারা অন্যদেরকে গোমরাহ করে, কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে যাদের কোনও জ্ঞান নেই, যারা নেহায়েত মুর্খ কিংবা কিছু জানা থাকলেও তার উপর আমল নেই, চরম ধোঁকাবাজ, অন্যদেরকে ধোঁকা দেয় ও বিপথগামী করে বেড়ায়, এরূপ লোক আমসাধারণকে কিছু ভেলকিবাজি দেখিয়ে দেয়, চোখে চমক লাগে এমনকিছু করে দেখায় আর অমনি তারা তাদের পিছনে ছুটতে শুরু করে, তাদের ভক্ত ও আসক্ত বনে যায়। সেই ভক্তিকে পুঁজি করে তারা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যায়। সাধারণ লোক তো মনে করে তাদেরকে সঠিক পথেই চালাচ্ছে, জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা হল তারা তাদেরকে গোমরাহির পথে চালায় ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের চোখে যখন পর্দা পড়ে যায়, দৃষ্টিশক্তিতে পট্টি লেগে যায়, তখন তারা গোমরাহ লোকদের গোমরাহী দেখতে পায় না। তা তো পায়ই না, উল্টো বড়-বড় পথভ্রষ্টকে নিজেদের নেতা ও আদর্শ বানিয়ে নেয়। একটুও লক্ষ করে দেখে না কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের আমল ও আখলাক কেমন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন– আমীন।

আগাখানের অট্টালিকা

একবার আমার সুইজারল্যান্ড যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চলতিপথে এক ব্যক্তি আলিশান এক অট্টালিকার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এটা আগাখানের মহল। মহল কী, বরং ঝিলের পাড়ে অবস্থিত এই দুনিয়ার জান্নাত মনে হচ্ছিল। ওইসব দেশে মানুষের ঘরবাড়ি সাধারণত ছোট ছোট হয়ে থাকে। বড় বড় বাড়ির ধারণা ওখানে নেই। সেই পরিবেশের ভেতর আগাখানের এই বিশাল বাড়িকে জান্নাতই তো বলতে হয়। দু'-তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। তার ভেতর বাগান, নহর, আলিশান স্থাপনা কী নেই! চাকর-নফরের

বিশাল বাহিনী! আরাম-আয়েশের সবরকম উপকরণ। আনন্দ-ফূর্তিতে সদা গুলজার। এ কথা তো প্রসিদ্ধ যে, অশ্লীলতা ও ভোগ-বিলাসের যে-কোনও কাজ সেখানে জায়েয।

আগাখানীদের কাছে একটি প্রশ্ন

তখন আমার মুখে এ কথাটি এসে গেল। আমি আমার মেজবানদের লক্ষ করে তা বললামও যে, লোকে নিজ চোখে দেখছে তাদের ধর্মগুরু ও ধর্মনেতার মসনদে যারা আসীন হয়ে আছে, তারা কিরূপ বিলাসিতার ভেতরে ডুবে আছে এবং একজন মামুলী পর্যায়ের মুসলিমও যে কাজকে হারাম ও অবৈধ মনে করে সেইসব কাজের ভেতরে তারা হরদম মেতে আছে, তারপরও তারা তাদেরকে নিজেদের ধর্মনেতা মানতে স্বস্তিবোধ করছে? আমার এ কথা শুনে মেজবানদের পক্ষ থেকে একজন বলল, বড়ই কাকতালীয় ব্যাপার! তাদের সম্পর্কে যে কথা আপনি এইমাত্র বললেন, হুবহু এ কথাই আমি একদিন আগাখানের জনৈক ভক্তের সামনে বলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমরা যদি কোনও নেক্কার ও পরহেযগার ব্যক্তিকে ধর্মনেতা বানাতে, তবে সেটা তো একটা বুঝে আসার মত কথা ছিল, কিন্তু তোমরা এমনই এক ব্যক্তিকে ধর্মনেতা বানিয়ে নিয়েছ, যার অবস্থা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছ। কি রকম ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছে। কি আলিসান তার অট্টালিকা। এসব দেখা সত্ত্বেও তোমরা তাকে সোনার পাল্লায় মাপছ এবং নিজেদের ধর্মনেতা মানছ!

ভক্তের জবাব

আগাখানের সেই ভক্ত জবাবে বলেছিল–

"প্রকৃত ব্যাপার আপনারা বুঝতে পারেননি। এটা তো আমাদের ইমামের অনেক বড় কুরবানী যে, তিনি দুনিয়ার এসব মহল-বাড়িতে খুশি আছেন। নয়ত তিনি যে স্তরের মানুষ সেই হিসেবে তার আসল ঠিকানা তো ছিল জান্নাত! সেই জান্নাতের বাড়ি ও জান্নাতের নি'আমত কুরবানী দিয়ে কেবল আমাদের হিদায়াতের লক্ষে তিনি এই দুনিয়ায় এসেছেন। এই যে ভোগ-বিলাসসামগ্রী দেখছেন তার মর্যাদা হিসেবে এসব নিতান্তই তুচ্ছ। তিনি এরচে' অনেক অনেক বেশি বিলাসিতা ও ভোগসামগ্রীর উপযুক্ত ছিলেন।"

বস্তুত এটাই সেই বিষয়, যার দিকে উপরিউক্ত হাদীছে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَيُطَاعُ الْمُغْوِي

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে বিপথগামী করবে, তার আনুগত্য করা হবে।

আজ খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে, একটা লোক গোমরাহীর পথে দাঁড়ানো, পাপ-পঙ্কিলতার সবরকম কাজে রত, তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে– এই ব্যক্তি আমাদের ইমাম, আমাদের ধর্মনেতা।

পথভ্রষ্টকারীদের আনুগত্য করা হচ্ছে

এটা কেবল আগাখানেরই ব্যাপার নয়। আজকাল বিভিন্ন দিকে জাহেল পীরদের রাজত্ব চলছে। তাদের খানকাহ ও দরবারে গেলে আপনি হয়রান হয়ে যাবেন। কি আলিসান একেকজনের গদি ও মসনদ! সেখানে সবরকম ফূর্তি চলে। নানা রকম নেশাকর দ্রব্য পরিবেশন করা হয়। ভক্ত-অনুরক্তরা তার মৌজে মেতে থাকে। সবরকমের নিকৃষ্ট ও ন্যক্কারজনক কাজ করা হয়। তা সত্ত্বেও তাদেরকে পীর মানা হয় এবং বলে বেড়ানো হয়, তারা পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি। এ কথাই হাদীছে বলা হয়েছে যে, পথভ্রষ্টকারীদের আনুগত্য করা হবে। যারা মানুষকে ভ্রান্তপথে চালাবে, তাদের পিছনে ভক্ত-অনুরক্তের দল জুটে যাবে।

কেন মানুষ অন্ধের মত তাদের পিছনে ছোটে? ছোটে নানা রকম ভেলকিবাজি দেখে। কারও উপর মনঃশক্তি আরোপ করে, ফলে তার হৃদপিণ্ডে নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। কারও উপরে অন্য কোনও চাল চালে, ফলে সে আজব-আজব স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কাউকে মসজিদে হারামের ছবি দেখিয়ে দেয়, কেউ বা অনুভব করে সে কাবাগৃহে নামায পড়ছে। এসবের পরিণামে মানুষ মনে করে এরা আল্লাহর খাস প্রতিনিধি। আসমান থেকে যমীনে নেমে এসেছে। কাজেই তারা যা-কিছুই বলবে তা মেনে নেওয়া উচিত, তা হালালকে হারাম বলুক বা হারামকে হালাল, শরী'আত মোতাবেক হুকুম দিক বা শরী'আতের বিরোধী। সর্বাবস্থায় তাদের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে আর তাতেই হবে মোক্ষলাভ।

মন্দ শাসনের তৃতীয় আলামত

তৃতীয় আলামত হল সঠিক পথপ্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যে নেক বান্দা নিজেকে সুন্নতের অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে সচেষ্ট থাকে এবং সহীহ-শুদ্ধ 'ইলমেরও অধিকারী– কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে ভালো দখল রাখে, কেউ

নিজেকে সংশোধন কারার জন্য সহজে তার কাছে যাবে না। কারণ তার কাছে গেলে তিনি তাকে কঠিন কঠিন কাজের হুকুম করবেন। ফরয আমলে যত্নবান হওয়ার তাগিদ দেবেন। বলবেন– নামায পড়, অমুক কাজ কর, অমুক কাজ পরিহার কর, গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, চোখের হেফাজত কর, মুখের হেফাজত কর এবং সবরকমের গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা কর। এরকম কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক নির্দেশনা তাকে দান করবেন। বলাবাহুল্য এসব করতে কিছু না কিছু কষ্ট তো হয়ই, সেই কষ্টের কারণে তার কাছে ইসলাহ করানোর জন্য সহজে কেউ যাবে না আর গেলেও তার কথা মানবে না।

যাহোক হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) যে কথা বলেছিলেন, আজকাল তা পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন–

"যে ব্যক্তি মানুষকে বিপথগামী করবে তার পূর্ণ আনুগত্য করা হবে আর যে ব্যক্তি মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে তার অবাধ্যতা করা হবে।"

বর্তমানকালে তাই করা হচ্ছে। কেউ যদি বলে, অমুক কাজ নাজায়েয ও হারাম, তা থেকে বেঁচে থাক, উত্তরে বলা হয়, আপনি কোত্থেকে হারাম ফতোয়াদাতা এসে গেলেন? এটা হারাম কেন? কী কারণে এটা অবৈধ হয়ে গেল? আপনার কাছে এর দলীল কী? ওইটাকে জায়েয আর এইটাকে নাজায়েয বলছেন, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? এসব যতক্ষণ পর্যন্ত খোলাসা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কথা মানা হবে না। তারপর আবার কত রকমের নিন্দা-সমালোচনা– এই মোল্লারা আমাদের দ্বীনটাকে কঠিন বানিয়ে ফেলেছে, তাদের কারণে জীবনযাপন মুশকিল হয়ে গেছে, তাদের কথায় চললে সমাজ বাদ দিয়ে দিতে হবে, জঙ্গলে চলে যেতে হবে।

বস্তুত এসবই একেক রকম ফিতনা। যারা বিপথগামী করে তাদের পিছনে চলার ফিতনা আজ সর্বব্যাপী। যারা সুপথ দেখায়, তাদের অনুসরণ না করার ফিতনাও অতি ব্যাপক। সবরকমের ফিতনাই আমাদের একালে বর্তমান।

ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল– সুন্নতের মানদণ্ডে পরিমাপ করে চলা। আপনি যার কাছে যাচ্ছেন, আপনি যাকে নিজের নেতা ও ইমাম বানাচ্ছেন কিংবা যার অনুসরণ করবেন বলে মনস্থ করেছেন, তিনি নিজে সুন্নতের অনুসরণ করেন কতটুকু, তা দেখেই সামনে অগ্রসর হোন। তিনি কতটা ভেলকি দেখাতে পারেন, কতটা অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড তার দ্বারা প্রকাশ

পায়, এসব দেখতে যাবেন না। কারণ দ্বীনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। দ্বীন কোনও ভোজবাজির বিষয় নয়।

এক পীর সাহেবের লেখা একটা প্রচারপত্র দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল-

"যে পীর নিজ মুরীদদেরকে এখানে থেকে মসজিদে হারামে নামায পড়াতে না পারে, সে পীর হওয়ার উপযুক্ত নয়।"

যেন ভোজবাজি দেখানোই পীর হওয়ার দলীল। কেউ যখন তার কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য যাবে সে তখন তার উপর এমন ক্ষমতা আরোপ করবে, যদ্দরুন করাচিতে বসে বসে মসজিদে হারাম দেখতে পাবে আর সেই মসজিদে হারামের ভেতরে সে নামাযও পড়বে। এই ক্ষমতা যার মধ্যে আছে কেবল সেই পীর হতে পারবে আর এই তেলেসমাতি যে দেখাতে পারবে না, সে পীরও হতে পারবে না। কিন্তু তাকে কে এই কথা জিজ্ঞেস করবে যে, পীর হওয়ার জন্য এই যে শর্তের কথা আপনি বললেন এটা কি কুরআন ও হাদীছে আছে? কোথাও কি এর প্রমাণ আছে? বলা বাহুল্য এর প্রমাণ কোথাও নেই। সবই তার মনগড়া কথা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকার্‌রামা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যান। মদীনা মুনাওয়ারায় থাকা অবস্থায় সবসময়ই বায়তুল্লাহ শরীফের কথা স্মরণ হত। সেই স্মরণে তিনি তড়পাতেন। হযরত বিলাল (রাযি.) একবার প্রচণ্ডভাবে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন মক্কা মুকার্‌রামা ও মসজিদে হারামের কথা স্মরণ করে করে কাঁদছিলেন আর দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! সেই দিন কবে আসবে, যখন মক্কা মুকার্‌রামার পাহারগুলো নিজ চোখে দেখতে পাব?[১০৩]

মক্কা মুকার্‌রামা ও বায়তুল্লাহ শরীফের জন্য প্রাণ উতলা কার না হত? কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকেই কখনও বলেননি, এসো, আমি তোমাদেরকে মসজিদে হারামে নামায পড়িয়ে দেই। কিন্তু আজকালকার পীর বলছে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফে নামায পড়িয়ে না দিতে পারবে, সে পীর হওয়ার উপযুক্ত নয়। লোকে বাহ্যিক ভোজবাজি দেখে অভ্যস্ত। যে যত ভড়ং দেখাতে পারে, মানুষ তার ততবেশি ভক্ত বনে যায়। যখনই কাউকে দেখে অস্বাভাবিক কোনও কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছে, অমনি তার পিছনে ছুটতে শুরু করে। অথচ 'ইবাদত-বন্দেগী ও

---

১০৩. বুখারী, হাদীছ নং ১৭৫৬; আহমাদ, হাদীছ নং ২৩১৫৩

তাকওয়া-পরহেযগারীর সাথে এসব ভোজবাজির কোনও সম্পর্ক নেই। এর জন্য তো মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়, অমুসলিমরাও এসব বেশ করে দেখাতে পারে। অথচ মানুষ আজকাল এটাকেই পীর হওয়ার মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। বুযুর্গী বললে মানুষ আজকাল এসবকেই বোঝে। লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বাহাত্তর দলের মধ্যে সঠিক দল কোন্‌টি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে আমাদের জন্য একটা মানদণ্ড বলে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

"আমার উম্মতের মধ্যে সত্তরটিরও বেশি দল হবে। একেক দল একেক পথে ডাকবে। একদল বলবে এটা সত্য, আরেক দল বলবে ওটা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সবগুলো দলই জাহান্নামের দিকে ডাকবে। সবগুলোই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। কেবল একটা পথই হবে মুক্তির পথ। তা সেই পথ, যে পথে আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি। সুতরাং সেই পথকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে।"[১০৪]

সুতরাং যখন কাউকে নিজের নেতা বানাবে এবং তার অনুসরণ করার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে দেখে নেবে সে সুন্নতের অনুসারী কি না? তার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল কতটুকু?বস্তুত সুন্নতের অনুসরণই সত্যপন্থী হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে কে কতটুকু উতরোয়, আগে সেটাই লক্ষণীয়। যে ব্যক্তি এতে টিকে যাবে, ব্যস তারই অনুসরণ করবে আর যে টিকবে না, সে অনুসরণীয়ও হবে না। কাজেই কিছুতেই তাকে শায়খ ও পীর বানানো যাবে না। সর্বাবস্থায় তাকে এড়িয়েই চলতে হবে, তাতে সে যতই ভোজবাজি দেখাক না কেন এবং তোমার উপরে সে যতই তার অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করুক না কেন। তুমি যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও, তবে তার অনুগমন থেকেও অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন এবং গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখুন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১০খণ্ড, ২৬৫-২৭৬পৃ.
বায়তুল মুকাররাম জামে' মসজিদ, করাচী

---

১০৪. তিরমিযী,হাদীছ নং ২৫৬৫

মুসলমানদের উপর আক্রমণকালে আমাদের করণীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

বর্তমান পরিস্থিতি আপনাদের সকলেরই জানা। অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনা করার মানসিকতা এখন নেই। কুফ্‌রী জগতের পক্ষ থেকে বিশেষত আমেরিকার পক্ষ থেকে চরম পর্যায়ের অহমিকা প্রদর্শন করা হচ্ছে। যেন নিজের সম্পর্কে তার ধারণা, সে এখন জগতের ঈশ্বর হয়ে গেছে। এমনসব দর্পিত কথাবার্তা সে বলছে এবং এমন ধৃষ্টতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা তার এই মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে যে, সে এখন বিশ্বের একচ্ছত্র প্রভু। বিশ্বের প্রভুত্ব যেন তার মুঠোর ভেতর।

হাতি ও পিঁপড়ার লড়াই

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরত বড় আজব। তিনি মাঝেমধ্যে তাঁর কুদরতের অপূর্ব সব কারিশমা দেখান। এই দেশটি আজ চরম অহমিকার ভেতর নিমজ্জিত। সারাবিশ্বের মানুষ তার সামনে এমনই ভীত-স্বন্ত্রস্ত যে, সত্যকথা বলার মত হিম্মত কেউ দেখাতে পারছে না। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান রাষ্ট্র সেটি। জগতের একমাত্র পরাশক্তি। তার কিনা আজ যুদ্ধ চলছে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দুর্বল রাষ্ট্রের সাথে! এমন একটা রাষ্ট্রের উপরেই সে আজ আক্রমণ চালিয়েছে, যারচে' সহায়-সম্বলহীন এবং যারচে' বেশি দুর্বল রাষ্ট্র বুঝি আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। তার অবস্থা তো এমনই খারাপ যে, বিশ্ব আজ তাকে একটি রাষ্ট্র ও সরকার বলে স্বীকার করতেই প্রস্তুত নয়। যেন

উভয়ের মধ্যে তুলনা হাতি ও পিঁপড়ার লড়াইয়ের মত। আজ সেই অসম লড়াই বাস্তবে চলছে এবং বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করছে।

কুদরতের কারিশমা

বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার ও প্রভুত্বের দাবিদার রাষ্ট্রটির পক্ষ থেকে সপ্তাকাল যাবত ওই দুর্বল রাষ্ট্রটির উপর বোমাবর্ষণ ও মিজাইলের হামলা চলছে। এ দুর্বল রাষ্ট্রটির উপর দিবা-রাত্র সমানে বোমা ও মিজাইলের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। আজ তার সর্বশক্তি ব্যয় হচ্ছে এ ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার কাজে। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কারিশমা দেখুন। দর্পিত ওই রাষ্ট্রটির ধারণা ছিল এক-দু' দিনের আক্রমণেই সবকিছু চুকেবুকে যাবে, অথচ সপ্তাকালের টানা বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে এমন বড় কোনও ক্ষতি সাধিত হয়নি, যা দেশটির জন্য ধ্বংসাত্মক সাব্যস্ত হবে। তারা বার বার ঘোষণা করছে যে, তারা এখানে স্থলবাহিনী নামিয়ে সম্মুখ লড়াই শুরু করে দেবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের সেই হিম্মত হয়নি। ব্যস কাপুরুষের মত দূর আকাশ থেকে শক্তিশালী বোমার বৃষ্টি বর্ষণ করেই যাচ্ছে।

আমার ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কাছে দু'দিন আগে কাবুল থেকে এক ব্যক্তির ফোন এসেছে। ভাই সাহেব তাকে বলেছিলেন, আপনি এখনও কাবুলেই অবস্থান করছেন, অথচ দিবা-রাত্র সমানে ওখানে বোমাবর্ষণ হচ্ছে, বৃষ্টির মত মিজাইলের আক্রমণ চালানো হচ্ছে? তা পরিস্থিতি কী বলুন তো। উত্তরে তিনি জানান, হাঁ কিছু পটকা তো অবশ্যই ফাটছে এবং তাতে কিছু লোক আহত এবং কেউ কেউ শহীদও হচ্ছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমাদের শক্তি এখনও অটুট আছে।

প্রভুত্ব আল্লাহ তা'আলারই

এসব ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন– অহংকার-অহমিকায় যে রাষ্ট্রটির ঘাড় সোজা ও বুক টান হয়ে আছে, সেটি তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও লক্ষ অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। সর্বপ্রকারে আঘাত হানছে, কিন্তু সফলতা পাচ্ছে না। আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিচ্ছেন– প্রভুত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহরই। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা–

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

অর্থ : 'তোমরা যদি আল্লাহ (তা'আলার দ্বীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।'[১০৫]

সুতরাং কোথাও যদি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কম পাওয়া যায় কিংবা বিজয় অর্জিত না হয়, তবে তার অর্থ হবে এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের যথাযথ সাহায্য করোনি তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও সাহায্য আসেনি। আজও যদি মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের সাহায্যার্থে একাট্টা হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও অবশ্যই সাহায্য লাভ হবে।

জিহাদ দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ

আমরা আজ জিহাদের কথা ভুলে গেছি। অথচ জিহাদ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপরে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরয করেছেন, তেমনি জিহাদও আল্লাহ-প্রদত্ত একটি অবশ্যপালনীয় ফরয। অথচ এই ফরযটি সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত আমরা আলোচনা করছি না। আমাদের ওয়াজ ও বক্তৃতা, মজলিসের আলোচনা ও পারস্পরিক কথাবার্তায় আমরা একে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ করে ইরশাদ করেছিলেন- একটা সময় আসবে, যখন তোমাদের শত্রুগণ তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য একে অন্যকে ডাকবে, যেভাবে খাবার দস্তরখানে একে অন্যকে ডাকা হয়ে থাকে। তারা একে অন্যকে ডেকে বলবে- এসো, ওদের উপর হামলা করি; এসো, ওদের উপরে লুটতরাজ চালাই; এসো, ওদেরকে গ্রাস করি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাটি সাহাবায়ে কিরামের বুঝে আসেনি, কেননা তারা তো সচক্ষে তার মু'জিযা দেখেছিলেন। তারা এটাও দেখেছিলেন যে, মাত্র ৩১৩ জনের এক নিরস্ত্র মুসলিম বাহিনী কিভাবে সশস্ত্র ১০০০ কাফের বাহিনীর উপর জয়লাভ করেছিলেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিজ চোখে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাদের কাছে আশ্চর্যবোধ হচ্ছিল শত্রুবাহিনী কিভাবে মুসলমানদের উপরে জয়লাভ করবে।

---

১০৫. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৭

তাই সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন কি মুসলিমদের সংখ্যা কমে যাবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, মুসলিমদের সংখ্যা তখন কমবে না; বরং অনেক বেশি হবে, কিন্তু তারা হয়ে যাবে ঢলে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মত,যা সংখ্যায় তো অনেক হয়ে থাকে, কিন্তু তার কোনও শক্তি থাকে না। ঢল যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ব্যস সেদিকেই ভেসে যায়।[১০৬]

মুসলিম জাতির ব্যর্থতার দু'টি কারণ

অপর এক হাদীছে আছে, সাহাবায়ে কিরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানদের ওই অবস্থা কেন হবে? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–তা হবে এ কারণে যে, তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত-ভালোবাসা প্রবল হয়ে উঠবে, তোমরা মৃত্যুকে ভয় করতে শুরু করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে।[১০৭]

এই হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন–

এক. দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হওয়া। অর্থাৎ ধন-সম্পদের আসক্তি, সন্তান-সন্ততির ভালোবাসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সুনাম-সুখ্যাতি ইত্যাদির মোহ, দ্বীনের মহব্বত ও আখিরাতের ভালোবাসাকে ছাপিয়ে যাবে।

দুই. ওই ভালোবাসারই ফল দাঁড়াবে যে, তাদের মৃত্যুভীতি বেড়ে যাবে। সবসময় শঙ্কিত থাকবে– পাছে কোনও কারণে মৃত্যু হয়ে যায় আর এই সবকিছু হারাতে হয়।

তিন.আর এই মৃত্যুভীতির কারণে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেবে, কারণ জিহাদে মৃত্যুর সমূহ আশঙ্কা থাকে।

আর এরই পরিণামে মুসলিমদের তখন এই অবস্থা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা জিহাদ ত্যাগের গুনাহে লিপ্ত। আমরা দীর্ঘকাল যাবত আল্লাহর পথে জিহাদ করার ফরয আদায় করা হতে বিরত রয়েছি। আমরা সাধারণভাবেই জিহাদ তরকের গুনাহে লিপ্ত আর তারই পরিণামে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে, আমরা আজ যার মুখোমুখি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে তাঁর কিছু বান্দা এ কাজ করার সংকল্পে উঠে

---

১০৬. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৪৫; আহমাদ, হাদীছ নং ২১৩৬৩

১০৭. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৪৫; আহমাদ হাদীছ নং ২১৩৬৩

দাঁড়িয়েছে। তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এখন সেই সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তথা আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে শরীক হয়ে প্রতিটি মুসলমান দোজাহানের কামিয়াবী অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এতে অংশগ্রহণের পদ্ধতি কী? বিষয়টা বিস্তারিতভাবে বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।

জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাখ্যা

শরী'আতের হুকুম হল, কোনও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর যদি অমুসলিম শক্তি হামলা চালায়, তবে সেই রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। কাজেই সে দেশের আমীর যদি জিহাদের জন্য ডাক দেয়, তবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য। যদি সেই দেশের সমস্ত মানুষ মিলেও শত্রুর মোকাবেলা করার শক্তি না রাখে, তবে আশপাশের রাষ্ট্রসমূহের মুসলিমদের উপরে জিহাদ ফরয হয়ে যায়। যদি তারাও মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে সেইসব রাষ্ট্রের মুসলিমদের উপরে জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এভাবে এই ফরয সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের উপরে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

শরী'আতের উপরিউক্ত বিধানের আলোকে লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করেছে তখন আফগানবাসী এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের মুসলিমগণের করণীয় কী হবে। বলাবাহুল্য আক্রান্ত রাষ্ট্র আফগানিস্তানের নাগরিকদের উপর জিহাদ তো ফরয হয়েই গেছে, এখন দেখার বিষয় হল যে, তারা সম্মিলিতভাবে আমেরিকার আক্রমণ মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে কি না? যদি তা না রাখে তবে তার সংলগ্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানবাসীর উপরে জিহাদ ফরয হয়ে যাবে।

জিহাদের বিভিন্ন পদ্ধতি

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের অর্থ আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রচেষ্টার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল, আল্লাহর পথে সরাসরি যুদ্ধ করা ও অস্ত্র চালানো। এ পদ্ধতিকে 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। এই সাহায্য-সহযোগিতাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুদ্ধে যদি পাকিস্তানের সমস্ত মানুষ আফগানিস্তানের সীমানায় চলে যায় এবং নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে,

তবে এতে তাদের উপকার হওয়ার পরিবর্তে উল্টো সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য ওই পন্থার জিহাদ সমীচীন নয়; বরং তাদের উপর এখন জিহাদ ফরয এই অর্থে যে, তাদের যার পক্ষে যেভাবে সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতার চেষ্টা করবে। সকলের পক্ষে একই রকমের সাহায্য করা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই প্রত্যেকে খতিয়ে দেখবে তার পক্ষে তার আফগান ভাইদের কিরূপ সাহায্য করা সম্ভব। সম্ভাব্য সেই পন্থা সে খুঁজে বের করবে এবং সেই পন্থায় সে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তবে যারা যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যুদ্ধের কলা-কৌশল যাদের রপ্ত আছে তারা আফগান ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং তাদের প্রয়োজন হলে সেখানে গিয়ে সরাসরি যুদ্ধে শরীক হবে। আর যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, তারা অন্যান্য উপায়ে আফগান ভাইদের সাহায্য করবে। এ সময়ে তাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য আসবাব-উপকরণ ও অস্ত্র-সস্ত্রেরও দরকার আছে। এমনিভাবে দরকার আছে ওষুধপত্র ও চিকিৎসা-সামগ্রীর। কাজেই যে ব্যক্তি টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারে, সে তাই করবে। কেউ ডাক্তার হয়ে থাকলে সে চিকিৎসা সেবাদানের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করবে। কারও যদি প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকে, তবে সে তার এ প্রশিক্ষণকেও কাজে লাগাতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সরাসরি যুদ্ধে শরীক হতে চায়, কিন্তু পরিবার-পরিজনের দেখভালের কারণে যেতে না পারে তবে অন্য কেউ তার পরিবারবর্গের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে পারে। জিহাদে অংশগ্রহণের এটাও এক উত্তম পন্থা। হাদীছ শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

"যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীদের জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দেয় সেও মুজাহিদ, যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা করে সেও মুজাহিদ।"

যদি কোনও ব্যক্তি তাদের সাহায্যার্থে কলম ব্যবহার করে এবং কলম ব্যবহার করার যোগ্যতা তার থাকেও, তবে সেও জিহাদকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে এবং যথোচিত পন্থায় তা কাজে লাগায়, তবে সেও জিহাদের ছওয়াব লাভ করবে।

হারাম কাজ থেকে বাঁচুন

যে সমস্ত মুসলিম সরকার ভুল পথে চলছে এবং আফসোস, আমাদের সরকারও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই সকল সরকারের কাছে এই দাবি

করাও জিহাদের অংশ বলে গণ্য হবে যে, তারা যেন আফগান ভাইদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এ দাবির ক্ষেত্রে শর'ঈ বিধানের দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। দাবি-দাওয়া করতে গিয়ে যাতে শরী'আতবিরোধী কোনও কাজ না হয়ে যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। ভাঙচুর করা, আগুন লাগানো, সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি সবই হারাম কাজ। শরী'আত এগুলো অনুমোদন করে না। এ জাতীয় হারাম কাজ করে কেউ জিহাদ করছে বলে দাবি করতে পারে না। কাজেই নিজেও এসব কাজ থেকে দূরে থাকুন আর অন্যদেরকেও এসব থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করুন। কাউকে এ জাতীয় কোনও কাজ করতে দেখলে তাকে অবশ্যই তা থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, এটা হারাম কাজ এবং যে ব্যক্তি হারাম কাজ করে তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকে না। তাছাড়া এ জাতীয় কাজ দ্বারা আন্দোলনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোটকথা এ জাতীয় কাজ পরিহার করে আফগান ভাইদের অনুকূলে নিজ আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করা এবং বৈধ পন্থায় তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এখন সময়ের দাবি এবং এটাও জিহাদেরই অংশ। তাই প্রত্যেকেই চিন্তা-ভাবনা করে দেখুক সে তার ভাইদের কি রকম সাহায্য করতে পারে এবং কোন্ পন্থায় করতে পারে।

শত্রুকে নয়, আল্লাহকে ভয় করুন

আমরা এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ যা নিয়ে পেরেশান, এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : 'প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, তবে তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় কর।'[১০৮]

আহা, আজকের মুসলিম সরকারগুলো যদি কুরআন মাজীদের এই আদেশ অনুসরণ করত! আজ তারা মনে করছে প্রভুত্ব আমেরিকার হাতে এসে গেছে, ফলে প্রতিটি লোক সত্য বলতে ভয় পায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেও ভয় পায়। আজ যদি মুসলিম উম্মাহ কুরআন মাজীদের এই হুকুম মেনে চলত, তবে তাদের সব সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যেত।

---

১০৮. সূরা আলে-'ইমরান, আয়াত ১৭৫

দুনিয়ার আসবাব-উপকরণ মুসলিম উম্মাহ'র হাতে

আল্লাহ তা'আলা মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাতিকে এমন এক শেকলে গেঁথে দিয়েছেন, যদ্দরুন ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক অবিচ্ছেদ্য মালায় পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জগতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ দান করেছেন। তাদের কাছে এমন এমন সম্পদ ও এমন এমন পুঁজি আছে, যদ্দরুন সারা বিশ্ব তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত। তাদের কাছে আছে তেল-সম্পদ, যাকে তরল সোনা বলা হয়ে থাকে। এমনকি এই প্রবচন প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, যেখানেই মুসলমান সেখানেই তেল। তাছাড়া শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মানবসম্পদের দিক থেকেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বানিয়েছেন। আজ দুনিয়ার কোণে কোণে মুসলমান বসবাস করছে। সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে এমন এমন স্থান তাদের কাছে আছে, তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে সারা বিশ্বের চলাচল-পথ তারা বন্ধ করে দিতে পারে। বসফরাস প্রণালি ও সুয়েজ খালের মালিক তো তারাই। এই মুসলমানের সম্পদ দ্বারাই আজ আমেরিকা আমেরিকায় পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের টাকা দ্বারাই আমেরিকার ব্যাংকগুলো চলছে। মুসলিমগণ যদি তাদের সেই টাকা তুলে নিয়ে আসে, তবে তাদের অর্থনীতির চাকা বসে যেতে বাধ্য।

আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি না থাকার পরিণাম

এই সকল শক্তি আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে দান করেছেন। এটা এ জাতির প্রতি তাঁর কত বড়ই না মেহেরবানী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা কর্মফল ভোগ করছি। আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা না থাকার কারণে এসব শক্তি আমাদের কোনও কাজে আসেনি। আমাদের দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার দিকে নেই। ফলে এমন এমন সরকার আমাদের উপরে চেপে বসেছে, যারা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের কর্মীবাহিনী হয়ে কাজ করছে। যেন আমেরিকারই প্রতিচ্ছবি এবং তাদের দোসরগণ সারা মুসলিমবিশ্বের উপরে চেপে বসেছে। আল্লাহ তা'আলার এত নি'আমত সত্ত্বেও আমাদেরকে আজ এই দুঃখের দিন দেখতে হচ্ছে। যদি অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকত এবং আল্লাহর শত্রুকে প্রভু মনে করার ধারণা অন্তরে জায়গা না পেত, তবে আজ আমাদেরকে এই দিন দেখতে হত না।

এখনও সময় আছে

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সময় শেষ হয়ে গেছে। এখনও যদি মুসলিমগণ তাদের আপন জায়গায় ফিরে আসে, তবে নিশ্চিত করেই বলা যায় তাদের এই দুঃখের দিনের অবসান ঘটবে। এইজন্য তাদেরকে তিনটি কাজ করতে হবে।

১. এক তো তারা কেবল আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করবে, শত্রুকে নয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতিই ভরসা করবে, অন্যকিছুর উপর নয় এবং আল্লাহর দেখানো সরল-সঠিক পথের উপর চলবে। তা চলতে পারলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং অবশ্যই আসবে।

২. দ্বিতীয় কাজ হল প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখবে যে, আমি আমার আফগান ভাইদের জন্য কী করতে পারি, আমার পক্ষে তাদের কি রকম সাহায্য করা সম্ভব। অতঃপর সে অনুযায়ী তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

৩. তৃতীয় কাজ হল বেশি বেশি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়বে। এর মানে আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। এটা বেশি বেশি পড়লে আল্লাহ-নির্ভরতার প্রকাশ ঘটবে। এভাবে অন্তরে আল্লাহ-নির্ভরতার সাথে সাথে কাজের মাধ্যমেও তার প্রমাণ দিতে পারলে ইনশাআল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই এবং সে ক্ষেত্রে বলা যায় ওই উদ্ধত অহংকারীর দিন শেষ হয়ে গেল বলে। আল্লাহ তা'আলার রহমতের উপর ভরসা করে বলছি, ওই অহংকারের পতন হবেই এবং তার সব জারিজুরি ধূলিসাৎ হবেই। একদিন আল্লাহ তা'আলা ওই দর্পিত মাথা নিচু করিয়ে দেখাবেনই।

আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ' হোন

আর এ সাহায্য তো যে-কোনও মুসলিম যে-কোনও সময় করতে পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজূ' হবে এবং কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! ওই অহংকারীর অহংকারের পরিণাম আমাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তো আরেক সুপার পাওয়ারের পরিণতি এসব গুনাহগার চোখকে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তার পতন দ্বারা মুসলিমদের দিল জুড়িয়ে দিয়েছেন। তার পতনের পর এই অহংকারী (আমেরিকা) বিশ্বে প্রভুত্বের দাবিদার হয়ে বসেছে। দু'আ করতে থাকলে একদিন আল্লাহ তা'আলা তার পরিণামও মুসলিম উম্মাহকে চাক্ষুষ

দেখিয়ে দেবেন। চলতে, ফিরতে সর্বাবস্থায় দু'আ করতে থাকুন। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاثْبُتُوْا

'তোমরা শত্রুর সাক্ষাত কামনা করো না। আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা চাও, তবে যখন শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যাবে তখন অবিচলিত থেকো।'[১০৯]

কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا

অর্থ : 'এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ কর।'[১১০]

আল্লাহর পথের এক মুজাহিদের বৈশিষ্ট্য হল, সে আল্লাহর পথে জিহাদও করে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নিজ সম্পর্কও সদা দৃঢ় রাখে। তার মুখে থাকে আল্লাহর যিক্‌র। মনে মনে ও মুখে আল্লাহর কাছে দু'আয় রত থাকে। আমাদেরকেও সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিম উম্মাহ'র সাহায্য করেন, তার শত্রুকে ধ্বংস করে দেন এবং শত্রুর অহমিকা মাটিতে মিশিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকলকে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য বোঝার এবং তা পালন করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১৪ খণ্ড, ১২১-১৩৪ পৃ.
বায়তুল মুকার্‌রাম জামে' মসজিদ, করাচী

---

১০৯. বুখারী, হাদীছ নং ২৭৪৪; মুসলিম, হাদীছ নং ৩২৭৬; আবূ দাউদ,হাদীছ নং ২২৬১
১১০. সূরা জুমু'আ, আয়াত ১০

সরকার ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক

عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ قَدْ اِلْتَفَعَ بِهٖ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهٖ قَالَتْ: فَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى عَضَلَةِ عَضُدِهٖ تَرْتَجُّ سَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ "يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللهَ وَاِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيْعُوْا مَا اَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ "

'হযরত উম্মু হুসাইন আহমাসিয়্যাঃ (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণ দিতে শুনেছি। তখন তাঁর শরীরে ছিল একটি চাদর, যেটি তিনি বগলের নিচ থেকে তুলে শরীরে জড়িয়েছিলেন। তাঁর বাহুর মাংস দেখা যাচ্ছিল। সে মাংস নড়ছিল। তিনি বলছিলেন- "হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের উপর যদি এমন কোনও হাবশী গোলামকে আমীর বানিয়ে দেওয়া হয় যার হাত ও পা কাটা, তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে, যাবত সে তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কায়েম রাখে"।[১১১]

আমীরের আনুগত্য ওয়াজিব

এ হাদীছ দ্বারা জানা গেল, আমীর ও শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কুফ্‌রীতে লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুবাহ কাজেও তার হুকুম মেনে চলা ওয়াজিব। অবশ্য তার কোনও হুকুম পালন করতে গেলে যদি গুনাহে লিপ্ত হতে হয়, তখন তার আনুগত্য করা ওয়াজিব থাকে না। এমনিভাবে যদি কোনও পাপকর্মের আদেশ দেয়, তাও মানা ওয়াজিব নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন-

---

১১১. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬২৮; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৫২; আহমাদ, হাদীছ নং ১৬০৫২

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনও মাখলূকের আনুগত্য জায়েয নয়।'[১১২]

তবে আমীর যদি কোনও পাপকর্মের হুকুম না দেয়; বরং যে কাজের হুকুম দেয় তা শরী'আতসম্মত হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এর মূল ভিত্তি কুরআন মাজীদেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।'[১১৩]

এ আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাথে 'উলুল-আম্র'-এর আনুগত্য করারও হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং উলুল-আম্রের আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে আলাদাভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল উলুল-আম্র যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ছাড়া পৃথক কোনও হুকুম দেয়, তবে তাও মানা ওয়াজিব। এ কারণেই ফুকাহায়ে কিরাম বলেন- ইমাম যদি কোনও মুবাহ কাজের হুকুম দেন, তবে সেই মুবাহ কাজ ওয়াজিব হয়ে যায় এমনিভাবে ইমাম যদি কোনও মুবাহ কাজ করতে নিষেধ করেন, তবে সেই মুবাহ কাজ নাজায়েয হয়ে যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় মুবাহ বিষয়ে সরকারি আইন মেনে চলা জরুরি।

সরকারি আইন মানা শরী'আতেও জরুরি

উদাহরণত ট্রাফিক আইনের কথাই ধরুন। যেমন, গাড়ি ডানদিকে চালান, বামদিকে নয়; যখন লালবাতি জ্বলে থেমে যান, সবুজবাতি জ্বললে গাড়ি ছাড়ুন- এসব শরী'আতী আইন নয়, সরকার জারি করেছে। কিন্তু সরকারি এ আইন শরী'আতবিরোধীও নয়, ফলে শরী'আতের দৃষ্টিতেও এ আইন মানা ওয়াজিব হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এ আইন লঙ্ঘন করবে সে কেবল সরকারি আইনই লঙ্ঘন করল না, শরী'আতের দৃষ্টিতেও সে গুনাহগার হবে। এমনিভাবে সরকার জনস্বার্থে যেসব আইন-কানুন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরী'আতবিরোধী না হয় তা মেনে চলা ওয়াজিব।

---

১১২. আহমাদ, হাদীছ নং ১০৪১; ইবন আবী শায়বাঃ, ৭খণ্ড, ৭৩৭পৃ. হাদীছ নং ১২; আল-মু'জামুল-কাবীর, ১৩খণ্ড, ৫৪পৃ., হাদীছ নং ১৪৭৮২

১১৩. সূরা নিসা, আয়াত ৫৯

আজকাল আইন অমান্য করাকে বীরত্ব মনে করা হয়

বৃটিশ আমলে বৃটিশদের জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষে এ দেশের মুসলিমগণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করেছিল। এজন্য তারা বিভিন্ন রকমের আন্দোলন চালাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল 'আইন-অমান্য আন্দোলন'। অর্থাৎ বৃটিশ যে সমস্ত আইন করেছে, তার বিরূদ্ধাচরণ কর। তখন এটা করা জায়েয ছিল কিনা সেটা ভিন্ন মাসআলা। এ বিষয়ে মতভিন্নতা ছিল। 'আলেমদের মধ্যে অনেকে তখনও এটাকে নাজায়েয বলত। তাদের মত ছিল আইন অমান্য করা বিদ্যমান অবস্থায়ও জায়েয নয়। সেটা যেহেতু বৃটিশ আমল ছিল, তাই তখন এই মতভিন্নতার অবকাশ ছিল। সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাচ্ছি না। আলোচনা তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কে। এখন মানুষের মানসিকতাই হল অন্যরকম। এখন আইন অমান্য করা মানুষের কাছে কোনও দূষণীয় ব্যাপার নয়; বরং এটা একটা বীরত্ব ও বাহাদুরীর নিদর্শন হয়ে গেছে। কেউ যদি কোনও আইন অমান্য করে, তবে ভক্তির সাথে বলা হয়– অমুকে আইন মানে না, সে আইনকে বিন্দুমাত্র কেয়ার করে না। বর্তমানে এই মানসিকতাই সর্বত্র চলছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই মানসিকতা বিস্তারে আমাদের সরকারসমূহও কম ভূমিকা রাখেনি এবং তাদের কার্যকলাপের কারণে জনগণ বুঝতেই পারছে না– আমরা বৃটিশের অধীনে আছি, না তারচে'ও নিকৃষ্ট কোনও শাসনের অধীনে।

যাহোক শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় শাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। শাসক যদি মুসলিম হয়, তবে সে যতই মন্দ হোক না কেন বৈধতার সীমারেখার ভেতর তার তৈরি যে-কোনও আইন মেনে চলা জনসাধারণের জন্য অপরিহার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আইন কোনও গুনাহের কাজ করতে বাধ্য না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা মেনে চলা ওয়াজিব ও জরুরি। এখন তো আমাদের মন-মানসিকতা থেকে আইন অমান্য করার অবৈধতা লোপ পেয়ে গেছে। এটা যে কোনও খারাপ কাজ, আমরা তা ভাবছিই না। ভালো ভালো লেখাপড়া জানা মানুষ এমনকি 'উলামায়ে কিরাম পর্যন্ত বিভিন্ন রকম সরকারি আইন অমান্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ব্যাপকভাবে আমরা এই অপরাধে লিপ্ত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরিউক্ত হাদীছ স্পষ্টভাবেই আমাদের এই কর্মপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে।

খলীফা হওয়ার জন্য কি কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়

এ হাদীছের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলে থাকে, খলীফা বা ইমাম হওয়ার জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়। কেননা এ হাদীছে শব্দ আছে- عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ অর্থাৎ হাত-পা কাটা হাবশী গোলাম। বলাবাহুল্য হাবশী গোলাম কুরায়শ বংশীয় হতে পারে না, অথচ এ হাদীছে তাকে আমীর বানানোর কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল আমীর ও খলীফা হওয়ার জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু তাদের এই যুক্তি ঠিক নয়। কেননা একতো হল স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে কাউকে খলীফা বানানো, আরেক হচ্ছে নিজে জবরদস্তিমূলকভাবে খেলাফতের মসনদে বসে যাওয়া। খলীফার জন্য যে সমস্ত শর্তের কথা বলা হয়েছে, তা প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রজোয্য। অর্থাৎ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় লক্ষ রাখতে হবে তার মধ্যে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান আছে কি না। পক্ষান্তরে কেউ যদি গায়ের জোরে খলীফা বনে যায়, তখন তার মধ্যে শর্তাবলীর বিবেচনা কে করবে? সে তো জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছে। স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ কোথায়? বাকি যার মধ্যে খলীফা হওয়ার শর্তাবলী অনুপস্থিত, সে যদি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে তবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার খেলাফতও সংঘটিত হয়ে যায়।

আলোচ্য হাদীছে এই দ্বিতীয় অবস্থার কথাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে যদি তোমাদের ইচ্ছার বাইরে জোরপূর্বক আমীর বানিয়ে দেওয়া হয় আর সে হাবশী গোলামও হয়, তবুও তোমরা তার আনুগত্য করবে। তো যেহেতু এটা জোরপূর্বক নিয়োগ, তাই কুরায়শী হওয়ার প্রশ্ন তোলা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। কুরায়শী হওয়ার ব্যাপারটা তো সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন লোকে নিজেদের ইচ্ছায় কাউকে খলীফা বানাবে। কুরায়শ গোত্রের বাইরের কেউ যদি জোরপূর্বক খলীফা বনে যায়, তবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তার খেলাফতও সংঘটিত হয়ে যায়। তাই তার আদেশ-নিষেধ মানাও যথানিয়মে নিযুক্ত খলীফার মতই অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই এ হাদীছ দ্বারা কুরায়শী হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে দলীল দেওয়া সঙ্গত নয়।

খলীফার কুরায়শী হওয়া না হওয়া সম্পর্কে মতভেদ

তবে এ বিষয়ে আরেকটি হাদীছ আছে। দলীল হিসেবে সেটি বড় মজবুত। হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর কাছে আরয করা হয়েছিল- আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করে যান। তিনি উত্তরে বললেন, আজ যদি আবূ 'উবায়দা ইবনুল-জার্‌রাহ জীবিত থাকতেন তাকে

খলীফা বানিয়ে যেতাম, কিন্তু তার তো ওফাত হয়ে গেছে। যদি সালিম মাওলা হুযায়ফা জীবিত থাকতেন তাকে খলীফা বানিয়ে যেতাম, কিন্তু তারও তো ওফাত হয়ে গেছে। এই যে সালিম মাওলা হুযায়ফা (রাযি.)-এর কথা উল্লেখ করলেন, তিনি কিন্তু কুরায়শী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) বললেন, সালিম জীবিত থাকলে তাকে খলীফা বানিয়ে যেতাম। এটা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে যে, হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর নিকট খলীফা হওয়ার জন্য কুরায়শ গোত্রীয় হওয়া শর্ত ছিল না। এ কারণেই এই উম্মতের কোনও কোনও ফকীহ বলেন, কুরায়শী হওয়া খেলাফতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

'আল-আইম্মাতু মিন কুরায়শ'-এর দ্বারা দলীল

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

'আইম্মাহ (ইমাম-এর বহুবচন অর্থাৎ খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান) কুরায়শ বংশের মধ্য থেকে হবে।'[১১৪]

এ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় খেলাফতের জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত। কিন্তু যারা বলেন শর্ত নয়, তারা এ হাদীছটির ব্যাখ্যা দেন যে, এতে হুকুম জানানো হয়নি; বরং সংবাদ দান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার পরে যারা খলীফা হবে তারা সাধারণত কুরায়শ বংশীয় হবে। এর দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়নি যে, কুরায়শী হওয়া অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তি কুরায়শ বংশের হবে না, তার খেলাফতও বৈধ হবে না।

কিন্তু এ হাদীছটির এরকম ব্যাখ্যা যারা করেছেন, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। বরং এ হাদীছটি দৃশ্যত কুরায়শী হওয়ার শর্তকেই প্রমাণ করে। তবে হাঁ, হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.) হযরত সালিম মাওলা হুযায়ফা (রাযি.) সম্পর্কে যে বলেছেন– তিনি জীবিত থাকলে তাকে খলীফা বানিয়ে যেতেন, এটা অবশ্য একটা মজবুত দলীল বটে, যা প্রমাণ করে খলীফা হওয়ার জন্য কুরায়শী হওয়া জরুরি নয়। এমনকি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কেও একটি মত এরকম বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তাঁর নিকটও খেলাফতের জন্য

---

১১৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১১৮৫৯

কুরায়শী হওয়া শর্ত ছিল না। তাছাড়া আরও কোনও কোনও ফকীহ এই মত পোষণ করতেন। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরামের মত হল খলীফার জন্য কুরায়শী হওয়া অপরিহার্য এবং এটা কেবল আরব দেশের জন্য নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য। এ ব্যাপারে মূল বিধান তো এই যে, সমগ্র মুসলিম জাহান এক খলীফার অধীনেই থাকবে। মুসলিম উম্মাহ যে এখন পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে আছে, এটা এ জাতির উদ্ভাবিত একটি বিদ'আত।

ফাসিক শাসকের জারি করা আইন অবশ্যপালনীয়

আমি যে উপরে বলেছি কুরায়শ বংশের বাইরের কোনও লোক জোরপূর্বক খলীফা বনে গেলে তার খেলাফত সংঘটিত হয়ে যায়– তার মানে হচ্ছে এরকম শাসক যদি কোনও আইন জারি করে এবং তা শরী'আত বিরোধী না হয়, তবে তা পালন করা সকলের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা যদি বলা হয় তার জারি করা আইন কার্যকর হবে না, তবে দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থেকে যায়, যা উম্মতের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। এ জন্যই শরী'আত এ বিধান দিয়েছে যে, কোনও শাসক বা খলীফার মধ্যে যদি খেলাফতের শর্তাবলী নাও পাওয়া যায়; বরং সে জোরপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করে নেয়, তবুও তার আইন মেনে চলা সকলের জন্য অপরিহার্য।

নারী-নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে, কোনও নারী যদি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে তবে সে সম্পর্কে কী হুকুম? এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে। কোনও কোনও ফকীহ'র ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় তার জারিকৃত আইন কার্যকর হবে না এবং তার খেলাফত ও নেতৃত্ব সংগঠিতই হয় না। তবে তাহকীক ও অনুসন্ধান দ্বারা এ কথা সঠিক মনে হয় না। সঠিক মত হল, নারীও যদি কোনও উপায়ে ক্ষমতার মসনদে বসে যায়, তবে শাসনক্ষমতায় তার অধিষ্ঠান সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তার জারি করা আইনও কার্যকর হয়ে যায়। অবশ্য যারা নারীকে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে কিংবা তার ক্ষমতা দখলে কোনওরূপ ভূমিকা রাখবে, তারা গুনাহগার হবে।

'উলুল-আম্‌র' দ্বারা কোন্ শাসক বোঝানো হয়

এক তালিবে 'ইলম প্রশ্ন করেছিল, কুরআন মাজীদে যে ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও।'[১১৫]

এতে 'উলুল-আম্‌র' দ্বারা কোন্ শাসককে বোঝানো হয়েছে? যে-কোনও শাসক, নাকি কেবল এমন শাসক যার ভেতরে ইজতিহাদের শর্তাবলী পাওয়া যায়? খুবই সুন্দর প্রশ্ন। ফকীহগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও করেছেন। অনেকের মতে উলুল-আম্‌র দ্বারা ফকীহ-মুজতাহিদগণকে বোঝানো উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আলোচ্য মাসআলায় এ আয়াত দ্বারা কোনও প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ব্যাখ্যাতাদের মতে উলুল-আম্‌র দ্বারা শাসকদেরকে বোঝানো হয়েছে,তা মুজতাহিদ হোক বা নাই হোক। উভয় রকম শাসকই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা তাদের আনুগত্য ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। এ ব্যাখ্যাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

এ ব্যাখ্যা বেশি গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ দু'টি। প্রথমত এ ব্যাখ্যা যারা করেছেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত বহু হাদীছ দ্বারা এ ব্যাখ্যার সমর্থনও পাওয়া যায়। শুরুতে যে হাদীছ উল্লেখ করা হল, সেটিও এর সমর্থন করে। কোনও কোনও রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় সাহাবায়ে কিরাম এ আয়াতটিকে 'শাসকদের আনুগত্য' অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তা দ্বারাও এ ব্যাখ্যাটি সমর্থিত হয়।

শাসকের প্রতিটি হুকুমই অবশ্যপালনীয়

ওই তালিবে 'ইলম আরও একটি প্রশ্ন করেছিল। তা হল, উলুল-আম্‌র অর্থাৎ শাসকের সব আদেশই কি অবশ্যপালনীয়, নাকি কেবল এমন আদেশ, যা কোনও বিচারক বা আদালতের মাধ্যমে জারি করা হয়? এর উত্তর হল, উভয় রকম আদেশই অবশ্যপালনীয়,তা কাজী বা আদালতের মাধ্যমে জারি করা হোক কিংবা সরাসরি প্রদত্ত হোক। কেননা শাসকের আদেশ দু'রকমের হয়ে থাকে। এক আদেশ হয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। এরূপ আদেশ আদালতের মাধ্যমে দেওয়া হয় না; বরং শাসক তার ক্ষমতাবলে সরাসরি জারি করে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার আদেশ হয় এমন, যা কোনও মামলা-মুকাদ্দামার ফয়সালার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এ জাতীয় আদেশ বিচারকের মাধ্যমে

---

১১৫. সূরা নিসা, আয়াত ৫৯

জারি করা হয়। সুতরাং তার উভয় প্রকার আদেশই জনগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। অবশ্যপালনীয় হওয়ার ব্যাপারে এ দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। অবশ্য এ শর্ত তো সর্বাবস্থায়ই থাকবে যে, যে-কারও আদেশই অবশ্যপালনীয় হবে কেবল তখনই, যখন তা কোনও রকম গুনাহে লিপ্ত হতে বাধ্য না করবে। কেননা উপরে আরয করা হয়েছে−

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনও মাখলূকের আনুগত্য জায়েয নয়।'[১১৬]

এই হাদীছের মাধ্যমে শরী'আত আমাদেরকে আদেশপালন সংক্রান্ত মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ যদি যথাযথভাবে এ মূলনীতির অনুসরণ করে, তবে ইনশাআল্লাহ কয়েক ঘন্টার ভেতরে সকল শাসক শুধরে যেতে পারে।

সরকারের উপর চাপসৃষ্টির প্রচলিত পন্থা

বর্তমানকালে সরকারের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার এবং বৈধ দাবি আদায় করে নেওয়ার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পন্থায় চাপ সৃষ্টি করা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এরকম চাপসৃষ্টির সুযোগও আছে বৈকি; বরং চাপসৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে দাবি আদায় করে নেওয়ার সুযোগকে গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ মনে করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চাপসৃষ্টির পন্থা কী হতে পারে? পন্থা তো বিভিন্নই আছে, তবে বৃটিশ আমাদেরকে যে তরীকা শিক্ষা দিয়ে গেছে তা হচ্ছে− হরতাল কর, অনশন-ধর্মঘট কর, বিক্ষোভ মিছিল কর, অবরোধ আরোপ কর, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দাও ইত্যাদি। তাদের শিক্ষা মোতাবেক আমরা এসব কাজ শুরুও করে দিয়েছি, কিন্তু আমরা একটিবারও চিন্তা করে দেখিনি চাপসৃষ্টির এ পন্থা আমাদের শরী'আত মোতাবেক কি না?

প্রচলিত হরতালের শর'ঈ বিধান

বলা হয়ে থাকে হরতাল হল দাবি আদায়ের বা প্রতিবাদ জানানোর একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই হিসেবে তো এমন হওয়ার কথা ছিল যে, কারও

---

১১৬. আহমাদ, হাদীছ নং ১০৪১; ইবন আবী শায়বাঃ, ৭খণ্ড, ৭৩৭পৃ. হাদীছ নং ১২; আল-মু'জামুল-কাবীর, ১৩খণ্ড, ৫৪পৃ., হাদীছ নং ১৪৭৮২

পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হবে– আমরা অমুক বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য বা অমুক দাবি আদায়ের জন্য অমুকদিন হরতাল করব, কাজেই আপনারা নিজ নিজ দোকান ও কল-কারখানা বন্ধ রাখবেন। অতঃপর তার সে ঘোষণা অনুযায়ী কেউ যদি তার দোকান ও কল-কারখানা বন্ধ রাখে, সেটা তার ইচ্ছা। আর যদি কেউ তা বন্ধ না রাখে, সে এখতিয়ারও তার থাকবে। এ ব্যাপারে তার উপরে কোনও চাপসৃষ্টি করা যাবে না এবং জোরপূর্বক তার দোকান ও কল-কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে না। যদি ব্যাপারটা কেবল এতটুকুই হত, তবে শরী'আতে দোষের কিছু ছিল না। এ জাতীয় হরতালকে শরী'আত জায়েযই বলবে। কিন্তু বাস্তবতা কী? কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত এরূপ শান্তিপূর্ণ ও ভদ্র হরতাল হয়নি এবং বর্তমানকালে তা হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। আজকাল নাম তো নেওয়া হয় গণতন্ত্রের। যার মানে প্রত্যেকে নিজ মত অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা রাখে। কিন্তু গণতন্ত্রের এই কথা কাগজ-কলম ছাড়া বাস্তবে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে? বাস্তবে তো হরতালের নামে অন্যের উপরে নিজ মত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ দোকান বন্ধ করতে না চাইলেও জোরপূর্বক বন্ধ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এটা কেমন গণতন্ত্র হল? বরং আজকাল এই গণতান্ত্রিক হরতালের ঘোষণাই দেওয়া হয় অগণতান্ত্রিকভাবে। বলা হল- আমরা রাস্তায় কোনও গাড়ি চলতে দেব না, তা যার গাড়িই হোক। এটা তো স্পষ্ট জুলুম। এই জুলুমের হরতালে পড়ে নাজানি আল্লাহর কত বান্দা আজকাল মসিবতের স্বীকার হয়। যেমন, একজন লোক অসুস্থ, হাসপাতালে নেওয়া জরুরি, কিন্তু হরতালের কারণে তাকে হাসপাতালে নেওয়া যাচ্ছে না; একজন লোক দিনমজুর, প্রতিদিনের রোজগারেই তার সংসার চলে, কিন্তু এই গণতান্ত্রিক হরতালের কারণে তার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়, সেদিন পরিবার বউ-বাচ্চাসহ তাকে অভুক্ত কাটাতে হয়; কিংবা একজন লোক মুসাফির, তার কোথাও যাওয়া জরুরি, কিন্তু হরতালের কারণে সে আটকা পড়ে আছে, না রেলওয়ে স্টেশনে যেতে পারছে, না বিমানবন্দর। এভাবে হরতালের ফাঁদে পড়ে কত মানুষ কত রকমের দুর্ভোগের স্বীকার হয়। জোরপূর্বক মানুষকে আটকে দেওয়া হয়, ফলে তারা তাদের অতি প্রয়োজনীয় কাজও সমাধা করতে সক্ষম হয় না। এই জোর-জবরদস্তির হরতাল শরী'আতে কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

প্রচলিত হরতালের অপরিহার্য পরিণাম

বর্তমানে আমরা আমাদের দেশে যে হরতালের সাথে পরিচিত, তার দুর্ভোগ ও ক্ষয়-ক্ষতির কোনও সীমা নেই। দোকানে-বাড়িতে ভাঙচুর, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, সরকারি মালামাল ধ্বংস এবং এরকম আরও নানা রকম অরাজকতা আজকালকার হরতালের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। হরতালের নামে এই ধ্বংসযজ্ঞ শরী'আত কিছুতেই অনুমোদন করে না। এই অবৈধ হরতালকে শরী'আত-প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানানো কিভাবে জায়েয হতে পারে? একে যদি জায়েয বলা হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে পাপকর্মের মাধ্যমে শরী'আত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। বলাবাহুল্য ইসলামে এর কোনও অবকাশ নেই।

শরী'আতের দৃষ্টিতে মিছিল করা

রাজপথে মিছিল করাও আজকাল প্রতিবাদ জানানোর একটা পন্থা। সাধারণত দেখা যায় মানুষ একেকটা উপলক্ষে মিছিল বের করে আর তাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব হয় না এবং অযথাই মানুষ দুর্ভোগের স্বীকার হয়। কাজেই আমার মতে এভাবে রাজপথে মিছিল করাও জায়েয নয়। আমাদের শরী'আত এটা অনুমোদন করে না। কেননা হাদীছ শরীফে ওইসব লোককে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে, যারা মানুষের চলাচলপথ আটকে দেয়। বলাবাহুল্য মিছিল দ্বারা তাই হয়।

সারকথা সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করার জন্য বৃটিশ আমাদেরকে যেসব পন্থা শিক্ষা দিয়েছে, আমরা নির্বিচারে তা অনুসরণ করছি। এমনকি দ্বীনী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমরা তা প্রয়োগ করছি। তারই অপরিহার্য ফল যে, আমাদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

সরকারের উপরে চাপসৃষ্টির সঠিক পন্থা

সুতরাং বৃটিশদের শেখানো এসব পদ্ধতি আমাদেরকে অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষে আমরা যদি সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে চাই, তবে আমাদেরকে এমন পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা শরী'আত অনুমোদন করে। শরী'আতের শেখানো পন্থা হল-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনও মাখলূকের আনুগত্য জায়েয নয়।'[১১৭]

---

১১৭. আহমাদ, হাদীছ নং ১০৪১; ইবন আবী শায়বাঃ, ৭খণ্ড, ৭৩৭পৃ. হাদীছ নং ১২; আল-মু'জামুল-কাবীর, ১৩খণ্ড, ৫৪পৃ., হাদীছ নং ১৪৭৮২

অর্থাৎ সরকার যদি শরী'আতবিরোধী কোনও হুকুম জারি করে কিংবা কোনও পাপকার্যের আদেশ করে, তবে জনগণ সরকারকে জানিয়ে দেবে- আমরা এসব আইন মানতে পারব না। যে আইন মানলে আমাদেরকে পাপকর্মে লিপ্ত হতে হয়, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। উদাহরণত আদালতে যেসকল জজ ও বিচারক কর্মরত আছে, তারা সকলে বলে দেবে- আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মামলা-মুকাদ্দামার ফয়সালা করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরী'আতী আইন বাস্তবায়ন না করা হবে। এমনিভাবে উকিলগণও বলে দেবে- আমরা কোনও মামলা পরিচালনা করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরী'আতী আইন কার্যকর করা না হবে। ব্যবসায়ীগণ বলে দেবে- আমরা কোনও ব্যাংকে টাকা জমা করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে সুদমুক্ত না করা হবে এবং আমরা সুদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যাংক থেকে টাকা নেবও না। কেবল এই শেষের কাজটাও যদি আমরা করতে পারি অর্থাৎ দেশের সমস্ত মুসলিম মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব যে, ব্যাংকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সুদি ব্যবস্থাকে খতম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনও ব্যাংকে টাকা রাখব না, তবে একটা বিরাট কাজ হত। আপনারা দেখতে পেতেন সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হত এবং কয়েক ঘন্টার ভেতর দেশ থেকে সুদি ব্যবস্থা উঠে যেত। কিন্তু এ কাজ তো এমনিই হওয়ার নয়, এর জন্য কিছুটা হিম্মত এবং কিছুটা ত্যাগস্বীকারেরও দরকার রয়েছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা

কিন্তু বৃটিশ আমাদেরকে এমন পন্থা শিক্ষা দিয়েছে, যার জন্য আমাদের কোনও হিম্মতেরও দরকার হয় না, কোনও ত্যাগও স্বীকার করতে হয় না। মনে করুন এক ব্যক্তি ব্যাংকে চাকরিরত, সে সুদ খেয়ে জীবন নির্বাহ করে। কিংবা এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী, সে ব্যাংকের মাধ্যমে সুদি লেনদেন করছে, ব্যাংকে তার টাকাও জমা আছে। এখন সুদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি হরতাল হয় আর ওই ব্যক্তি তাতে অংশগ্রহণ করে কিংবা মিছিল বের হয় আর তাতে সে শরীক হয় এবং সুদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়, তবে সে তো মনে করছে যে, আমি ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হলাম, একটা বিরাট কাজ করে ফেললাম। অন্যদিকে আবার সে সুদি ব্যাংকে গিয়ে লেনদেন শুরু করে দিল। তো সে আন্দোলন করল অথচ ত্যাগ কিছু স্বীকার করতে হল না; বরং যার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সেই সুদি ব্যবস্থার সংগেই নিজেকে জড়িয়ে রাখল। তো এই আন্দোলনের ফায়দাটা কী? এর অর্জন কী?

হ্যাঁ দুনিয়াবী একটা অর্জন আছে, বিনা ত্যাগেই যা হাসিল হয়ে যায়। তা এই যে, আন্দোলনে শরীক হওয়ার কারণে লোকে তার গলায় মালা দেয়, তার প্রশংসা করে। চারদিকে নাম পড়ে যায় যে, কতবড় জননেতা। এতবড় মিছিল বের করে ফেলেছে। সরকারের মসনদ কাঁপিয়ে দিয়েছে।

সারকথা সরকারের উপরে চাপসৃষ্টির এ পন্থা মোটেই শরী'আত মোতাবেক নয়; বরং শরী'আত মোতাবেক পন্থা সেটাই, যা আমি উপরে তুলে ধরলাম।

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী ২খণ্ড, ৩১৩-৩২২পৃ.

নির্বাচন ও জনগণের দায়িত্ব

নতুন নির্বাচন আসন্ন। ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল– উভয় দলের নির্বাচনী তৎপরতা এখন তুঙ্গে। জনগণের দৃষ্টি ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের দিকে। নির্বাচন যে-কোনও রাষ্ট্রের জীবনে এক ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। সে পরিবর্তন কতটা নাজুক ও বিপজ্জনক হতে পারে তার একটা অনুমান সেই জাতির ভালোভাবেই থাকা উচিত, যারা ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ধাক্কাকে এখনও ঠিক সামলে উঠতে পারেনি।

যে-কোনও সভ্য রাষ্ট্রে সরকারের সমালোচনাকে জনগণের অপরিহার্য অধিকার মনে করা হয়। এ অধিকারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে এখানেও কথা থেকে যায়। আমাদের অকুণ্ঠভাবেই এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, আমরা অতীতে এ অধিকার প্রয়োগের বাহানায় নিজেদের অনেক দুর্বলতা গোপন রাখারও চেষ্টা করেছি। আমরা এ বিষয়টা কমই চিন্তা করেছি যে, আমাদের শাসকগণ মূলত আমাদের কর্ম ও চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। নিশ্চয়ই সেসব লোক চরম নিন্দা ও ঘৃণার উপযুক্ত, যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষমতার মসনদ পর্যন্ত পৌঁছায়,যারা টাকা-পয়সা দিয়ে ভোট কিনে ক্ষমতা কব্জা করে নেয়। কিন্তু তাদের সেই অপরাধে জনগণও কম দায়ি নয়। কেননা তারা পয়সার ঝনঝন আওয়াজ শুনে দেশ ও জাতি এবং দ্বীন ও আখলাক সবকিছু ভুলে গিয়ে তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি পাড় হতে শক্তি জোগায়। তারপর যখন তারা ক্ষমতার মসনদে বসে জনতার রক্ত নিংড়াতে শুরু করে, তখন এরা আক্ষেপে আঙ্গুল কামড়ায়। অন্ততপক্ষে তখনও তো উচিত ছিল নিজেদের কর্মপন্থা খতিয়ে দেখা ও নিজেদের ভুল স্বীকার করা, কিন্তু তা না করে সরকারের সমালোচনার বাহানায় তারা নতুন কোনও সূর্যের পূজা শুরু করে দেয়। বর্তমান পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় যে সরকারই ক্ষমতায় আসে, তারা ইলেকশনের মাধ্যমেই আসে। কাজেই ক্ষমতায় আসার পরই তারা যা-কিছু কর্মকাণ্ড করে, তার দায়-দায়িত্ব যারা ভোট দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতার

মসনদে পৌঁছিয়েছে তাদের উপরও বর্তায়। তারাই তো ভোট দিয়ে তাদেরকে ওইসব অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তারা তাতে লিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে জোর গলায় বলেও থাকে যে, জনগণই আমাদেরকে এর ম্যাণ্ডেট দিয়েছে। কাজেই তাদের পার্থিব ও পরকালীন দায়-দায়িত্বের অনেকটাই ভোটদাতাদের উপরে বর্তাবে বৈকি। সুতরাং আগামী মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এটা কোনও খেল-তামাশা নয়, যাকে আমরা অবহেলার সংগে পাশকাটিয়ে চলতে পারি কিংবা অবজ্ঞাভরে দেখতে পারি; বরং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য অত্যন্ত বুঝেশুনে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আপন দায়িত্ব পালন করা। যদিও সরাসরিভাবে রাজনীতির সঙ্গে আমার কখনও কোনও সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাই বলে পরোক্ষভাবেও যে এর সংগে কোনও সম্পর্ক থাকবে না সেটা ঠিক নয়। কেননা ইসলাম জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও আমাদেরকে অনেক মৌলিক নির্দেশনা দান করেছে। সে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা একজন মুসলিমের অবশ্যকর্তব্য। কাজেই আজকের এই আলোচনায় সেই নির্দেশনাবলী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

শরী'আতের দৃষ্টিতে ভোটের মর্যাদা

শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ভোট সাক্ষ্যের মর্যাদা রাখে। আপনি যাকে ভোট দিচ্ছেন যেন তার সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আপনার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি সংসদ-সদস্য হওয়ার কিংবা সরকারে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে। আপনি যেন সাক্ষ্য দিচ্ছেন আপনার দৃষ্টিতে নির্বাচনে যেসব প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি উপযুক্ত আর কেউ নেই আর সে কারণেই আপনি তাকে ভোট দিয়েছেন। বোঝা গেল ভোট একটি সাক্ষ্য। সে হিসেবে শাহাদাত বা সাক্ষ্য সম্পর্কে শরী'আত যে সমস্ত বিধি-বিধান দান করেছে, ভোটের জন্যও তা প্রযোজ্য।

কতক লোক দ্বীনকে কেবল নামায-রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে। তারা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদিকে দ্বীনের অংশ মনে করে না। বেচাকেনা, লেনদেন, বিচার-আচার ইত্যাদিকে দ্বীনের আওতাবহির্ভূত এবং দ্বীনের অনুশাসন থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন বিষয় মনে করে, যা মানুষ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সম্পূর্ণ করতে পারে। এজন্যই বহু লোককে দেখা যায়, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নামায, রোযা, ওজীফা ইত্যাদি পালনে খুবই

যত্নবান, কিন্তু বেচাকেনার ক্ষেত্রে তারা হালাল-হারামের কোনও চিন্তা করে না, বিবাহ-তালাকেও বৈধাবৈধের বিচার করে না এবং আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের ক্ষেত্রে শরী'আতের ধার ধারে না। এ জাতীয় লোক নির্বাচনকেও কেবলই দুনিয়াবী বিষয় মনে করে রেখেছে। তাই ব্যবসায়ীক পণ্যের মত এ ক্ষেত্রেও যাচ্ছেতাই পন্থা অবলম্বন করে। এ ব্যাপারে কোনও রকমের অন্যায় আচরণকে তারা গুনাহ মনে করে না। তাই নির্ভয়ে-নিঃসংকোচে তা করে ফেলে। তারা ভোট দেওয়াকে কোনও বিশ্বস্ততার বিষয় বলে গণ্য করে না, কেবলই ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিস্বার্থের ভিত্তিতে যে-কোনও অযোগ্য ব্যক্তিকেও ভোট দিয়ে দেয়। মনে মনে ঠিকই জানে, যাকে ভোট দেওয়া হচ্ছে সে এর যোগ্য নয় কিংবা তারচে' আরও বেশি উপযুক্ত লোক আছে। তা যত উপযুক্ত লোকই থাকুক না কেন, ভোটদাতার কাছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তাই বড় কথা। তাই এসব বিবেচনায় সে তার ভোটের ভুল প্রয়োগ করে। কখনও চিন্তাও করে না শর'ঈ বা দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে কতবড় অপরাধ সে করছে।

উপরে বলা হয়েছে ভোট একটি সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

অর্থ : 'এবং যখন কোনও কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয়।'[১১৮]

যখন কারও সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধি এবং মনের নিরপেক্ষ ফয়সালা হল সে ভোট পাওয়ার উপযুক্ত নয় কিংবা তারচে' বেশি উপযুক্ত অন্য প্রার্থী রয়েছে, তখন কেবলই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তাকে ভোট দিয়ে দেওয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ারই নামান্তর। কুরআন মাজীদে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াকে চরম গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে মূর্তিপূজার পাশাপাশি তার উল্লেখ করা হয়েছে,যথা ইরশাদ–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

অর্থ : 'তোমরা পরিহার কর নাপাকি তথা প্রতিমাদের এবং পরিহার কর মিথ্যাবলা।'[১১৯]

---

১১৮. সূরা আন'আম, আয়াত ১৫২

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীছে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার কদর্যতা তুলে ধরেছেন। তিনি যেসকল বিষয়কে মহাপাপের শীর্ষে উল্লেখ করেছেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াও তার একটি। এ বিষয়ে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবূ বাকরা (রাযি.) বলেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন– আমি কি তোমাদেরকে সবচে' বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলব না? তা হচ্ছে– আল্লাহর সংগে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা আর খুব ভালোভাবে শুনে রেখ– মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা। হযরত আবূ বাকরা (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়েই বসা ছিলেন। যখন মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টা আসল সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন 'মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া'। তিনি কথাটির এতবেশি পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, একপর্যায়ে আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, আহা, তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন![১২০]

এসব সতর্কবাণী তো ভোটের ওই অপপ্রয়োগ সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়, যা কেবলই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে দেওয়া হয়ে থাকে,টাকা-পয়সার কোনও কারবার থাকে না। পক্ষান্তরে যে ভোটে টাকা-পয়সার কারবারও থাকে অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তো ডবল মহাপাপ। একটি মহাপাপ মিথ্যাসাক্ষ্য দানের, আরেকটি ঘুষ খাওয়ার।

ভোট কেবল দুনিয়াবী বিষয় নয়

সুতরাং বোঝা গেল ভোট দেওয়াটা কেবল দুনিয়াবী বিষয় নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, এর সম্পর্ক কেবলই পার্থিব ব্যবস্থাপনার সাথে, দ্বীনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বস্তুত দ্বীনের সঙ্গে রয়েছে এর গভীর সম্পর্ক। মনে রাখতে হবে আখিরাতে প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেখানে প্রতিটি কাজের জবাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে এই ভোট দেওয়ার ব্যাপারেও। এই সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটা কিভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল, এতে কতটুকু বিশ্বস্ততা রক্ষা করা হয়েছিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন। তখন যাতে উত্তর সঠিক দেওয়া যায়, তাই এখনই এর প্রয়োগে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

---

১১৯. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩০
১২০. বুখারী, হাদীছ নং ২৪৬০; মুসলিম, হাদীছ নং ১২৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮২৩

কেউ কেউ মনে করে যদি অনুপযুক্ত লোককে ভোট দিলে গুনাহ হয়, তবে সেটা নতুন আর কি। আমরা তো কোনও পাকসাফ লোক নই যে, কখনও কোনও গুনাহ করি না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত থাকি। অনুপযুক্ত লোককে ভোট দিলে গুনাহের সেই দীর্ঘ তালিকায় নতুন একটা বাড়বে, এর বেশি কিছু তো নয়!

বিষয়টাকে এত লঘু দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে এটাও শয়তানের একটা বিরাট চাল, তার অনেক বড় ধোঁকা। মানুষ যদি প্রতিটি গুনাহ করার সময় এরকম চিন্তা করে, তবে তো সে কোনও গুনাহই ছাড়তে পারবে না, অবলীলায় সব গুনাহই করে যাবে। গুনাহ তো এক রকম নাপাকি। শরীরে যদি সামান্য একটু নাপাকিও লাগে, তবে তা নিয়ে তো কেউ বে-ফিকির থাকে না; সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার করে ফেলার চিন্তা করা হয়। এমন তো নয় যে, শরীরে একটু নাপাকি লাগল বলে তা সাফ করা হবে না; বরং আরও বেশি নাপাকির গর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত গুনাহের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। এক গুনাহের সঙ্গে আরেক গুনাহের প্রভেদ আছে। যেই পাপের অশুভ পরিণাম গোটা জাতিকে ভুগতে হয়, তার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত গুনাহের অপেক্ষা অনেক গুরুতর। ব্যক্তিগত পর্যায়ের গুনাহ যত কদর্য ও যত কঠিনই হোক, তার কুফল দু'-চারজন লোকের বেশিকে ভুগতে হয় না। ফলে তার প্রতিকারও কঠিন হয় না। যারা যারা তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের প্রতিকারের বিষয়টা আয়ত্তের মধ্যেই থাকে। তা থেকে তাওবা-ইস্তিগফার করাও সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে তা মাফ হয়ে যাওয়ার আশাও সর্বদা করা যায়। পক্ষান্তরে যে পাপের পরিণাম সমগ্র দেশ ও জাতিকে ভোগ করতে হয়, যার খেসারত দিতে হয় সকলকেই, তার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব? মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব হয় না। একবার এই তীর ধনুক থেকে বের হয়ে গেলে কখনওই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। বড়ই সংগিন ব্যাপার। এই দুষ্কর্ম থেকে তাওবা করলে ভবিষ্যতের ব্যাপারে তো সতর্ক থাকা যায়, কিন্তু অতীতে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন, ফলে তার শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার আশাও বড় কম থাকে।

ভোটের অপপ্রয়োগ গুরুতর গুনাহ

বস্তুত ভুল জায়গায় ভোট দেওয়া অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। চুরি করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং আরও যত কঠিন কঠিন গুনাহ আছে, ভোটের অপপ্রয়োগ সে সবগুলোর চেয়ে গুরুতর। এর সাথে অন্য কোনও

পাপকর্মকে তুলনা করা যায় না। এ কথা সত্য যে, আমরা সকাল-সন্ধ্যা নানা রকম গুনাহ করে থাকি। কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ গুনাহই এমন, তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে যা মাফ হয়ে যায়। আর তাতে যে ক্ষতি হয় তার প্রতিকারও সম্ভব। সেরকম হাজারও গুনাহ করছি বলে এমন একটি গুনাহতেও বিলক্ষণ জড়িয়ে যাব, যার প্রতিকার সম্ভব নয় এবং যার মাফ হয়ে যাওয়াও সহজ নয়, এটা কোনও বুদ্ধির কথা নয়। গুনাহ যেমনই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর অন্যায় ভোট দেওয়ার গুনাহ যেহেতু সর্বাপেক্ষা কঠিন, তাই এ ব্যাপারে তো আরও বেশি সতর্কতা জরুরি।

অনেকে চিন্তা করে, লাখও ভোটের বিপরীতে আমার একার একটা ভোটের কী গুরুত্ব আছে? যদি এই একটা ভোট ভুল জায়গায় দেওয়া হয়ও, তাতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কতটুকু প্রভাবিত হবে? এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কেননা প্রথমত প্রত্যেকেই যদি ভোট দেওয়ার সময় এই একই চিন্তা করে, তবে তো সারাদেশের একটা ভোটও সঠিকভাবে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে ভোট গণনার যে নিয়ম চালু আছে, তাতে একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তির ভোটও দেশ ও জাতির পক্ষে মীমাংসাকারী সাব্যস্ত হতে পারে। একজন বেদ্বীন, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ প্রার্থীর বাক্সে যদি মাত্র একটা ভোটও অন্যদের চেয়ে বেশি চলে যায়, তবে সেই একটা ভোটের ফলে সে জয়যুক্ত হবে এবং গোটা জাতির উপর সে চেপে বসবে। এভাবে কখনও কখনও একজন অজ্ঞ, অশিক্ষিত ব্যক্তির মামুলি উদাসীনতা ও ভুলচুক বা অবিশ্বস্ততাও গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং চলতি নিয়মে প্রতিটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির শর'ঈ, নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব– সে নিজের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকবে এবং যথাযথ চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বস্ততার সাথে সে তার এই অধিকার প্রয়োগ করবে।

ভোট দেব কাকে

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা ভোট দেব কাকে? ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোন্ কোন্ গুণ বিচার করে প্রার্থী বাছাই করব? এর উত্তরে আমরা বলব, ভোট দেওয়ার সময় প্রার্থীর ভেতরে বিশেষ কয়েকটি গুণ লক্ষণীয়। তার মধ্যে যেগুলো মোটাদাগের, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা গেল–

এক. প্রার্থীকে আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে পরিপক্ক মুসলিম হতে হবে।

দুই. সে দ্বীনদার হবে। অন্ততপক্ষে দ্বীন, দ্বীনদার ও দ্বীনের নিদর্শনাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং দেশে ইসলামী আইন জারির ব্যাপারে সে পূর্ণ আগ্রহ রাখবে।

তিন.বিশ্বস্ত ও আমানতদার হবে। নীতি-নৈতিকতার বিসর্জন দাতাহবে না।

চার.রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও অখণ্ডতার ব্যাপারে আপোষহীন হবে।

পাঁচ. ভদ্র ও চরিত্রবান হবে এবং দেশ ও জাতির সেবা করার মত মানসিকতা থাকবে।

ছয়. প্রকাশ্যে কোনও ফাসেকী কাজ বা শরী'আতবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, এমন না হতে হবে।

সাত. বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল হবে। ঠিকমতো কৌশল সংক্রান্ত বিষয় ভালো বোঝে, এরকম হতে হবে।

আপনার নির্বাচনী এলাকায় যে ব্যক্তি এই মানদণ্ডে উতরোয় বা এর কাছাকাছি হয়, তাকে ভোট দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করুন, তাতে সে যে দলের লোকই হোক না কেন। প্রার্থীদের মধ্যে একজনও যদি এই মানদণ্ডে না টেকে, তবে যে ব্যক্তি এর কাছাকাছি হবে এবং যার ক্ষতিকারিতা অন্যদের তুলনায় কম হবে তাকেই ভোট দিন। অর্থাৎ মন্দের ভালোকে বেছে নিন।

উল্লিখিত মানদণ্ডে কে টেকে আর কে টেকে না, তা যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব প্রত্যেক ভোটদাতার নিজের। তার জীবনাচার, জীবনের ধরন-ধারণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার অতীত জীবন, তার আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা, তার পসন্দ-অপসন্দ, তার বন্ধু-বান্ধব, যাদের সঙ্গে তার মেলামেশা– এই যাবতীয় বিষয় অনুসন্ধান করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনও কঠিন কাজ নয়। সদিচ্ছা থাকলে ইনশাআল্লাহ তাওফীক লাভ হবে।

তাছাড়া এ বিষয়ে বিচক্ষণ লোকের সাথে পরামর্শও করা যেতে পারে। সবচে' ভালো হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হিদায়াত লাভের জন্য দু'আ করা এবং তার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল 'ইস্তিখারা' করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই এ পন্থা শিক্ষাদান করেছেন। ভোট দেওয়ার আগে যে-কোনও দিন ইস্তিখারার নিয়তে দু' রাক'আত নামায পড়ুন। নামাযের পর ইস্তিখারার প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়ুন। দু'আটি মুখস্থ না থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যে, হে আল্লাহ! ভোটের আমানতকে সঠিক স্থানে প্রয়োগের তাওফীক দান করুন।

অনুসন্ধান, পরমার্শ ও ইস্তিখারা– এ তিনটি এমন কাজ, যার মাধ্যমে আপনি ভোট দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভ করতে পারেন। অতঃপর সদিচ্ছার সাথে আপনি যে ভোট দেবেন, ইনশাআল্লাহ তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। অন্ততপক্ষে আপনি আখিরাতের জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যেতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দিন– আমীন।

وما علينا الا البلاغ

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী

তারিখ– ৫/৬/১৩৯৭ হি.

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ৭-১২পৃ.

ইসলামে ভোটের গুরুত্ব

পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে জনগণের এই অভিযোগ হামেশাই থেকেছে যে, নিজ ইচ্ছামত সরকার নির্বাচনের ক্ষমতা তারা পায়নি। এ অভিযোগ যথার্থ। এটা একটা বাস্তবতা যে, পাকিস্তান গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের অবকাশ হয়নি। ১৯৭০ এর প্রস্তাবিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত তারা সেই সুযোগ পাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ইলেকশনের ব্যবস্থাপনায় কোনও রকম পক্ষপাতিত্বের দিক সামনে আসেনি। তাই আমরা অনুমান করতে পারি ইনশাআল্লাহ এ নির্বাচন 'নির্বাচন-কমিশন'-এর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই সম্পাদিত হবে। এ অবস্থায় সারাদেশের যিম্মাদারি আমজনগণের উপরে এসে পড়েছে। আল্লাহ না করুন এবার যদি কোনও ভুল বা অযোগ্য কিসিমের লোক ক্ষমতায় এসে যায়, সেজন্য জনগণই দায়ী থাকবে। অতঃপর সরকারের সব রকমের ভালো-মন্দ কাজের ছওয়াব ও আযাবের ব্যাপারটা ওইসব লোকের আমলনামায় লেখা হবে, যারা ভোট দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় এনেছে। কেননা তাদের ভোটের পরিণামেই তারা এসব ভালো-মন্দ কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। ফলে অন্যায় কাজের জন্য কাজের কর্তা ও সুযোগদাতা উভয়েই সমান দায়ী হবে।

সরকারের সমালোচনা করাকে যে-কোনও সভ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের একটি স্বীকৃত অধিকার মনে করা হয়। বলাবাহুল্য নাগরিকদের এ অধিকার যে-কোনও মূল্যে থাকাই উচিত। এ অধিকারের প্রয়োজন এবং এর প্রভাব ও সুফল কোনওক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অতীতে আমরা এ অধিকারের ভুল ব্যবহারও করেছি। একথা বলতে আমরা কোনও জড়তাবোধ করি না যে, এ অধিকার প্রয়োগের বাহানায় আমরা আমাদের অনেক দুর্বলতা গোপন করার চেষ্টা করেছি। আমরা এদিক সম্পর্কে খুব কম চিন্তাই করেছি যে, আমাদের শাসকগণ মূলত আমাদের নীতি-নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডেরই প্রতিচ্ছবি। সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আইয়ুব খানের শাসনামল তার স্বৈরতন্ত্রের জন্য কুখ্যাত। তার আমলে জনগণের বহু

অধিকার পদদলিত করা হয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই নানাবিধ দুষ্কর্মের কারণে কুখ্যাতিই তার পাওনা ছিল। কিন্তু তার আমলের বহু দুষ্কর্মের দায়-দায়িত্ব আমাদের উপরও বর্তায়। আমাদের মধ্যে যদি ভীতি, লোভ-লালসা ও ব্যক্তিস্বার্থের তাড়না না থাকত, তবে ওই একনায়ক দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত আমাদের উপরে জগদ্দল-পাথর হয়ে থাকতে পারত না এবং ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় যেসব অপকর্ম করে গেছে, তা করতে পারত না। ওই একনায়ক তার দীর্ঘ শাসনামলে এ দেশটিকে বৈষয়িক ও নৈতিক দিক থেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে ছেড়েছে। যারা সম্পদের ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষমতার সিঁড়ি পাড় হয় এবং ভোট কিনে কিনে মসনদ পর্যন্ত পৌঁছায়, নিঃসন্দেহে তারা সবরকম নিন্দা ও ঘৃণার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের অপরাধে সেই জনগণও সমান অংশীদার, যারা চকচকে মুদ্রার আওয়াজ শুনে দেশ ও জাতি এবং দ্বীন ও নৈতিকতা সব ভুলে যায়। তারপর যখন তাদের ভোটের খরিদ্দারগণ ক্ষমতার মসনদে বসে ভোটদাতা জনগণের রক্ত নিংড়াতে শুরু করে, তখন এরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের কোনও খতিয়ান নেয় না, উল্টো সরকারের সমালোচনা করার বাহানায় রাষ্ট্রের জন্য অন্য কোনও সূর্যের পূজারি বনে যায়। এতদিন পর্যন্ত তো অন্ততপক্ষে এ কথা বলারও অবকাশ ছিল যে, ২৩ সালের মেয়াদকালে এমন কোনও নির্বাচন হয়নি, যাতে দেশের সমস্ত জনগণ স্বাধীনভাবে নিজ রায় ব্যবহারের সুযোগ পাবে। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনটি যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন আর জনগণের এ কথা বলারও কোনও সুযোগ থাকবে না। এরপর যে-কোনও সরকার ক্ষমতায় আসবে, তার যাবতীয় কাজকর্ম সঙ্গতভাবে তাদের সাথেই সম্বন্ধযুক্ত হবে এবং তার দায়-দায়িত্ব তাদের উপরেই বর্তাবে। যদি সরকার ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়, ইসলামের উপর কাঁচি চালায়, গরীব জনগণের অধিকার পদদলিত করে এবং দেশ ও জাতির রক্ত শোষণ করে, তবে অন্ততপক্ষে বহির্বিশ্বে এ কথাই মনে করা হবে যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এটাই চায় এবং এই গোটা জাতিই চারিত্রিক অবক্ষয়ের স্বীকার। তাদের জাতীয় অহংবোধ, সামষ্টিক চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে কিছু বাকি নেই।

অন্যদিকে জনগণ যদি এ পর্যায়ে নিজ দায়িত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করে এবং সকল প্রলোভন ও রক্তচক্ষুকে পদদলিত করে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সামগ্রিক চেতনার সাথে ভোট প্রয়োগ করে, তবে আগামী সরকার ২৩ বছরের সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকার করত পর্যায়ক্রমে অতীতের সব কলঙ্কচিহ্ন ধুয়ে

ফেলতে পারবে। এ অবস্থায় বহির্বিশ্বের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই জাতি স্বাধীনতার মূল্য বোঝে এবং তার যথার্থ ব্যবহার জানে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমগ্র বিশ্বকে নিজ কর্মকাণ্ড দ্বারা এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম না হব যে, আমরা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অধিকারী এবং দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাদেরকে সেই দ্বীন থেকে ফেরাতে সক্ষম নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশ বাইরের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের লক্ষস্থল হয়ে থাকবে। বিশ্ব-শক্তিসমূহ আমাদেরকে একটি বিক্রিপণ্য সাব্যস্তকরত আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের ইজ্জত-সম্মান নিলামে চড়াবে। কিন্তু আমরা একবার যদি আমাদের কর্ম দ্বারা বিশ্ববাসীকে জানান দিয়ে দিতে পারি যে, আমরা দুনিয়ার কোনও প্রলোভনে টলে যাই না, কোনও রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না, কোনও বিপদে দিশা হারাই না, আরাম-আয়েশের লোভে পড়ে মূল্যবোধ বিকিয়ে দিই না এবং কোনও অবস্থাতেই আমরা আমাদের মুখ, কলম ও কদমকে বিশ্বাসের বিপরীতে চালনা করি না, তবে আমাদের বিরূদ্ধে বাইরের সব শক্তি ও ষড়যন্ত্রের জাল ব্যর্থ যেতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে আমরা সর্বদাই নিজ অবস্থানে অবিচল থাকতে পারব। কোনও বহির্শক্তিই আমাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

সুতরাং আগামী মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে, আমজনগণের হাতে সেটি এক দোধারী তরবারি হয়ে আসছে। আমরা চাইলে তা দ্বারা আমাদের দুশমনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজেদের শান্তি ও স্বস্তির ব্যবস্থা করে নিতে পারি আবার চাইলে এ তরবারিকেই নিজেদের গলায় চালিয়ে আত্মহত্যাও করতে পারি।

অতীতের নোংড়া রাজনীতি নির্বাচন ও ভোট শব্দদ্বয়কে এমনই কলঙ্কিত করেছে যে, এখন ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, ঘুষ, দাগাবাজি ইত্যাদি শব্দগুলো এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। শব্দদু'টি উচ্চারণ মাত্রই অপরিহার্যভাবে এসব বিশেষণও সামনে এসে যায়। এ কারণেই এখন আকছার শরীফ লোক এর ধারেকাছে যাওয়াকেও পসন্দ করে না। নিজেদেরকে যথাসম্ভব এর থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। এমনকি এই ভুল ধারণাও এখন ব্যাপক হয়ে গেছে যে, দ্বীনের সাথে নির্বাচন ও ভোটের রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটা দ্বীন-বহির্ভূত জিনিস। এ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে এখন আরও অনেক ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার অপনোদনও জরুরি।

স্বভাবগত ভদ্রতার কারণে সহজ-সরল লোকদের স্তরে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আজকের রাজনীতি প্রতারণারই নামান্তর। এই ভুল ধারণার উৎস বিশেষ মন্দ না হলেও এর পরিণাম অত্যন্ত খারাপ। কেননা তারা মনে করছে রাজনীতি যেহেতু প্রতারণার নামান্তর, তাই কোনও ভদ্রলোকের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ উচিত নয়। তারা নির্বাচনে তো দাঁড়াবেই না, এমনকি ভোট দেওয়ার ঝামেলা থেকেও দূরে থাকবে।

এই ভুল ধারণা যতই না কেন সদুদ্দেশ্য প্রসূত হোক, সর্বাবস্থায়ই এটা গলদই বটে। দেশ ও জাতির পক্ষে এ ধারণা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে কোনও সন্দেহই নেই যে, অতীতে স্বার্থান্বেষী মহলের হাতে পড়ে আমাদের রাজনীতি ময়লা-আবর্জনার এক স্তুপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সাধু-সজ্জন কিসিমের একদল লোক একে পাক-পবিত্র করার জন্য অগ্রগামী না হবে, ততক্ষণ এর মলিনতা ও কদর্যতা বাড়বে বৈ কমবে না। অবশেষে একদিন এই অপবিত্রতা তাদের নিজেদের ঘরের মধ্যেও পৌঁছে যাবে। সুতরাং ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই নয় যে, দূর থেকে রাজনীতির নিন্দা-সমালোচনা করা হবে আর একে পরিশুদ্ধ করার কোনও চেষ্টা করা হবে না; বরং বুদ্ধিমত্তার দাবি হল, রাজনীতির ময়দানকে ওই সকল লোকদের হাত থেকে কেড়ে আনার চেষ্টা করা, যারা উপর্যুপরি একে কলঙ্কিত করে চলছে।

আগামী মাসের নির্বাচন ব্যবস্থাপনাগত কয়েকটি নীতি পরিবর্তনের জন্যই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে না; বরং এটা সারাদেশের জন্য একটা পরিবর্তনের মাইলফলক। এর দ্বারা দেশ ও জাতির ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। এ নির্বাচনে পরস্পরবিরোধী দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিপরীতধর্মী দু'টি জীবনব্যবস্থার মধ্যে লড়াই হবে। একটি দাবি হল–

"পাকিস্তান কেবল একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল, এর স্বতন্ত্র কোনও মতবাদ নেই। এ জগতে মানুষের ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার রাজত্ব চলছে। মানুষের ইচ্ছা ও বিবেকই ভালো-মন্দের ফয়সালা করবে। সময়ের চাহিদা অনুপাতে যখন যেই জীবনব্যবস্থা বুঝে আসবে, সেই মোতাবেকই জীবন ঢেলে সাজানো হবে।"

অন্যটির দাবি হল–

"এ জগতে কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ তা'আলার। রাজত্ব শুধু তাঁরই। ভালো-মন্দের ফয়সালাদাতা তিনিই। তাঁর নামেই পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। এখানে কেবল তাঁর আইনই চলবে। তাঁরই কথা মানা হবে। রাজনীতি ও

অর্থনীতি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে কেবল তাঁর বিধানই অবশ্যপালনীয় হবে।"

এ অবস্থায় যখন ইসলাম ও ধর্মহীনতা এবং পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও ধ্বংসের মধ্যে লড়াই চলছে, তখন কোনও সচেতন ব্যক্তির জন্য নিরপেক্ষ থাকার কোনও সুযোগ নেই। এখন প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য ইসলামী শক্তিসমূহকে সহযোগিতাদানের পিছনে তার সর্বশক্তি ব্যয় করা। এ ক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকাও ঠিক সেরকম অপরাধ, যেমনটা অপরাধ হয় শত্রুকে সাহায্য করলে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلنَّاسُ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ

'মানুষ যদি জালেমকে দেখে জুলুম থেকে ফেরানোর জন্য তার হাত না ধরে, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর ব্যাপক আযাব নাযিল করবেন।'[১২১]

আপনি খোলাচোখে দেখছেন জুলুম হচ্ছে। এখন নির্বাচনে অংশ নিয়ে এই জুলুমকে কোনও না কোনও পর্যায়ে প্রতিহত করার শক্তি আপনার আছে। কাজেই এ হাদীছের আলোকে আপনার কর্তব্য চুপ করে বসে না থেকে জালেমের হাত ধরে ফেলা এবং তাকে জুলুম থেকে ফেরানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। অন্যথায় আশংকা রয়েছে আল্লাহ তা'আলা যে আযাব নাযিল করবেন, তাতে কেবল জালেমই নয়, আমাদের সকলকেই আক্রান্ত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

অনেক দ্বীনদার লোক এমন আছে, যারা মনে করে– আমরা যদি ভোট না দিই তাতে ক্ষতি কী? কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। ক্ষতি অবশ্যই আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী ইরশাদ করেন শুনুন। হযরত সাহ্ল ইবন হুনায়ফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন–

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهٗ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّنْصُرَهٗ اَذَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১২১. তিরমিযী, হাদীছ নং ২০৯৪; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৭৫; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩৯৯৫; আহমাদ, হাদীছ নং ১

'যার সামনে কোনও মু'মিন ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা হয় আর সাহায্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তার সাহায্য করে না, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।'[১২২]

শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে ভোট সাক্ষ্যদানের মর্যাদা রাখে। মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যেমন হারাম ও অবৈধ, তেমনি প্রয়োজনীয় স্থানে সাক্ষ্য গোপন করাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

অর্থ : 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপি। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।'[১২৩]

হাদীছ শরীফেও সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠিন অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তার কঠোর নিন্দা জানানো হয়েছে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّوْرِ

'যাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয় আর সে তা গোপন করে, সে ওই ব্যক্তির মত যে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়।'[১২৪]

ইসলামে সত্যসাক্ষ্য দেওয়া যেমন অত্যন্ত পসন্দনীয় কাজ, তেমনি সাক্ষ্য গোপন করা চরম গর্হিত। বস্তুত সাক্ষ্য দেওয়া ব্যাক্তির নৈতিক কর্তব্য। তাই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করার আগেই সাক্ষ্য দিতে যাওয়া একটি পসন্দনীয় কাজ। ইসলাম এটা পসন্দ করে। কেননা নৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য সে অন্যের ডাক ও উৎসাহ দানের অপেক্ষায় থাকবে কেন? হযরত যায়েদ ইবন খালিদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ اَلَّذِيْ يَأْتِيْ شَهَادَتَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّسْأَلَهَا

---

১২২. আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৪১৬

১২৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩

১২৪. আল-মু'জামুল-আওসাত ৯খণ্ড, ৩৭০পৃ., হাদীছ নং ৪৩১৮; মাজমা'উয-যাওয়াইদ ৪খণ্ড, ২৩৪ পৃ., হাদীছ নং ৭০৩৮; মুসনাদুশ-শামিয়্যীন ৪ খণ্ড, ৩২৯পৃ., হাদীছ নং ৩৪৬২

'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী কে? যে ব্যক্তি নিজ সাক্ষ্য আদায় করে তলবের আগেই।'[১২৫]

ভোট নিঃসন্দেহে এক সাক্ষ্য। কুরআন-সুন্নাহ'র এসব বিধান তার জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং ভোট দেওয়া হতে বিরত থাকা দ্বীনদারীর দাবি নয়; বরং তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করা প্রত্যেক মুসলিমের ফরয। এটাও চিন্তা করার বিষয় যে, শরীফ, দ্বীনদার ও বিচক্ষণ ব্যাক্তিবর্গ যদি নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়কে পাশকাটিয়ে চলে এবং এ বিষয়ে কোনও রকমের ভূমিকা রাখা হতে বিরত থাকে, তবে তার অর্থ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এই সম্পূর্ণ ময়দানটিকে দুর্নীতিবাজ, বেদ্বীন ও দুষ্ট লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কিছুতেই আশা করা যায় না রাষ্ট্রক্ষমতা কখনও নেককার ও সুযোগ্য লোকদের হাতে আসবে। দ্বীনদার মহল যদি রাজনীতি থেকে এতটাই সম্পর্করহিত হয়ে থাকে, তবে দেশের দ্বীনী ও আখলাকী অবক্ষয়ের কোনও অভিযোগ করার অধিকার তাদের থাকে না; বরং অভিযোগ করা তাদের পক্ষে শোভাই পায় না। কেননা সে ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সব দায়-দায়িত্ব তো তাদের উপরই বর্তায় এবং ক্ষমতাসীনদের সব রকমের ভালো-মন্দ কাজের যিম্মাদারী তাদের ঘারেই চাপে। ক্ষমতাসীনদের দ্বারা যত রকমের অন্যায়-অপরাধ হবে এবং দ্বীন ও নীতি-নৈতিকতার যে ক্ষতি তাদের দ্বারা সাধিত হবে, রাজনীতিকে পাশকাটিয়ে চলা ভদ্রলোকগণও তার জন্য সমান দায়ী হবে এবং তাদের অনিষ্টকারিতা ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিজেরা তো নিরাপদ থাকতে পারবেই না, তাদের পরবর্তী বংশধরগণও তার শিকার হয়ে যাবে। যেই ফিতনা ও অমঙ্গলের উপর বাঁধ বাঁধার কোনও চেষ্টা তারা করেনি, তার আগ্রাসন থেকে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম কিভাবেই বা নিরাপদ থাকতে পারে?

নির্বাচন প্রসঙ্গে আরও একটি ভুল ধারণা আছে। সেটি প্রথমোক্ত ভুল ধারণা অপেক্ষাও গুরুতর। লোকে যেহেতু দ্বীনকে কেবল নামায-রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে নিয়েছ, তাই রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে তারা দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরে নিয়ে ভাবছে এসব বিষয় দ্বীনের অনুশাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, এর উপরে দ্বীনের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে না। তাই অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায, রোযা, ওজীফা ইত্যাদি পালনে যথেষ্ট যত্নবান,

---

১২৫. মুসলিম, হাদীছ নং ৩২৪৪; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২১৯; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩১২২; আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৪২৫; মালিক, হাদীছ নং ১২০৭

কিন্তু বেচাকেনার ব্যাপারে তারা হালাল-হারামের কোনও চিন্তা করে না, বিবাহ-শাদীতে বৈধাবৈধের কোনও ফিকির তাদের থাকে না এবং আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়েও দ্বীনী বিধানের কোনও পরওয়া তারা করে না।

এ শ্রেণীর লোক নির্বাচনকেও কেবলই একটা পার্থিব বিষয় মনে করে, তাই এতে সব রকমের অনৈতিকতাকে তারা প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এতে যে কোনও রকমের গুনাহ হচ্ছে, তা তারা চিন্তাও করে না। এ বিষয়ে কোনও রকমের অন্যায় আচরণকে তারা পাপ মনে করে না। ফলে এ শ্রেণীর বহু লোকই ভোটদানের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না। কেবলই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যে-কোনও অযোগ্য লোককেও তারা ভোট দিয়ে দেয়। যাকে ভোট দেওয়া হচ্ছে সে যে নিতান্তই অযোগ্য তা ভালোভাবেই জানে। এ কথাও জানে যে, তারচে' যোগ্য লোক অনেক আছে। এমন প্রার্থীও আছে, যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যিকারেরই যোগ্যতা রাখে। কিন্তু কেবলই আত্মীয়তা বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক অথবা বাহ্যিক কোনও ভদ্রতার লেহাজ করে ভুল জায়গায় ভোট দিয়ে দেয় আর এভাবে অযোগ্য লোককে ক্ষমতার মসনদে পৌছার সুযোগ করে দেয়। কখনও চিন্তাও করে না শরী'আত ও দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কত বড় অপরাধ করছে এবং কী কঠিন গুনাহ নিজ আমলনামায় লেখাচ্ছে। একটু আগেই আরয করেছি ভোট এক সাক্ষ্য আর সাক্ষ্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

অর্থ : 'এবং যখন কোনও কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয়।'[১২৬]

যখন কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের মন ও বিবেক-বুদ্ধির ফয়সালা এই হয় যে, সে ভোট পাওয়ার উপযুক্ত নয় কিংবা অন্য প্রার্থী তার তুলনায় বেশি যোগ্যতা রাখে, তখন কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তাকে ভোট দিয়ে দেওয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ারই নামান্তর আর মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। ইসলামে এর কঠোর নিন্দা জানানো হয়েছে। এটা এমনই ন্যাক্কারজনক কাজ যে, কুরআন মাজীদে একে মূর্তিপূজার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

---

১২৬. সূরা আন'আম, আয়াত ১৫২

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

অর্থ : 'তোমরা পরিহার কর নাপাকি তথা প্রতীমাদের এবং পরিহার কর মিথ্যাবলা।'[১২৭]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীছে মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার কদর্যতা তুলে ধরেছেন। তিনি যেসকল বিষয়কে মহাপাপের শীর্ষে উল্লেখ করেছেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াও তার একটি। এ বিষয়ে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবূ বাকরা (রাযি.) বলেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন– আমি কি তোমাদেরকে সবচে' বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলব না? তা হচ্ছে– আল্লাহর সংগে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা আর খুব ভালোভাবে শুনে রেখ– মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা। হযরত আবূ বাকরা (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়েই বসা ছিলেন। যখন মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টা আসল, সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন 'মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া'। তিনি কথাটির এতবেশি পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, একপর্যায়ে আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, আহা, তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন![১২৮]

এসব সতর্কবাণী তো ভোটের ওই অপপ্রয়োগ সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়, যা কেবলই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে দেওয়া হয়ে থাকে, টাকা-পয়সার কোনও কারবার থাকে না। পক্ষান্তরে যে ভোটে টাকা-পয়সার কারবারও থাকে অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তো ডবল মহাপাপ। একটি মহাপাপ মিথ্যাসাক্ষ্য দানের, আরেকটি ঘুষ খাওয়ার।

ভোট কেবল দুনিয়াবী বিষয় নয়

সুতরাং বোঝা গেল ভোট দেওয়াটা কেবল দুনিয়াবী বিষয় নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, এর সম্পর্ক কেবলই পার্থিব ব্যবস্থাপনার সাথে, দ্বীনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বস্তুত দ্বীনের সঙ্গে রয়েছে এর গভীর সম্পর্ক। মনে রাখতে হবে আখিরাতে প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেখানে প্রতিটি কাজের জবাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে এই ভোট দেওয়ার

---

১২৭. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩০

১২৮. বুখারী, হাদীছ নং ২৪৬০; মুসলিম, হাদীছ নং ১২৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮২৩

ব্যাপারেও। এই সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটাকে কিভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল, এতে কতটুকু বিশ্বস্ততা রক্ষা করা হয়েছিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন। তখন যাতে উত্তর সঠিক দেওয়া যায় তাই এখনই এর প্রয়োগে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে।

কেউ কেউ মনে করে যদি অনুপযুক্ত লোককে ভোট দিলে গুনাহ হয়, তবে সেটা নতুন আর কি। আমরা তো কোনও পাকসাফ লোক নই যে, কখনও কোনও গুনাহ করি না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত থাকি। অনুপযুক্ত লোককে ভোট দিলে গুনাহের সেই দীর্ঘ তালিকায় নতুন একটা বাড়বে, এর বেশি কিছু তো নয়!

বিষয়টাকে এত লঘু দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে এটাও শয়তানের একটা বিরাট চাল, তার অনেক বড় ধোঁকা। মানুষ যদি প্রতিটি গুনাহ করার সময় এরকম চিন্তা করে, তবে তো সে কোনও গুনাহই ছাড়তে পারবে না, অবলীলায় সব গুনাহই করে যাবে। গুনাহ তো এক রকম নাপাকি। শরীরে যদি সামান্য একটু নাপাকিও লাগে, তবে তা নিয়ে তো কেউ বে-ফিকির থাকে না; সংগে সংগেই পরিষ্কার করে ফেলার চিন্তা করা হয়। এমন তো নয় যে, শরীরে একটু নাপাকি লাগল বলে তা সাফ করা হবে না; বরং আরও বেশি নাপাকির গর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত গুনাহের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। এক গুনাহের সঙ্গে আরেক গুনাহের প্রভেদ আছে। যেই পাপের অশুভ পরিণাম গোটা জাতিকে ভুগতে হয়, তার ব্যাপারটা ব্যক্তিগত গুনাহের অপেক্ষা অনেক গুরুতর। ব্যক্তিগত পর্যায়ের গুনাহ যত কদর্য ও যত কঠিনই হোক, তার কুফল দু'-চারজন লোকের বেশিকে ভুগতে হয় না। ফলে তার প্রতিকারও কঠিন হয় না। যারা যারা তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের প্রতিকারের বিষয়টা আয়ত্তের মধ্যেই থাকে। তা থেকে তাওবা-ইস্তিগফার করাও সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে তা মাফ হয়ে যাওয়ার আশাও সর্বদা করা যায়। পক্ষান্তরে যে পাপের পরিণাম সমগ্র দেশ ও জাতিকে ভোগ করতে হয়, যার খেসারত দিতে হয় সকলকেই, তার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব? মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব হয় না। একবার এই তীর ধনুক থেকে বের হয়ে গেলে কখনওই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। বড়ই সংগীন ব্যাপার। এই দুষ্কর্ম থেকে তাওবা করলে ভবিষ্যতের ব্যাপারে তো সতর্ক থাকা যায়, কিন্তু অতীতে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন, ফলে তার শাস্তি থেকে নাজাত পাওয়ার আশাও বড় কম থাকে।

ভোটের অপপ্রয়োগ গুরুতর গুনাহ

বস্তুত ভুল জায়গায় ভোট দেওয়া অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। চুরি করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং আরও যত কঠিন কঠিন গুনাহ আছে, ভোটের অপপ্রয়োগ সে সবগুলোর চেয়ে গুরুতর। এর সাথে অন্য কোনও পাপকর্মকে তুলনা করা যায় না। এ কথা সত্য যে, আমরা সকাল-সন্ধ্যা নানা রকম গুনাহ করে থাকি। কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ গুনাহই এমন, তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে যা মাফ হয়ে যায় আর তাতে যে ক্ষতি হয় তার প্রতিকারও সম্ভব। সেরকম হাজারও গুনাহ করছি বলে এমন একটি গুনাহতেও বিলক্ষণ জড়িয়ে যাব, যার প্রতিকার সম্ভব নয় এবং যার মাফ হয়ে যাওয়াও সহজ নয়, এটা কোনও বুদ্ধির কথা নয়। গুনাহ যেমনই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর অন্যায় ভোট দেওয়ার গুনাহ যেহেতু সর্বাপেক্ষা কঠিন, তাই এ ব্যাপারে তো আরও বেশি সতর্কতা জরুরি।

অনেকে চিন্তা করে, লাখও ভোটের বিপরীতে আমার একার একটা ভোটের কী গুরুত্ব আছে? যদি এই একটা ভোট ভুল জায়গায় দেওয়া হয়ও, তাতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কতটুকু প্রভাবিত হবে? এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কেননা প্রথমত প্রত্যেকেই যদি ভোট দেওয়ার সময় এই একই চিন্তা করে, তবে তো সারাদেশের একটা ভোটও সঠিকভাবে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে ভোট গণনার যে নিয়ম চালু আছে, তাতে একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তির ভোটও দেশ ও জাতির পক্ষে মীমাংসাকারী সাব্যস্ত হতে পারে। একজন বেদ্বীন, চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ প্রার্থীর বাক্সে যদি মাত্র একটা ভোটও অন্যদের চেয়ে বেশি চলে যায়, তবে সেই একটা ভোটের ফলে সে জয়যুক্ত হবে এবং গোটা জাতির উপর সে চেপে বসবে। এভাবে কখনও কখনও একজন অজ্ঞ, অশিক্ষিত ব্যক্তির মামুলি উদাসীনতা ও ভুলচুক বা অবিশ্বস্ততাও গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং চলতি নিয়মে প্রতিটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির শর'ঈ, নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব– সে নিজের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকবে এবং যথাযথ চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বস্ততার সাথে সে তার এই অধিকার প্রয়োগ করবে।

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ১৩-২১পৃ.

মুসলিম জাতীয়তার ধারণা ও সরকারের কর্মপন্থা

পাকিস্তান দুনিয়ার একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রাষ্ট্র। যার প্রতিষ্ঠা দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হয়নি। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে। দৃষ্টিভঙ্গীটি হল– ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলিমগণ একটি পৃথক জাতীয়তার ধারক, নিজের দ্বীন ও ঈমান-আকীদা মোতাবেক জীবনযাপনের জন্য তার একটি পৃথক রাষ্ট্র দরকার। দ্বীনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার শ্লোগান এমন এক যুগে ধ্বনিত হয়েছিল, যখন সারাবিশ্বে ভৌগলিক জাতীয়তার (Nationalism) আধিপত্য চলছিল। তাই একদিকে যেমন বিশ্ববাসীর দ্বারা এ দাবী মানানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, তেমনি অন্যদিকে এরচে' আরও বেশি প্রয়োজন ছিল মুসলমানদের জন্য এরূপ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জিত হয়ে যাওয়ার পর এ রাষ্ট্রটিকে এমনভাবে গড়ে তোলার মেহনতে লিপ্ত হওয়া, যাতে এর প্রতিটি ইটে মুসলিম জাতীয়তার চেতনা সিঞ্চিত ও গ্রথিত থাকে।

কিন্তু আফসোসের কথা হল, ঈমানের উত্তাপধারীগণ প্রথম স্তরটি তো অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন এ রাষ্ট্রটির নির্মাণ ও গঠনের পর্যায় আসল তখন তারা ভুলে গেল যে, আমরা কোথা থেকে চলতে শুরু করেছিলাম, কেন চলছিলাম এবং এ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল।

মুসলিম জাতীয়তার এ চিন্তাধারা কেবল পাকিস্তান গঠনের জন্যই জরুরি ছিল না; বরং এ রাষ্ট্রটির উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্যও অপরিহার্য ছিল। যুগের হাওয়া যেহেতু সাধারণভাবে ভৌগলিক জাতীয়তার চিন্তাধারায় প্রভাবিত ও পরাভূত ছিল এবং মানুষজন মুসলিম জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ছিল অপরিচিত, তাই এ রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমনকিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপের দরকার ছিল, যা এই চিন্তাধারাকে চিন্তা-ভাবনার আঁতুড়ঘর থেকে বের করে বাস্তবকাজের জ্যান্ত-জাগ্রত ভূবনে নিয়ে আসবে এবং মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে থাকা ভৌগলিক জাতীয়তার ইন্দ্রজালকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

এটা তো এমনি-এমনিই হয়ে যাওয়ার ছিল না; এর জন্য দরকার ছিল এ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন জারি করা, ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো, মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামী মনোভাব চাড়িয়ে দেওয়া, আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ জাহেলী মানসিকতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, ইসলামী ঐক্য, সংহতি ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে রাষ্ট্রের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে দেওয়া, সর্বপ্রকার বিভক্তির মানসিকতাপ্রসূত অন্যায় আচরণকে নির্মূল করে ফেলা এবং সারাদেশে এমন আবহ তৈরি করে ফেলা, যাতে এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের মন-মানসিকতায় এই বোধ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সে মুসলিম উম্মাহ'র একজন সদস্য এবং এ দেশের প্রতিটি নাগরিক যে অধিকার রাখে আর যে দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তায়, তার নিজ দায়িত্ব ও অধিকারও তার সমতুল্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল পাকিস্তান গঠনের পর এই তালিকার একটি কাজও করা হয়নি। না করার পিছনে যেসব কারণ ছিল তার মধ্যে একটা সম্ভবত এই যে, এসব কাজের গুরুত্ব মানুষের মন-মানসিকতায় ঠিক অতটুকু ছিল না, যতটুকু ছিল পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে। আরেক কারণ এই হয়ে থাকবে যে, যারা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে সরাসরি ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যারা এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছিলেন, দিয়েছিলেন সব রকমের কুরবানী, তারা এক-এক করে ইহলোক থেকে খুব শীঘ্রই বিদায় নিয়ে যান। অতঃপর যাদের হাতে পাকিস্তানের বাগডোর এসে যায়, তারা এ রাষ্ট্র গঠনের চেতনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচিত ছিল না, যেই চেতনা ও উদ্দেশ্য এ রাষ্ট্র গঠনে ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ করেছিল।

যাহোক বাস্তবে এটাই ঘটল যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী কেবল একটা বায়বীয় শ্লোগান হয়ে থাকল, যে শ্লোগান কেবল নিজ অন্যায়-অনাচারকে আড়াল করার জন্য পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে। নয়ত বাস্তবজগতে ও কাজেকর্মে এর দাবি অনুযায়ী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি; বরং পদে পদে এর দাবিসমূহকে পদদলিত করা হয়েছে। মুখে তো বলা হতে থাকে এ রাষ্ট্রটি ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কার্যত একটি একটি করে ইসলামী মূল্যবোধকে সকল ক্ষেত্র থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দাবি তো করা হয়েছে এই যে, সকল মুসলিম মিলে একজাতি, সিন্ধী-পাঞ্জাবী, পাঠান-বাঙালী ও বালুচের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু কার্যত প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে; বরং

প্রাদেশিক অহংবোধের ছত্রচ্ছায়ায় দেশ পরিচালনা করা হয়েছে। এর পরিণাম যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে। মুসলিম জাতীয়তার চেতনা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। মানুষ মনে করতে থাকে এ চিন্তাধারাটি কেবল ধোঁকা দেওয়ার জন্যই অবলম্বন করা হয়েছিল। পরিশেষে সারাজগতে যে ভৌগলিক জাতীয়তা প্রচলিত ছিল, এখানেও সেটাই সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। এমনকি সেই ধারণা এক পর্যায়ে দেশের অর্ধাংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানের পরাজয়ের পর আমাদের হুঁশ আসা দরকার ছিল। উচিত ছিল সচেতন হয়ে যাওয়ার। এখন পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশকে রক্ষা করার উপায় কেবল এটাই ছিল যে, মুসলিম জাতীয়তার সেই চেতনাকে পুনর্জীবিত করা হবে, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আমাদের ক্ষমতাসীন মহল সম্ভবত এখনও এটাই মনে করে বসে আছে যে, এই চেতনা কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারাই পুনর্জীবন লাভ করবে এবং এই চেতনার বিপরীতে যে সকল প্রাদেশিক চক্রান্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তা কেবল কারাগারে নিক্ষেপ দ্বারাই নির্মূল হয়ে যাবে। অথচ প্রাদেশিকতার হাতে এমন মার খাওয়ার পর এরূপ ভাবনা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ আত্মপ্রবঞ্চনা নিঃসন্দেহে চরম হতাশাকর। আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার আত্মাভিমান সারাদেশে আজ চরম আকার ধারণ করেছে। এর ভিত্তিতে আজ যে আন্দোলন বিভিন্ন এলাকায় চলছে তা এমনই এক তাত্ত্বিক আন্দোলন, যা অত্যন্ত চালাকী ও ধূর্ততার সাথে মানুষের মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বছরের পর বছর কাজ করা হয়েছে, এর জন্য নিত্য-নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে এবং এই গরল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এমন এমন গুপ্তপথ সন্ধান করা হয়েছে, যা দ্বারা এই বিষ অবচেতনভাবে মানুষের মন-মানসিকতাকে প্রভাবিত করতে থাকে। পরিশেষে এই আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, এর প্রবক্তাগণ কোনও রকম রাখঢাক রাখছে না; বরং খোলামেলাভাবেই আঞ্চলিকতার তাবলিগ করে যাচ্ছে এবং জোরেসোরে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার প্রচারণা চালাতে পারছে।

সুতরাং এই শয়তানী আন্দোলনকে চূর্ণ করার জন্য কেবল বায়বীয় বক্তৃতা-বিবৃতি যথেষ্ট নয় কিংবা দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়,এর জন্য জোশ ও হুঁশের সমন্বয়ে প্রাজ্ঞোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন জরুরি। দরকার এমন এক সুচিন্তিত কর্মকৌশল, যা আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতাকেই নির্মূল

করবে না; বরং তার পরিবর্তে মুসলিম জাতীয়তাকে এক ব্যবহারিক বাস্তবতারূপে পেশ করবে।

এর জন্য আইন ও অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ জরুরি। এ দেশে ইসলামকে যথার্থরূপে প্রয়োগ করুন। প্রতিটি এলাকায় ইসলামী শিক্ষাকে আকর্ষণীয় নমুনা বানিয়ে দিন। অন্তরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা জাগ্রত করুন। ইসলামের জন্য বাঁচা-মরার প্রেরণা সঞ্চার করুন। শিক্ষাব্যবস্থা সংশোধন করে তার ভেতর থেকে আঞ্চলিকতার বিষাক্ত উপাদান অপসারিত করুন। প্রচারমাধ্যমসমূহকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম না বানিয়ে ইসলামী চিন্তা-চেতনা গঠনের কাজে ব্যবহার করুন। সব রকমের বেইনসাফীকে খতম করে ফেলুন। অশ্লীলতা, নগ্নতা ও ইসলামবিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করুন। ঘরে-ঘরে ইসলামী সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দান করুন। বিশ্বাস রাখুন আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িকতার এসব আন্দোলন সর্বদা আল্লাহ-বিস্মৃতিও বদ্দ্বীনীর নষ্ট-ভ্রষ্ট পরিবেশেই পরিপুষ্টতা লাভ করে। যেদিন আপনারা নিজ দেশকে এই আবর্জনা থেকে পবিত্র করতে পারবেন, সেদিন সিন্ধুদেশ, স্বাধীন বেলুচিস্তান ও পাখ্‌তুনিস্তানের এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই পবিত্র লক্ষের দিকে নিষ্ঠার সাথে আপনারা কদম না বাড়াবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল ঐক্য ও সম্প্রীতির একদেশদর্শী ও সুমধুর নসীহত কোনও কাজে আসবে না।

পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি আশংকাবোধ যে কারণে হয় তা এই যে, যারা দিবা-রাত্র পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য কাঁদে এবং মুসলিম জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করে বেড়ায়, আজও পর্যন্ত তাদের নজর এই জরুরি কাজের দিকে ধাবিত হয়নি। এ নিয়ে তারা ভাবছে না এবং এর প্রতি তাদের কোনও মনোযোগই নেই; বরং আমাদের ক্ষমতাসীন মহলও দিন দিন এমনসব কাজ করছে ও এমন এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার দ্বারা সচেতন বা অবচেতনভাবে মুসলিম জাতীয়তার ধারণা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং তার বিপরীতে আঞ্চলিকতার ভূত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হল– অনেক অনেক পদক্ষেপ এমন নেওয়া হচ্ছে, যে সম্পর্কে ফয়সালা করা কঠিন যে, তা কি সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া, না ওইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নীলনকশা তৈরিকারীদের পক্ষ থেকে, যারা মুসলিম জাতীয়তার ধারণায় আঘাত হানার কাজে ব্যস্ত। সুতরাং

প্রাদেশিকতা-পূজারীর কর্মকুশলীগণকে যখন চার জাতীয়তার শ্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে, তখন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চার সংস্কৃতির ধারণাকে হাওয়া দেওয়া হচ্ছে। 'সিন্ধ শতাব্দিকালের দর্পণে' এই শিরোনামে সিন্ধু-সভ্যতা ও সিন্ধু-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব অনুষ্ঠান সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সম্পর্কে কি কেউ এ ধারণা করতে পারে যে, যে সরকার দিবা-রাত্র জাতীয় ঐক্য ও মুসলিম জাতীয়তার সবক প্রচার করে তার পক্ষ থেকে এসব হচ্ছে? কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য যে, এসব অনুষ্ঠান যথারীতি সরকারি ছত্রচ্ছায়ায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে এমনসব চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করা হচ্ছে, যা আমাদের সকলের জন্য চরম লজ্জাজনক।

এ ব্যাপারে আমাদের কোনওই আপত্তি নেই যে, প্রত্যেক এলাকার বাসিন্দাগণ তাদের নিজেদের রীতি-নীতি অনুযায়ী (ইসলামী বিধান মোতাবেক) জীবনযাপন করুক এবং নিজেদের ধরন-ধারণকে সংরক্ষণও করুক। কিন্তু এটা কি কথা যে, তাদের সেই ধরন-ধারণকে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তার ভিত্তিরূপে পেশ করা হবে এবং তাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হবে যে, তা দ্বীন ও আকীদা-বিশ্বাসের রজ্জু ছিন্ন করে কোনও রাজনৈতিক ঐক্যের রূপ ধারণ করবে এবং আপন-পরের মধ্যে ভেদরেখার কাজ করবে?

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। মোয়েঞ্জোদাড়ো, হড়প্পা, টেকসিলা, তাখ্তবালী ও কোটডিজি- এর প্রাচীন নিদর্শনসমূহ জ্ঞানতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে অনেক অনেক গুরুত্ব রাখে আর সে কারণেই এগুলোর সংরক্ষণ দূষণীয় নয়। কিন্তু যখন এসব ধ্বংসাবশেষকে পাকিস্তানীদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং একে সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তখন তো এর দ্বারা মুসলিম জাতীয়তার ওই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কঠিন আঘাত হানা হয়, যা কিনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে পাকিস্তান ও পাকিস্তানীদের সাথে ওইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের এছাড়া আর কী সম্পর্ক থাকতে পারে যে, যখন উপমহাদেশ ভাগ করা হয় তখন এসব ধ্বংসাবশেষ আমাদের অংশে পড়ে গিয়েছিল? কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আমাদের সরকারসমূহের পক্ষ থেকে সর্বদাই প্রাচীন সভ্যতার এসব ধ্বংসাবশেষকে নিজেদের ইতিহাসের স্মারক হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকসমূহে পর্যন্ত এমন ভঙ্গীতে এসবের আলোচনা করা হয়ে থাকে, যেন এগুলো আমাদের জাতীয় ও

ধর্মীয় পবিত্রতাবাহী কোনও কিছু। আশ্চর্য লাগে যে, আমাদের শাসকবর্গ কখনও চিন্তাই করেনি যে, এই কর্মপন্থা দ্বারা কী মানসিকতা তৈরি হতে পারে এবং সে মানসিকতা তৈরি করে আমরা মুসলিম জাতীয়তার সে ধারণাকে কিভাবে রক্ষা করতে পারি, যা কিনা পাকিস্তানের ঐক্য ও নিরাপত্তার মূলমন্ত্র?

যাহোক আমাদের আজকের নিবেদনের সারকথা হল– আমাদের ক্ষমতাসীন মহল যদি আন্তরিকভাবেই চায় যে, পাকিস্তান কায়েম থাকুক এবং প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িকতার স্বীকার হয়ে নতুন নতুন ভাগ-বাটোয়ারার আশংকা থেকে মুক্ত থাকুক, তবে তার জন্য পাকিস্তানের ঐক্য সম্পর্কে কেবল মৌখিক ওয়াজ-নসিহতই যথেষ্ট হবে না এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু নেতাদের কারারুদ্ধ করার দ্বারাও এ লক্ষ অর্জন হতে পারে না। অবস্থা এখন এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, এ কাজের জন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, আন্তরিকতা ও কর্মপ্রেরণার দরকার। এ রোগের চিকিৎসা যদি কোনওকিছু দ্বারা হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা হতে পারে কেবল মুসলিম জাতীয়তার ধারণাকে নিজেদের কর্মকাণ্ডে রূপায়িত করার দ্বারা, যার জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কার্যকর করার দিকে এখনই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সেই সংগে এমনসব দৃষ্টিভঙ্গীর অবসানও জরুরি, যা দ্বারা আমাদের সম্পর্ক ইসলামের পরিবর্তে প্রাচীন কুফ্‌রী সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমতাসীন মহলকে বিশুদ্ধ চিন্তা দান করুন এবং তাওফীক দান করুন যাতে তারা এই নাজুক সময়ে দেশ ও জাতির জন্য সঠিক ও ফলপ্রসূ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারে– আমীন।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী

তারিখ– ১৪ রবিউছ-ছানী, ১৩৯৫ হি.

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ৩৫-৩৯পৃ.

দেশপ্রেম ও জাত্যভিমান

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ যে ভূখণ্ডকে তার দেশ মনে করে, তাকে সে বিশেষভাবে ভালোবাসে। সে ভূখণ্ডের প্রতি তার মনের বিশেষ টান থাকাটা নিঃসন্দেহে মানুষের স্বভাবগত চাহিদা। এ চাহিদাকে কোনও অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যায় না। এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার যে, মানুষ যে জায়গায় জন্ম নেয়, যেখানে তার দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা পরিপুষ্টতা পায়, যেখানে সে তার শৈশবের স্বপ্ন এবং যৌবনের উন্মাদনা উপভোগ করে, যেখানে প্রথমবারের মত জীবনের বহুবিচিত্র রূপ তার সামনে ধরা দেয় সেই জায়গার প্রতি তার মনে এক বিশেষ আসক্তি গড়ে ওঠে। মানুষ সেই ভূখণ্ডকে, সেখানকার বাসিন্দাদেরকে, সেখানকার ভাষাকে, সেখানকার গাছ, বৃক্ষ ও তরুলতাকে এমনকি সেখানকার মাঠঘাট ও রাস্তাঘাটকে পর্যন্ত সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। এমন লোক খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর, যার অন্তরে এই ভালোবাসা নেই।

দেশপ্রেম যদি এই সীমারেখার ভেতর থাকে, তবে তো এতে দোষের কিছু নেই। ইসলামও এই সহজাত ভালোবাসার ভেতর কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। হাদীছ শরীফে আছে, মদীনা মুনাওয়ারাকে দেশরূপে গ্রহণ করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনও সফর থেকে ফিরে আসতেন এবং দূর থেকে উহুদ পাহাড়ের প্রতি তাঁর নজর পড়ত, তখন বলে উঠতেন–

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

'এটা সেই পাহাড়, যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।'[১২৯]

কিন্তু এই ভালোবাসা যদি তার যৌক্তিক সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলে, ফলে মানুষ দেশের প্রতিটি বস্তুকে আপন এবং বাইরের প্রতিটি বস্তুকে পর

---

১২৯. বুখারী, হাদীছ নং ২৬৭৫; মুসলিম, হাদীছ নং ২৪২৮; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৮৫৭

মনে করে, তখন তাকেই বলা হয় জাত্যভিমান ও সাম্প্রদায়িকতা। ইসলাম একে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে। অর্থাৎ ইসলাম দেশের প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসাকে তো মূল্যায়ন করে, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে সামষ্টিক ঐক্যের ভিত্তি সাব্যস্ত করা, তাকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কিংবা ভালোবাসা ও ঘৃণার মাপকাঠি বানানো ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গর্হিত কাজ। এর ভিত্তিতে কিছুতেই উত্তম-অধমের পার্থক্য করা যায় না এবং হক-নাহক বা ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা করা যায় না। উদাহরণত আপনি যদি দেশের বাইরে কোথাও অবস্থান করেন এবং সেখানে নিজ দেশের কোনও লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায় তখন এটা একটা সহজাত ব্যাপার যে, তাকে দেখে আপনি খুশি হবেন, তার সাথে কথাবার্তা বলে এবং দেশের অবস্থাদি জেনে আনন্দবোধ করবেন। এটা দেশের প্রতি আপনার সহজাত ভালোবাসার ফল। এতটুকু বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। কিন্তু পরের দিন আপনার সেই স্বদেশী লোকটি স্থানীয় কোনও ব্যক্তির সাথে যদি বিবাদে লিপ্ত হয় এবং আপনি ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা ছাড়াই কেবল স্বদেশী হওয়ার সুবাদে তার সমর্থন করেন, তবে এটা নিরেট জাত্যভিমান ও সাম্প্রদায়িকতা। ইসলাম কোনওক্রমেই তার অনুমোদন করে না। এমনিভাবে আপনি আপনার স্বদেশী কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় উঁচু কোনও পদে অধিষ্ঠিত দেখে আনন্দিত হয়ে থাকেন। এটা দেশের প্রতি আপনার সহজাত ভালোবাসার ফল। এর উপর ইসলাম কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না। পক্ষান্তরে কেবল এই ভিত্তিতে যদি আপনি কোনও সরকারের অসহযোগিতা করেন যে, তার বাগডোর আপনার নিজ অঞ্চলের কোনও ব্যক্তির হাতে নয় কিংবা আপনি যদি কোনও ব্যক্তিকে কেবল এই কারণে সরকারি কোনও পদ দিতে চান যে, সে আপনার অঞ্চলের একজন অধিবাসী অথচ সেই পদের জন্য অন্য এলাকার কোনও ব্যক্তি তারচে' আরও বেশি যোগ্যতা রাখে, কিন্তু অন্য এলাকার হওয়ার কারণে সেই পদটি আপনি তাকে দিতে না চান, তবে এটা এক অন্ধ আঞ্চলিকতা। ইসলাম একে কোনওরূপ বৈধতা দেয় না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾

অর্থ : 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি,

যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।'[১৩০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দেশ ও ভাষা এবং বংশ ও গোত্র সম্মান-অসম্মানের মাপকাঠি নয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে বিভিন্ন বংশ ও গোত্র এবং ভাষা ও ভূখণ্ডে বিভক্ত করে দিয়েছেন এর উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, এর দ্বারা মানুষ একে অন্যকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে। পারস্পরিক পরিচয়লাভ ছাড়া এর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। এর দ্বারা কারও মর্যাদাবান হওয়া বা মর্যাদাহীন হওয়া নির্ণয় করা যায় না এবং এর ভিত্তিতে কাউকে উঁচু বা নিচু মনে করারও কোনও অবকাশ নেই। মানুষের ইজ্জত-সম্মান এর উপরে আদৌ নির্ভর করে না। মর্যাদা ও হীনতা এবং বড়ত্ব ও ক্ষুদ্রতার সম্পর্ক কেবলই মানুষের ব্যক্তিগত আমল ও গুণাবলীর সঙ্গে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় পায় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ বেশি মেনে চলে, প্রকৃতপক্ষে সেই বেশি মর্যাদাবান, তাতে সে যে বর্ণ ও যে গোত্রেরই লোক হোক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবহেলা করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোনও মর্যাদা নেই, তাতে সে যে বর্ণ ও যে ভাষারই লোক হোক এবং যেই গোত্র ও যেই অঞ্চলের সাথেই সম্পর্ক রাখুক।

আঞ্চলিকতা ও জাত্যাভিমানের মেজায কুরআন মাজীদের এই শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জাত্যাভিমানের দৃষ্টিতে অন্য গোত্র বা অন্য অঞ্চলের লোক একজন অতিথি হিসেবে সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহারের অধিকার রাখে, কিন্তু তাই বলে তাকে আপন মনে করা যাবে না কিছুতেই, সে জ্ঞান-গরিমায় যত উচ্চস্থানেই হোক না কেন, তার আখলাক-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা যত ভালোই হোক না কেন, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতায় যত অসাধারণই হোক না কেন, জাত্যভিমান তাকে কিছুতেই এই অধিকার দিতে প্রস্তুত নয় যে, সে তার দেশ ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে থেকে তাদেরচে' বেশি ইজ্জত-সম্মান লাভ করবে এবং জীবনচলার পথে তাদের দিশারী হবে কিংবা অন্য কোনওভাবে সে তাদের উপরে কোনও রকম কর্তৃত্ব করবে।

এটাই সেই জাহেলী আসাবিয়্যাত, যার বিরুদ্ধে ইসলাম প্রথম দিন থেকেই জিহাদ করেছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

১৩০. সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩

নিজের কথা ও কাজ দ্বারা সর্বদা এই অমানবিক ভাবাবেগকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর এ চেষ্টায় এতটাই সফলতা অর্জন করেছিলেন যে, আরবের বাসিন্দাগণ একদিকে হাবশার বেলাল (রাযি.), রোমের সুহায়ব (রাযি.) ও পারস্যের সালমান (রাযি.)-কে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আলিঙ্গন করে নিয়েছে, অন্যদিকে নিজ দেশ ও সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছে। তারা কার্যত এ কথার ঘোষণা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু সে আমাদের আপনার- তাতে সে যে দেশ ও যে সম্প্রদায়েরই লোক হোক, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন তার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই- তাতে রক্ত-মাংসের দিক থেকে সে আমাদের যতই নিকটাত্মীয় হোক।

মক্কা বিজয়কালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন-

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِالْاٰبَاءِ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জাহেলী যুগের মিথ্যা অহমিকা থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং বাপ-দাদা নিয়ে বড়াই করার রীতি খতম করে দিয়েছেন।'[১৩১]

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক আরব সাহাবীগণের সমাবেশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ بَنِيْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوٰى أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِيْ مَوْضُوْعٌ

'হে মানুষ! তোমাদের সকলের প্রতিপালক এক আল্লাহ। তোমাদের সকলের পিতাও একজন। তোমরা সকলেই আদম (আঃ)-এর সন্তান। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন মাটির সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশি মুত্তাকী। কোনও 'আজমীর উপর কোনও 'আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তবে তাকওয়ার ব্যাপারটা ভিন্ন। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতে যে-কেউ অন্যের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। কান খুলে শোন! জাহিলিয়্যাতের সকল রসম-রেওয়াজ আমার পদতলে পিষ্ট।'[১৩২]

---

১৩১. তিরমিযী, হাদীছ নং ৩১৯৩
১৩২. আহমাদ, হাদীছ নং ২২৩৯১

কুরআন-সুন্নাহ'র এই সুস্পষ্ট নির্দেশনার পর এ কথা কল্পনা করাও কঠিন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উপর বিশ্বাস রাখে এমন কোনও মুসলিম তার মন-মস্তিষ্কে জাহিলিয়্যাতের সেই মিথ্যা অহমিকাকে স্থান দিতে পারে, যাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ের নিচে পিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই জানেন আমাদের ভাগ্যে আরও কত ঘনঘোর ভ্রষ্টতা রয়েছে। আজ কুরআন ও সুন্নাহ'র নামধারীগণও চরম নির্লজ্জতার সাথে জাহিলিয়্যাতের ওই পুঁতিগন্ধময় নিদর্শনকে পুনর্জীবন দান করছে। আসাবিয়্যাতের ওই মানবতাবিধ্বংসী প্রতিমা , যার একেকটিকে ইসলাম ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, আজ ইসলামের প্রবক্তাগণই সেই প্রতিমাসমূহ পুনরায় স্থাপিত করছে। যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, তারাই কিনা আজ পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে ওইসব প্রতিমা বুকে আঁকড়ে ধরছে! এই কিছুকাল আগেও আমাদের কিছু ভাইয়ের প্রতি অভিযোগ ছিল যে, তারা নিজেদেরকে ফির'আউনের বংশধর বলে গর্ববোধ করছে। অথচ সেই পাপীচোখের এ দৃশ্যও দেখার ছিল যে, যেই রাষ্ট্রটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইসলামের নামে, সেই রাষ্ট্রের বাসিন্দাগণ ঢাকের আওয়াজে বলে বেড়াবে- রাজা দাহির আমাদের হিরো এবং মুহাম্মাদ বিন কাসেম ছিল একজন দস্যু!

আজকাল সাবেক সিন্ধু প্রদেশে 'জয় সিন্ধু' নামে যে আন্দোলন চলছে, তা যদি কেবল দেশের প্রতি সহজাত ভালোবাসার সীমারেখায় হয়ে থাকে আর 'জয় সিন্ধু' শ্লোগানের অর্থ হয়ে থাকে কেবলই দু'আ, তবে আমরা হাজারবার ওই শ্লোগানের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করব এবং তা করতে পারাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য করব। আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করি– আল্লাহ তা'আলা এই ভূখণ্ডকে রক্ষা করুন, কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন, ফলে, ফুলে ও সমৃদ্ধিতে ভরে রাখুন। কিন্তু যখন এই শ্লোগানের পিছনে কোনও রকমের আসাবিয়্যাত সক্রিয় থাকবে এবং কার্যকর থাকে এমন জাত্যভিমান, যা মুহাম্মাদ বিন কাসেমের মত মানবতার পক্ষে গৌরবজনক এক সিপাহসালারকে ঘৃণা করা এবং রাজা দাহিরের মত মানবতার পক্ষে লজ্জাজনক এক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ভালোবাসার সবক দান করে, তবে আমাদের পক্ষে কিভাবে এ কথা বিশ্বাস করে নেওয়া সম্ভব যে, এই আন্দোলন বিন্দুমাত্র যৌক্তিক বুনিয়াদের উপর স্থাপিত?

একটা সময় ছিল, যখন স্বয়ং রাজা দাহিরের স্বধর্মীয়গণ মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে নিজেদের হিরো সাব্যস্তকরত তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার ফুল বর্ষণ

করত এবং তার ঘামের স্থানে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করতে পারাকে সৌভাগ্য গণ্য করত। অথচ এই আকাশ-বাতাস দেখছে সেই মুহাম্মাদ বিন কাসেমের স্বধর্মীয়রা আজ তাকে একজন দস্যু সাব্যস্তকরত রাজা দাহিরের কবরে ফুল নিবেদন করছে।

তাদের এই মানবতাবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে মুহাম্মাদ বিন কাসেমের ইজ্জত-সম্মান কণামাত্রহ্রাস পাবে না। যে যাই বলুক না কেন, তার বলার দ্বারা বিশ্ব-ইতিহাসের এই কৃতী সন্তানের গায়ে একটু আঁচড় পড়বে না। বিশ্বজগতে ন্যায় ও সত্য শব্দের যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে মানবতার হৃদয়মন এই নির্দোষ, নিখুঁত ও ঈর্ষনীয় বীরের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই শ্লোগানদাতারা নিজেদের দেশ, নিজেদের ভূখণ্ড ও নিজ জাতির প্রতি কী রকমের ইনসাফ করছে? সিন্ধের এই ভূখণ্ড অতীতকালে জ্ঞান-গরিমা এবং দ্বীন ও ঈমানের অবিস্মরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। এর ইতিহাস জ্ঞান-গরিমা ও তাকওয়া-পরহেযগারীর মহান সব ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সেইসব ব্যক্তিত্বের কারণে এই অঞ্চলটিকে সারা মুসলিম জাহানে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আজ যারা রাজা দাহিরকে নিজেদের হিরো গণ্য করে, তারা কি চায় ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব মনে করে নিক সিন্ধুর এই স্বর্ণগর্ভা ভূখণ্ডটি পুনরায় রাজা দাহিরের ভক্ত-অনুরক্তদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে? এবং এখন এখানে মুহাম্মাদ বিন কাসেমের কোনও বন্ধু নেই; বরং এখানে তার শত্রুগণই বসবাস করছে? আল্লাহ না করুন তাদের এই আন্দোলনের ফলে যদি এ জাতীয় ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে কি মুসলিমবিশ্বে মুসলিমদের এই প্রিয় অঞ্চলটির বিন্দুমাত্র ইজ্জত-সম্মান বাকি থাকবে? মুসলিম জাহান তো দূরের কথা, আমাদের বিশ্বাস এই শ্লোগান দুনিয়ার যেখানেই পৌছাবে সেখানে যদি ন্যায়-ইনসাফের কোনও ছায়া পড়ে থাকে, তবে এই শ্লোগানকে কেবল নিন্দা-ধিক্কারই জানানো হবে। এটাই কি সেই ন্যায়-ইনসাফের আচরণ, যা তারা সিন্ধুর প্রতি করতে চাচ্ছে?

বস্তুত আঞ্চলিক জাত্যভিমানমূলক এসব শ্লোগান, তা জয় সিন্ধরূপে হোক বা পাখ্‌তুনিস্তানরূপে, কখনওই এর উপযুক্ত নয় যে, সে সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হবে কিংবা তার খণ্ডনে দলীল-প্রমাণ পেশ করা হবে। তারপরও এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হচ্ছে এজন্য যে, আমাদের এ যুগের যুবকেরা বড়ই মজলুম। নানা রকম শ্রুতিমধুর শ্লোগানের ডামাডোলে

তাদেরকে মারাত্মকভাবে দিশেহারা করে ফেলা হয়েছে। কোনও শ্লোগানের ভেতরে যদি কিছু আকর্ষণও থাকে, তবে তার ধ্বংসক্রিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে প্রদত্ত শিক্ষা বিশেষ উপকারে আসে না। আঞ্চলিক জাত্যাভিমানের আন্দোলনও যেহেতু দেশপ্রেমের নামেই উঠেছে, তাই অনেক সরলপ্রাণ যুবক দুর্দান্ত উদ্দীপনায় এই আন্দোলনে শামিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে তাদেরকে এমনকিছু শিক্ষাও দেওয়া হয়নি যে, তারা ঠাণ্ডা মাথায় এই আন্দোলনের পরিণাম সম্পর্কে ভাবতে পারবে।

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশের জনৈকা ছাত্রীর একটি চিঠি পড়ুন। চিঠিটি দৈনিক 'হুররিয়্যাত' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। পত্রলেখিকা এ আন্দোলনের সমর্থন করতে গিয়ে লেখেন–

"রাজা দাহির একজন সিন্ধী ছিলেন, তাতে তিনি হিন্দু হোন বা মুসলিম। তিনি আমাদের একজন হিরো। সময় আসলে প্রমাণ হবে আমরা সিন্ধুর অধিবাসীগণ মুহাম্মাদ বিন কাসেমের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে থাকি। শাহ লতীফকে সালাম দেই। সালাম দেই জি.এম সায়্যিদকেও। সিন্ধুর মহিমা ইসলামে নয়, এ মহিমা মহেঞ্জোদাড়োর কারণে। লাখও ইসলাম এর প্রতি কুরবান হয়ে যাক। আমাদের শ্লোগান হল 'জয় সিন্ধ'। আমরা মেয়েরা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি– আমাদের বাচ্চাদের নাম রাখব দাহির, হিমু, ইয়াজ, হোসো প্রমুখের নামে।"[১৩৩]

আরেকজন পত্রলেখিকার বক্তব্য হল–

"ওই ইসলাম ও পাকিস্তান, যা আমাদের নিকট থেকে আমাদের সিন্ধু ও সিন্ধী ভাষা কেড়ে নিয়েছে, এরূপ ইসলাম ও পাকিস্তানকে আমরা আমাদের নিকৃষ্টতম শত্রু মনে করি। এ কথা মিথ্যা যে, সিন্ধু কেবল ইসলাম ও ইসলামী দর্শনের কারণে মহিমান্বিত হয়েছে। সিন্ধুর মহিমা সিন্ধুর সরলপ্রাণ বীর জনগণের কারণে, মহেঞ্জোদাড়ো ও কোটডিজোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং লতীফ সাচাল, ইয়াজ ও জি.এম সায়্যিদের মত কবি-সাহিত্যিকদের কারণে এবং সিন্ধুর মহিমা তার নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারণে।"

এসব চিঠি পড়ে আপনার যতটা ইচ্ছা আক্ষেপ প্রকাশ করুন এবং এর লেখকদেরকে যত চান নিন্দনীয় উপাধীতে স্মরণ করুন। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন এর জন্য মূল দায়ী কে? মূল দায়ী কি ওই পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা নয়,

---

১৩৩. হুররিয়্যাত ম্যাগাজিন, ১৮ নভেম্বর ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ

যার ভার আজও পর্যন্ত আমরা আমাদের তরুণদের মাথায় চাপিয়ে রেখেছি? আজ তারা যে মন-মানসিকতা লালন করছে, আমাদের দৃষ্টিতে এর জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি দায় ওই শিক্ষার উপরই বর্তায়, যা আমাদের তরুণদের আজও দেওয়া হচ্ছে এবং যার বর্তমানে ইসলামী মন-মানসিকতা গ্রহণের সকল দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ হয়ে আছে। ইসলামিয়্যাতের ঘন্টায় ইসলামের গৌরব-মাহাত্ম্য সম্পর্কিত কিছু শূন্যগর্ভ শব্দ তাদেরকে শোনানো হয় বটে এবং তারাও তা মৌখিকভাবে জপে থাকে, কিন্তু অন্যান্য ঘন্টাসমূহে তাদের শিরা-উপশিরায় পাশ্চাত্যের যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রবাহিত করে দেওয়া হয়, তার বিপরীতে এই শূন্যগর্ভ শব্দমালা বিশেষ কোনও কাজ দেয় না। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী তো এমনই, যার আলোকে মানুষের জন্মভূমি তার আকীদা-বিশ্বাস অপেক্ষাও বড় কিছু। আপনি যদি ঠাণ্ডা মাথায় বর্তমান পাঠসূচি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, তবে তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জাতীয়তা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা বিরাজমান দেখতে পাবেন। এ অবস্থা যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন আঞ্চলিকতা ও জাত্যাভিমানের কোনও শ্লোগানে বিস্ময়বোধ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মন-মানসিকতাকে আসাবিয়্যাতের বিষাক্ত জীবাণু থেকে মুক্ত করার উপায় একটাই– তা হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে ঢেলে সাজানো। বর্তমান পাঠ্যসূচি পুনর্বিবেচনা করে তার ভেতর জাতীয়তার ওই ধ্যান-ধারণা সঞ্চার করে দেওয়া বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা বড় দাবি, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক জাত্যভিমান যে এভাবে ফুলে-ফেঁপে বৃহদাকার ধারণ করেছে, তার দ্বিতীয় কারণ আমাদের একটি মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা। আমরা এ যাবতকাল মহেঞ্জোদাড়ো, কোটডিজি, হড়প্পা, টেকসিলা ও তাখতবায়ীকে আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলরূপে প্রচার করে আসছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন এর পিছনে কি আমাদের সরলপ্রাণ মানসিকতাই কাজ করেছে, নাকি এর পিছনে বিশেষ কোনও চক্রান্ত সক্রিয় রয়েছে। তা না হলে কেন আমরা এভাবে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে পাকিস্তানি সভ্যতার উৎস মনে করছি? এবং কেনই বা সাধারণভাবে আমরা ভক্তি-শ্রদ্ধার সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করছি? আমাদের সে ভক্তি-শ্রদ্ধা লক্ষ করলে অনুমিত হয়, যেন এগুলোই আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরব-মহিমার আসল কারণ এবং এগুলোই আমাদের অতীত ঐতিহ্যের স্মারক। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করে দেখুন এই ধারণার কি কোনও বস্তুনিষ্ঠতা আছে? এর গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে

কোনও রকমের যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করানো যায়? ওই মহেঞ্জোদাড়ো ও টেকসিলার খালেস অনৈসলামিক সভ্যতার সাথে আমাদের কোনও রকমের সম্পর্ক কি আছে? কিসের ভিত্তিতে আমরা ওইসব সভ্যতাকে নিজেদের সভ্যতা বলে দাবি করছি? তা কি কেবল এ কারণে যে, যখন উপমহাদেশ ভাগ হয় তখন এসব ধ্বংসাবশেষ আমাদের অংশে পড়ে গিয়েছিল? যদি এই চিন্তাধারা অবলম্বন করা হয়, তবে জয় সিন্ধু, পাখতুনিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনও মেনে নেওয়া উচিত। এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে সে ক্ষেত্রে আমাদের কোনও আপত্তি তোলার অধিকার থাকে না।

এটা আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম যে, এখনও পর্যন্ত ওইসব আঞ্চলিক জাত্যাভিমানের আন্দোলন বিশেষ বিশেষ মহলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এর বিরোধী। সাবেক সিন্ধুর জনৈক ব্যক্তি রাজা দাহিরের নাম যত ভক্তির সংগেই নিক না কেন, এ অঞ্চলের নেককার লোকজন এবং ইসলামের নামে আত্মোৎসর্গকারী জনতা ওইসব পুঁতিগন্ধময় শ্লোগানকে ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। গেল রমজানেই সিন্ধের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিমগণ ইসলামের 'দ্বারোন্মোচন দিবস' পালনের মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, তা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, সিন্ধের আমজনগণ তাদের ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে পরিপূর্ণ প্রস্তুত।

কিন্তু যে সকল চোরাপথ ধরে আঞ্চলিকতা ও জাত্যাভিমানের এই মানসিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এখনও যদি সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া না হয় এবং ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করা না হয়, তবে মনে রাখবেন একদিন আসাবিয়্যাতের এই ভাবাবেগ পূর্ণশক্তি সহকারে আমাদের ঐক্য-সম্প্রীতির উপরে আঘাত হানবে। আজ কেবল রাজা দাহিরকেই হিরো বলা হচ্ছে, কাল রঞ্জিত সিংহ ও মহারাজা ভাউকে মহানায়ক বলা হবে। অতঃপর কেবল মুহাম্মাদ বিন কাসেমই নয়; সুলতান মাহমূদ গজনবী, সম্রাট জহিরুদ্দীন বাবর ও আহমাদ শাহ আবদালীও লুটেরা-দস্যু সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতঃপর আশ্চর্য নয় যে, কোনও নরাধম ইবলীস ও শয়তানকে নিজের নায়ক সাব্যস্ত করে হযরত আদম (আঃ)-কে একজন লুটেরা বলে দেবে। না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক।

আমসাধারণের মধ্যে এ জাতীয় ঘৃণ্য মানসিকতা সৃষ্টির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওই ক্ষোভ, যা কোনও কোনও সংগত অভিযোগ থেকে জন্ম

নিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের মত সাবেক সিন্ধুরও কিছু সমস্যা আছে। সম্ভবত সেসব সমস্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছু বেশিই। সরকারের কর্তব্য সেসব সমস্যার সমাধান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা। এজন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা যেতে পারে। অন্ততপক্ষে ওইসমস্ত লোককে আশ্বস্ত করার ব্যবস্থা নিতে হবে, যারা তাদের সংগত অভিযোগের ভিত্তিতে 'জয় সিন্ধ' আন্দোলনে শামিল হতে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিশেষে আমরা ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করব যে, এই অঞ্চলের সমস্যাসমূহ আপনস্থানে বিবেচনার দাবি রাখে– এ কথা নিঃসন্দেহে সঠিক, কিন্তু তার ভিত্তিতে জাত্যাভিমানের উসকানিমূলক শ্লোগান দেওয়াটা কোনও সদুদ্দেশ্যের পরিচয় বহন করে না। এসব শ্লোগান কখনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সমাধানের পরিবর্তে এর দ্বারা সমস্যা আরও জটিল রূপ ধারণ করবে এবং এর পরিণাম গোটা জাতির জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়াবে।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ৪১-৪৯পৃ.

প্রাদেশিক জাত্যভিমান : কারণ ও প্রতিকার

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী– যখনই কোনও বহির্শক্তি মুসলিমশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বদা মুসলিমদের ভেতর অঞ্চল ও ভাষাগত জাত্যভিমানকে হাওয়া দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বর্ণ ও বংশগত ফিতনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি আমাদেরকে আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হয়েছে। আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানকে হারানোর বেদনায় জর্জরিত হতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের শত্রুগণ আমাদের উপর ওই অস্ত্রই পরীক্ষা করেছে। আমাদের নিজেদের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা, নির্বুদ্ধিতা ও অবহেলার কারণে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব আজ ঝুঁকির সম্মুখীন। কোথায় ওই পাকিস্তানী জাতি, যারা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার পতাকা নিয়ে সামনে চলেছিল! আর কোথায় এই পাকিস্তানী জাতি, যারা আজ নিজেরা টুকরা টুকরা হয়ে নিজেদের লাঞ্ছনা ও হীনতার জন্য বিলাপ করছে!

আমাদের শত্রু মনে করছে এটা এই জাতিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এর সামষ্টিক অস্তিত্বের উপর আরও দু'-একটি আঘাত হানতে পারলে এ জাতি থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে, যে জাতিটি কিনা আমাদের ভবিষ্যত আশা-আকাঙক্ষা পূরণের পথে অন্তরায় হতে পারত। এজন্যই তারা পাকিস্তানের অবশিষ্ট চার প্রদেশেও ওই আঞ্চলিক জাত্যভিমান ও ভাষাগত বিদ্বেষে উসকানি দিচ্ছে এবং সুপরিকল্পিত নীলনকশার অধীনে মুসলিমদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে দেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

শত্রুগণ জানে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরাসরি জাত্যাভিমানের নামে মুসলিমদেরকে হাতিয়ার বানানো অত্যন্ত কঠিন, তাই তাদের কর্মপন্থা সর্বদা এই হয়ে থাকে যে, তারা পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে, যাতে মুসলিমগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা নিজেরাই মুসলিমদের এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীর উপরে জুলুম করায়। অতঃপর নিজেরাই মজলুমদেরকে

তাদের অধিকার আদায়ের নামে জুলুমের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়। যখন একবার এই বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন আর তা সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

আমাদের দেশেও এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আজ আমরা বিভিন্ন প্রদেশে জাত্যাভিমানের যে আন্দোলনকে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখছি, তা মূলত এসব অঞ্চলের জনগণের প্রকৃত মানসিকতা ও সহজাত ভাবাবেগ কিছুতেই নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে সারা জগত খোলা চোখে দেখেছে এখানকার জনগণ মুহাজিরদেরকে কতটা উদারতা, কতটা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহাস্য মুখে স্বাগত জানিয়েছিল। দীর্ঘকাল যাবত পারস্পরিক এই ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ আবহ বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন এলাকার মুসলিমগণ পরস্পর আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। স্থানীয় ও বহিরাগত সূত্র ধরে পরস্পরে কখনও কলহে লিপ্ত হয়নি।

পাকিস্তানের শত্রুশক্তির চোখে মুসলিমদের এই ঐক্য ও সম্প্রীতি সর্বদা কাঁটার মত বিঁধছিল। তারা ক্ষমতাসীন মহলের দ্বারা উপর্যুপরি এমনসব কাজ করিয়েছে, যার ফলে একশ্রেণী নিজেদেরকে মজলুম মনে করতে থাকে। কোনও কোনও প্রদেশকে উঁচু সরকারি পদ ও সামরিক চাকরি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। কোনও কোনও এলাকার বড় বড় জায়গির অন্য এলাকার মালদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, যেখানে স্থানীয়দের একটা বড় অংশ সামান্য ডাল-রুটির জন্য কাতরাচ্ছিল। কোনও কোনও এলাকায় অন্য এলাকার এমন পক্ষপাতদুষ্ট হঠকারি প্রশাসক চাপিয়ে দেওয়া হয়, যারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে অস্পৃশ্য শ্রেণীর মত আচরণ করতে থাকে। মোটকথা একশ্রেণীর মধ্যে যখন মজলুম ও নিপীড়িত হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হতে শুরু করল, তখন শাসকমহলের যেই দুষ্ট চক্র মূলত ওই জুলুমের জন্য দায়ি ছিল, তারা স্থানীয় ও বহিরাগত বিরোধের শ্লোগান দিয়ে আসাবিয়্যাতের আগুন উসকে দিল এবং ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক দাবি-দাওয়ার ভেতর অত্যন্ত চুপিসারে গোষ্ঠী ও ভাষাগত সমস্যা জুড়ে দিল। অতঃপর যে আন্দোলন সামনে আসল, তাতে গোষ্ঠী ও ভাষার বিষয়টাই এক নম্বরে চলে আসল, ন্যায় ও ইনসাফের মূল দাবি পিছনে চলে গেল।

এখন এটাকে জনসাধারণের সরলতাই বলুন কিংবা আমাদের কর্মফল যে, জনগণ শত্রুদের চাল সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরিবর্তে যে-কোনও শ্রুতিমধুর শ্লোগানের পিছনে ছুটতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর তারা এটা

উপলব্ধিই করতে পারছে না যে, মূল বিরোধ স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে ছিল না; বরং ব্যাপারটা ছিল ইনসাফ ও জুলুমের এবং বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার। আমাদের মাথার উপর যতদিন আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তামুক্ত শাসকগণ বসে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত জনগণ ন্যায় ও ইনসাফের স্বাদ পাবে না, সেই জনগণ স্থানীয়ই হোক বা বহিরাগত। বস্তুত জুলুম ও বেদ্বীনীর জন্য কোনও স্থান বা কোনও ভাষা নির্দিষ্ট নয়। জালেম ও বেদ্বীন যে এলাকারই হোক এবং যে ভাষায়ই কথা বলুক, সে জালেম ও বেদ্বীনই বটে। তার জুলুম থেকে কোনও এলাকা বা কোনও ভাষাভাষীই নিরাপদ থাকতে পারে না এবং তার পক্ষ হতে কেউ ইনসাফেরও আশা রাখতে পারে না। কাজেই সমস্যাটি কোনও বিশেষ এলাকাবাসীর নয়; বরং জালেম ও বেদ্বীনদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন সকলের জন্যই সমান। এছাড়া আমরা কখনও ন্যায় ও ইনসাফ লাভ করতে পারব না।

মোটকথা জোর-জুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও আল্লাহবিস্মৃতি কোনও জাতি-বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মীর জাফর ও মীর সাদিক সেই নৌকায়ই ছিদ্র করেছে, যে নৌকার তারা আরোহী ছিল। কাজেই ন্যায় ও ইনসাফকে অঞ্চল-এলাকার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যায় না। জনগণ সিন্ধী হোক বা পাঞ্জাবী, পাঠান হোক বা বালুচ, নিজ এলাকার হোক বা বহির্গত, সকলেরই আসল প্রয়োজন আল্লাহবিস্মৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া– যেখানে একজন জালেম আল্লাহভীরুতাকে উপেক্ষা করে অধীনস্ত জনগণের রক্ত শোষণ করে, কিন্তু কেউ তার হাত ধরে তা থেকে নিবৃত্ত করে না, যেখানে জুলুম সয়ে যাওয়া তুলনামূলক সহজ, কারও কাছে সাহায্য চেয়ে তা পাওয়া অনেক কঠিন, যেখানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রত্যাশীর পদে পদে বাধা, কিন্তু জোর-জুলুম করে যে অভ্যস্ত, তার খাহেশ মেটানোর পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, সে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটানোর অবারিত সুযোগ পাচ্ছে, যেখানে সততা ও সুকৃতির পথ সম্পূর্ণ বন্ধ, কিন্তু অন্যায় ও অনাচারের দুয়ার অবারিত। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আল্লাহবিমুখ জীবনব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও এলাকার মানুষ সুখ-শান্তি লাভের আশা করতে পারে না।

সুতরাং আমাদের নিকট সমস্ত সমস্যার স্থায়ী ও সঠিক সমাধান এটাই যে, পাকিস্তানে যথার্থভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা হোক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হোক। রাষ্ট্রের বাগডোর এমনসব লোকের হাতে অর্পণ করা হোক, যাদের অন্তর আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

পিছনের ২৪ বছর দেশের জনগণকে ইসলাম, পাকিস্তানী চেতনা ও জাতীয় ঐক্যের নামে যে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, সে কারণে আজ ইসলামী ঐক্যের কেবল ওয়াজ শুনিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করা ও জাত্যাভিমানের মানসিকতাকে নির্মূল করা খুব কঠিন হয়ে গেছে। অতীতে ইসলামী ঐক্যের নাম নিয়ে যেহেতু জনগণের অধিকার খর্ব করা হয়েছে, তাই আজ ঐক্যের শ্লোগানকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা হয়ে থাকে। আজ খাঁটি মনেও যদি ঐক্যের ডাক দেওয়া হয়, তবে জনগণের মধ্যে তার আছর ফেলা অত্যন্ত কঠিন।

আজ যদি পরিস্থিতি শোধরানোর সঠিক কোনও রাস্তা থাকে তবে আমাদের দৃষ্টিতে সে রাস্তা কেবল এটাই যে, সরকার পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করত নিজের সবটা শক্তি-সামর্থ্য প্রদেশসমূহের অভিযোগসমূহ দূর করার কাজে ব্যয় করবে। সরকারের উচিত নিজ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিটি এলাকার নাগরিকের মনে এ বিশ্বাস জন্মানো যে, তাদের প্রতি সব ব্যাপারে ইনসাফসম্মত ও সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হবে। যেসব প্রশাসক স্থানীয় জনগণের প্রতি জুলুম-নীপিড়ন চালিয়ে গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ সৃষ্টিতে উসকানি দিয়েছে বলে প্রমাণ হয়, তাদের সকলকে বরখাস্ত করতে হবে। সে সঙ্গে এমনসব রাজনৈতিক নেতাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে, যারা সুযোগ বুঝে গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের মৌলিক অভিযোগসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ না করা হবে এবং তাদের অন্তরে ন্যায় ও ইনসাফের বিশ্বাস না জন্মানো হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থান্বেষী মহল গোষ্ঠীপ্রীতির ভাবাবেগে হাওয়া দিতেই থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই দেশ ও জাতির সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মুসলিম সাধারণের আরও একটি কাজে মনোযোগ দিতে হবে। যেসকল এলাকায় আঞ্চলিক জাত্যাভিমানের আন্দোলন দানা বাঁধছে, সেখানকার প্রভাবশালী, বিচক্ষণ ও জনদরদী লোকজন পুরাতন ও নতুন উভয় কিসিমের বাসিন্দাদের সমন্বয়ে এমন একটি কমিটি গঠন করবে, যারা ইতিবাচকভাবে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। উদাহরণত স্বার্থান্বেষী মহল সিন্ধু প্রদেশে অহেতুকভাবে সিন্ধী ও মুহাজিরদের বিবাদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উভয় পক্ষেই এমনকিছু রাজনৈতিক নেতা আছে,

যারা এই কলহের আড়ালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছে। এই কমিটিতে সিন্ধুর উভয় প্রকার লোক থাকবে। তারা ইতিবাচকভাবে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদর্শন করবে। প্রাচীন সিন্ধীদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ হয়েছে, তার প্রতিকারার্থে নতুন সিন্ধীগণ আন্দোলন চালাবে। নতুন সিন্ধীদের যেসব অভিযোগ আছে, তা দূর করার জন্য পুরাতন সিন্ধীদের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হবে। এভাবে সিন্ধুর সকল বাসিন্দা যে একে অন্যের সহমর্মী, একে অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং একে অন্যের সমস্যাবলি যথার্থরূপে অনুভব করে– কাজেকর্মে তার প্রমাণ দিতে হবে।

এভাবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ সেই ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিবেশ ফিরে আসতে পারে, যার নয়নাভিরাম দৃশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যমান ছিল।

আল্লাহ না করুন জাত্যভিমান ও গোষ্ঠীপ্রীতির বর্তমান এই মন-মানসিকতাকে যদি পরিপুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হয় এবং এর রোখথামের জন্য পূর্ণ বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা ও আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালানো না হয়, তবে একদিন হয়ত আমাদেরকে সেই দিনও দেখতে হবে, যখন পাকিস্তানের বাদবাকি অংশের প্রতিটি অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে আর লক্ষ ত্যাগের বিনিময়ে যে রাষ্ট্রটি অস্তিত্বলাভ করেছে, তা ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে পরিণত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সেই পরিণতি থেকে এ দেশকে রক্ষা করুন।

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ৫১-৫৫পৃ.

মুসলিমবিশ্বের মূল ব্যাধি
নিজেদের সরলতাও দেখ এবং দেখ অন্যদের চাতুর্য

বায়তুল মুকাদ্দাসে ইসরাইলের অপবিত্র থাবা বিস্তার ও অন্যায় আগ্রাসনের বর্ষপূর্তি হয়ে গেল। এ সময়কালের ভেতর এমন কোনও উসকানিমূলক কাজ নেই, এই পবিত্র ভূমিতে ওই হিংস্র হায়েনা যা পরখ করে দেখেনি। তারা এখানকার অসহায় মুসলিমদের উপর লোমহর্ষক জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। কুব্বাতুস-সাখরা'র সামনেই চরম নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড করে দেখিয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসের ভেতরে সামরিক কুচকাওয়াজ করে তাদের হিংস্রবৃত্তির নগ্ন প্রদর্শন করেছে। মোটকথা একজন খবিছ চরিত্রের শত্রুর পক্ষ থেকে যা-কিছু আশাংকা করা হয় যায়, তার সবই তারা করেছে। অপরদিকে নিজেদের প্রতি লক্ষ করে দেখুন আমাদের অবস্থা কী। আমরা এখনও পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি যে, এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য রাষ্ট্রনায়কগণের একত্রে বসার প্রয়োজন আছে কি না। এই নির্জীবতারই পরিণাম যে, ইসরাইলের জুলুম-নীপিড়ন উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। এক বছরের এই দীর্ঘ সময়কালে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদমূলক কোনও সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আসছে ৫-ই জুন সারা মুসলিমবিশ্বে প্রতিবাদ দিবস পালনের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। এদিন মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র এই হিংস্রতার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। মিটিং-মিছিল চলবে, বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়া হবে এবং এভাবে ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরূদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তোলা হবে। এতবড় দুর্ঘটনাকে বিলকুল নীরবতার সাথে হজম করা অপেক্ষা অন্ততপক্ষে এতটুকু হলেও তো ভালোই বটে। কিন্তু মূল ঘটনার উপর এর প্রভাব পড়বে কতটুকু? বড়জোর এতটুকুই হবে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের ওই ইমারত-স্থাপনাসমূহ, যা কিনা একদিন সালাউদ্দীন আইয়ুবির মত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন সিপাহীদেরকে এই পুণ্যভূমির মুক্তির জন্য আগুন ও রক্ত নিয়ে খেলতে দেখেছে,৫-ই জুন তা আমাদের গরম গরম কথার দৃশ্য অবলোকন করবে। সন্দেহ নেই গেল বছর আরব রাষ্ট্রসমূহের

কোনও কোনও নেতা ব্যক্তিগতভাবে কিছু চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সেসব প্রচেষ্টার উদাহরণ ঠিক এরকম– যেমন, কোনও এক ব্যক্তির সারাদেহে অসংখ্য ফোঁড়া গজিয়েছে। এ অবস্থায় দরকার তো ছিল তার রক্ত পরিশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া, কিন্তু তার পরিবর্তে সে বহিরঙ্গে মলম লাগিয়ে ফোঁড়াগুলোকে দাবানোর চেষ্টা করেছে। ইসরাইল হল মুসলিমবিশ্বের দেহে গজানো এক বিষফোঁড়া। উপরে উপরে মলম-পাউডার লাগিয়ে কখনও এর চিকিৎসা হতে পারে না। ওষুধের ক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে এ ফোঁড়া দেবে গেলেও পরে শরীরের অন্য কোথাও তা অবশ্যই গজিয়ে উঠবে। কাজেই উপরে মলম লাগিয়ে কিছু হবে না। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, ওই বিষাক্ত জীবাণুটি আসলে কী, যা কখনও ফিলিস্তিনী সমস্যারূপে উদ্‌গত হয়, কখনও কুবরুসে, কখনও কাশ্মীরে এবং কখনও হাবশায় বিষ ছড়ায়। আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে এই বিষাক্ত জীবাণুর সূচনা কোথা থেকে হয়েছিল, কিভাবে আমাদের দেহে এটা ঢুকে পড়ল এবং এর থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী।

কথা যদিও লম্বা, কিন্তু জটিল নয় কিছুতেই। কুরআন মাজীদে আমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۝

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যেই দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে। আমার সাথে কোনও কিছুকেই শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।'[১৩৪]

---

১৩৪. সূরা নূর, আয়াত ৫৫

আমরা যদি ঈমান রাখি যে, এ বিশ্বজগতের খালেক ও মালিক আল্লাহ তা'আলা, তাঁর হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না, দুনিয়ায় যত রকম পরিবর্তন দেখা দেয়, যুগ ও কালের যত পার্শ্বপরিবর্তন ঘটে, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু অদল-বদল হয় সবকিছু তারই হুকুম ও ইচ্ছাক্রমে হয়, এমনিভাবে আমরা যদি বিশ্বাস রাখি কুরআন আল্লাহ পাকের সত্যবাণী, এর কোনও একটি শব্দও ভুল হতে পারে না, তবে আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে আমাদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের এ ওয়াদা কেন পূর্ণ হচ্ছে না। কেন পৃথিবীতে আমরা শক্তিশালী নই? কেন আমাদের ভীতি নিরাপত্তায় বদলে যাচ্ছে না? তবে কি আমাদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের এ ওয়াদা একটা প্রবোধ মাত্র? কখনওই নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা কোনও তামাশার বিষয় হতে পারে না। আপনারা যদি ইনসাফের সংগে চিন্তা করে দেখেন, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা আপনস্থানে অটল। ইসলামী ইতিহাসের সূচনাপর্বে বিশ্বজগত এ ওয়াদার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছে। বস্তুত আল্লাহর ওয়াদা যে সত্য, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আজ যদি আমরা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকি, তবে তার প্রকৃত কারণ আমাদের ঈমান ও আমলের কমতি। এ ওয়াদা পূরণের জন্য কুরআন মাজীদ ঈমান ও আমলকে অপরিহার্য শর্ত সাব্যস্ত করেছে। আপনারা যদি অতীত ইতিহাসের উপর ভাসাভাসা দৃষ্টিও ফেলেন, তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে সময় লাগবে না।

আমাদের সামগ্রিক বিপদের সূচনা মূলত উছমানী খেলাফতের অবসান থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমানে মুসলিমবিশ্বকে যত রকম বিপদ ও মসিবতের উপর দিয়ে চলতে হচ্ছে, তা মূলত শত্রুদের পাতা জালে ফেঁসে যাওয়ারই অপরিহার্য পরিণাম। ইসলামের শত্রুগণ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে আমাদের সামনে জাল পেতে রেখেছিল। আমরা সে জালকে আকর্ষণীয় পোশাক মনে করে গায়ে চড়িয়েছি। এ জাল হল পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার জাল। আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তারা এটা পেতেছিল। লর্ড মেকলের ভাষায়–

“এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাই হয়েছিল এ লক্ষে যে, এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে এমন একটা প্রজন্ম তৈরি করা হবে, যারা বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে ভারতীয় থাকবে বটে, কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার দিক থেকে হবে খাঁটি ইংরেজ।”

বলতে তো বড় চমৎকার কথা যে, মুসলিমগণ সেই জ্ঞানবিদ্যার সাথে পরিচিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ইউরোপে পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে পদ্ধতিতে এ শিক্ষাব্যবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছিল, তা নতুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা আমূল বদলে দিয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরকে নিজ ঘরের জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ ও অন্ধ করে রাখে। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা তাদের অন্তরে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, তাদের কাছে উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য এর কোনও বিকল্প হতে পারে না। তারা অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সংগে এ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে নেয়। এর ফলে তাদের কাছে জীবনের মূল্যবোধই সম্পূর্ণ বদলে যায়। যেই দ্বীনের ভেতরে তাদের সফলতা ও কল্যাণের সবকিছুই নিহিত ছিল, তাদের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। বেশির বেশি তা তাদের পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া এক পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবেই থেকে যায়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।

এই ধ্যান-ধারণা মুসলিমদের ভেতরে যে কুফল বিস্তার করেছে তার তালিকা অতি দীর্ঘ। তার ভেতরে একটা ধ্বংসাত্মক কুফল হল জাতীয়তাবাদের ধারণা, যা শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। ইসলামের শত্রুগণ বার বার পরীক্ষা করে দেখেছে মুসলিমদের ঐক্যই তাদের পথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। এই বাধা অপসারণের জন্য তারা নানারকম চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টারই একটা অংশ হল শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মানসিকতা উসকে দেওয়া। তারা এতটা জোরদারভাবে এই ধারণার পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে, যেন এটা অবলম্বন ছাড়া কোনও ব্যক্তির সভ্য মানুষ হওয়া সম্ভবই নয়। যেসকল তরুণ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে পশ্চিমের যে-কোনও ডাকে লাব্বাইক বলতে প্রস্তুত ছিল, তারা জাতীয়তাবাদের এই ধারণাকে লুফে নেয় এবং নিজ হাতে তারা সেই জালের ফাঁদ তৈরি করে নেয়, যা তাদেরই জন্য বোনা হচ্ছিল।

আরবে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) উত্থান যেভাবে ঘটেছিল তার ইতিহাস পড়ে দেখুন। তাহলে জানতে পারবেন সেখানে এই চিন্তাধারার প্রথম প্রবক্তাগণ সকলেই ছিল ইহুদী ও খৃষ্টান। আধুনিককালের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ফিলিপ কে. হিট্টি নিজ গ্রন্থ 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য'-এর ভেতর লেখেন–

"মৌলিকভাবে তারা সিরিয়া ও লেবাননের খৃষ্টানই ছিল, যারা এই পাশ্চাত্য উদ্ভাবনার (জাতীয়তাবাদ) সাথে সন্ধি স্থাপন করে। তাদের কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ, যারা মিশরে বৃটিশ উপনিবেশকালে অধিকতর

স্বাধীনতার সাথে লেখাজোখা করত, সেই অগ্নিস্ফূলিঙ্গের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীতে ন্যাশনালিজমের আগুনকে লেলিহান করে তোলে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেশপ্রেম, জাতি, জাতির পিতা ইত্যাদি পরিভাষা জন্ম নেয়। তারা মানবাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে কিংবা পুরোনো শব্দকে সংশোধন করে নেয়। এসব দ্বারা তাদের মূল লক্ষ ছিল উছমানী খেলাফতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা। উছমানী খেলাফত থেকে মুক্তিলাভের বিষয়টা মূলত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা পয়দা করার উপর নির্ভরশীল ছিল..."[১৩৫]

তাছাড়া নিকট অতীতের ঐতিহাসিক জর্জ আন্টোনিউস (George Antonius)আরবদের জাগরণ (Arab Awakening) শীর্ষক গ্রন্থে আরও বিশদভাবে লেখেন–

"আরবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয় সুলতান আব্দুল হামীদের সিংহাসন আরোহণের দু' বছর আগে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। যখন পাঁচজন তরুণ, যারা বৈরুতে সিরিয়ান পোর্টেস্ট্যাট কলেজে পড়াশুনা করেছিল, একটি গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তারা সকলেই ছিল খৃষ্টান। তারা সে সংগঠনে মুসলিম ও দ্রুজদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সে অনুযায়ী তারা অল্প দিনের ভেতরই বিভিন্ন ধর্মের প্রায় ২২ জন লোককে মেম্বার বানিয়ে নেয়।"

আরও সামনে গিয়ে জর্জ আন্টোনিউস বলেন– আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে যারা সামনে এগিয়ে নেয়, তাদের মধ্যে দু'জন লোক সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন নাসিফ ইয়াযজী আর দ্বিতীয়জন পিটার্স বুসতানী। তারা উভয়ে লেবাননের খৃষ্টান। বুসতানীই সর্বপ্রথম এ শ্লোগান চালু করে দেয় যে–

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।'

ইতঃপূর্বে আরবগণ এ শ্লোগানের সাথে পরিচিত ছিল না। লেখক বিস্তারিতভাবে জানান– শুরুতে মুসলিমগণ এ আন্দোলনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও এর সাথে একমত হয়ে যায়। জর্জ আন্টোনিউসের ভাষায়–

---

১৩৫. Islam and the west, Newyork, 1962. P. 91

"So it come to pass that the ideas which had originally been sawn by the Christians were nowroughly at the turn of the century finding an inereasingly receptive soil among the Muslim"

'এর ফল দাঁড়াল এই যে, যে চিন্তাধারার বীজ মূলত খৃষ্টানগণ বপন করেছিল, এখন অর্থাৎ চলতি শতাব্দির সূচনাকালে মুসলিমদের মধ্যে তা ভালোভাবে ঠাঁই করে নিল এবং তা উত্তরোত্তর ফল বিস্তার করে চলল।'

এমনিভাবে তুর্কি তরুণদের মধ্যেও ওই শিক্ষার প্রভাবে তুর্কি জাতীয়তাবাদের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এখানেও জাতীয়তাবাদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাদাতা ছিল জনৈক খৃষ্টান। তুরস্কের প্রসিদ্ধ লেখিকা খালেদা এদিব খানম Conflict of east and west in turke গ্রন্থে লেখেন–

"একদিকে তরুণ তুর্কি মুসলিমগণ গণতন্ত্রের শ্লোগান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, অন্যদিকে উছমানী সালতানাতের খৃষ্টান বাসিন্দাগণ ন্যাশনালিজমের প্রচারণায় লিপ্ত হল।" – ৫১পৃষ্ঠা

এভাবে তারা আরব ও তুর্কিদেরকে পরস্পরের বিরূদ্ধে উত্তেজিত করে রণক্ষেত্রে নামিয়ে দিল। তার পরিণাম এই দাঁড়াল– যে মুসলিমবিশ্ব একদা উছমানী খেলাফতের অধীনে একদেহের মত ছিল, তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। অতঃপর ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলোকেও দীর্ঘদিন নিজেদের শাসনাধীন রাখার পর ইসলামের শত্রুগণ নামমাত্র স্বাধীনতা দিয়ে দিল। ইতোমধ্যে যেহেতু আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদের মন-মানস সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে তারা বাস্তবিকপক্ষে চিরদিনের জন্য পাশ্চাত্য-আগ্রাসনের অধীন থেকে গেল। লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) আধুনিক মিশর (Modern Egypt) গ্রন্থে ইংরেজদের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন এবং যথার্থই লেখেন যে,

"ইংল্যান্ড তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অধীন এলাকাসমূহকে যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাধীনতাদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। কেননা এসব দেশে এমন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একটি প্রজন্ম জন্ম নিয়েছিল, যারা ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সংস্কৃতি আত্মস্থ করত এসব রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু–

Under no circimstances would the British Government for a single moment to cerate an independent Islamic State

বৃটিশ সরকার কোনও অবস্থায়ই এক মুহূর্তের জন্যও কোনও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।"

মুসলিম উম্মাহ'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এই জাল, যা কিনা বছরের পর বছরের সাধনা-শ্রমে বিস্তার করা হয়েছিল, পরিশেষে সফলতা লাভ করল। প্রথমত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে আপনা-আপনি দুর্বল হয়ে গেল। উপরন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোগুলোও মন-মানস ও কর্মগতভাবে নিজেদের দ্বীন ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে চলে গেল। এবার পশ্চিমা জাতিসমূহ তাদের দ্বারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত যে-কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক হয়ে গিয়েছিল। তারা যাকে চাইল বাহ্যিকভাবেও নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিল এবং যাকে চাইল নিজেদের স্বার্থানুকূল শর্তমাফিক স্বাধীনতা দান করল অর্থাৎ নামমাত্র স্বাধীনতা এবং তাকে চিরদিনের জন্য এমন কোনও সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করল, যা থেকে তার কখনও বের হয়ে আসার পথ খোলা থাকল না।

এটাই ছিল সেই লক্ষ-উদ্দেশ্য, পশ্চিমা জাতিসমূহের পক্ষে উছমানী খেলাফত বাকি থাকা অবস্থায় যা কখনও অর্জন করা সম্ভব ছিল না। কেননা উছমানী খেলাফত তার অধঃপতনের যুগেও মুসলমানদের জন্য এক সুরক্ষিত দুর্গ স্বরূপ ছিল। তার বর্তমানে কারও পক্ষে তাদের অধিকার আত্মসাৎ করার হিম্মত ছিল না।

ফিলিস্তিনের বিষয়টিই দেখুন। এই এলাকায় তো বছরের পর বছর ইহুদীদের বসত ছিল। এ কারণেই তো বৃটিশ যখন তাদের অভিবাসনের জন্য উগান্ডার একটি এলাকার প্রস্তাবনা পেশ করেছিল, তখন ইহুদীরা তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা সেখানে অভিবাসিত হওয়ার বদলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে থিওডর হার্জলের (Theodore Herzl) নেতৃত্বে উছমানী খেলাফতের খলীফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ দরবারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। তারা তার কাছে আবেদন রাখে– ইহুদীদেরকে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হোক। আরও প্রস্তাব রাখে যে, এ অনুমতি দেওয়া হলে তার বিনিময়ে আমরা তুর্কি সরকারের বহির্দেশীয় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেব।

কিন্তু সুলতান আব্দুল হামীদ তাদের এ আবেদনের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ওই আরব ন্যাশনালিস্টদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যারা তুর্কি খেলাফতকে নিজেদের সবচে' বড় দুশমন গণ্য করে। থিওডর হার্জল তার ডায়েরীতে লেখেন যে, সুলতান আব্দুল হামীদের জবাব ছিল–

"ড. হার্জলকে জানিয়ে দিও তিনি যেন আজকের পর ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়ে যান। ইহুদীগণ ফিলিস্তিনকে কেবল তখনই কবজা করতে পারবে, যখন উছমানী খেলাফত এক অতীত স্বপ্নে পরিণত হয়ে যাবে।"

যেসকল ইহুদী ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখছিল, সুলতান আব্দুল হামীদের এ জবাবে তারা উছমানী খেলাফতের বর্তমানে সে স্বপ্ন পূরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যায়। অবশ্য এ জবাবের পর তারা উছমানী খেলাফতের উপর চরম আঘাত হানার চেষ্টা শুরু করে দেয় এবং পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও তার থেকে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী ও বেদ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করে তারা এ উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়ে যায়। ফলে উছমানী খেলাফত একটি অতীত স্বপ্নে পরিণত হয়ে যায় আর তার পরিণাম ইসরাইল রাষ্ট্ররূপে মূর্তিমান হয়ে ওঠে। আর কেবলই কি ইসরাইল, মুসলিম বিশ্বের আরও যত সংকট তা সব এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয়।

এই দীর্ঘ নিবেদন দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল সকলের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা যে, বাস্তবিকই যদি আমরা এসকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তবে আমাদেরকে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা আনুমানিক দেড়শ' বছর যাবত যে চিন্তা-চেতনা লালন করছি এবং যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে চলছি, আমাদেরকে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের মূল সমস্যা হল 'পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ', যা আমাদের গোটা জীবনদৃষ্টি ও জীবনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে। আমরা ওই অন্ধ অনুকরণের ফলে নিজেদের ঈমান ও আমলে সালেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি, কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুযায়ী যা কিনা আমাদের শক্তি ও শৌর্যের মূল উৎস। এখন আমাদের উদাহরণ হল ওই পথহারা মুসাফিরের মত, যে তার গন্তব্যপথ ভুলে গিয়ে কোনও দুষ্টু ভূতের পাল্লায় পড়ে গেছে। এ যেন সিন্দাবাদের দৈত্য– যা আমাদের কাঁধে চড়ে একটানা আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য চরম ধ্বংস ও চরম অধপতনের পথ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কোনও ধ্বংসগহ্বরে পতিত হওয়ার পর ফের ওই দৈত্যের কাছেই পথ জানতে চাই আর সে ধ্বংসের নতুন কোনও গর্তের ঠিকানা দিয়ে দেয়। পরিতাপের বিষয়, মুসলিমবিশ্বে এখনও পর্যন্ত এই বাস্তবতার অনুভূতি জেগে উঠছে না। গত বছর ইসরাইলের হাতে মার খাওয়ার পর আমাদের

সচেতন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা তা হতে পারিনি। আমাদের প্রথম ক্বিবলা ছিনতাই হয়ে যাওয়া অপেক্ষাও বেশি বেদনাদায়ক ব্যাপার হল আজও পর্যন্ত আমরা ওই দুর্ঘটনা থেকে কোনও শিক্ষা নিতে পারিনি। আমাদের, বিশেষত আরব রাষ্ট্রসমূহের জীবনচাকা যথারীতি ওই একই ঢঙে ঘুরছে। দ্বীনের প্রতি আমাদের উদাসীনতা ঠিক আগের মতই। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এখনও আমাদের অন্তরকে শাসন করে যাচ্ছে। ভোগ-বিলাসিতা যথারীতি আগের মতই চলছে। কৃচ্ছ্রতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার জযবা আগের মতই বহু ক্রোশ দূরে। আল্লাহ ও ইসলামের পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদ ও দেশমাতৃকার শ্লোগান জোরেশোরেই দিয়ে যাচ্ছি। পারস্পরিক অনৈক্য ও আত্মকলহে আমরা আগের মতই টুকরো টুকরো হয়ে আছি।

আমাদের অনুরোধ, ৫-ই জুন জায়নবাদী ইহুদী-হিংস্রতার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে নিজেদের এই অসুস্থ মানসিকতার বিরূদ্ধেও প্রতিবাদ জানান, যা ইহুদীদের মত অভিশপ্ত জাতিকে আমাদের উপর চোখ তুলে তাকানোর সাহস জুগিয়েছে। ইহুদী আগ্রাসনের বিরূদ্ধে প্রস্তাবনা মঞ্জুর করানোর সাথে সাথে ওই আগ্রাসনের বিরূদ্ধেও প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিন, যা ইসরাইলের অপবিত্র বীজ বপনকারীগণ আমাদের মন-মানসিকতায় বিস্তার করে দিয়েছে। ফিলিস্তিনকে বিজাতীয় আধিপত্য থেকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণের সাথে সাথে এ বিষয়েও সংকল্প গ্রহণ করুন যে, নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে বিজাতীয় প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত করে ছাড়ব, যে প্রভাব আমাদেরকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমান এবং নিজেদের সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে এবং যা আমাদেরকে বেদ্বীনী, ইন্দ্রিয়পরবশতা, বিলাস-প্রবণতা ও ঔদাসিন্যের অন্ধকার পথে নিক্ষেপ করেছে, যার পরিণামে আমরা অন্যদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়ে গেছি।

আমরা যতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করার এই বিষাক্ত মানসিকতা নির্মূল করতে সক্ষম না হব, ততদিন পর্যন্ত ইসরাইলের মত বিষফোঁড়া গজাতেই থাকবে এবং সাময়িক কৌশল আমাদের এসব জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

কিছুদিন আগে ফিলিস্তিনের মুফতী আজম রাওয়ালপিণ্ডির এক ভাষণে বলেছিলেন- উছমানী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর মুসলিমবিশ্বের দৃষ্টি এখন পাকিস্তানের দিকে। সারাবিশ্বের মুসলিমগণ এখন পাকিস্তানকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রভূমি মনে করে। কেননা এটাই একমাত্র রাষ্ট্র, যা কেবলই

ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুফতী সাহেবের এ অনুভূতি নিঃসন্দেহে সঠিক। পাকিস্তানের জনগণ ও শাসকবৃন্দের কর্তব্য তারা অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বমুসলিমের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। তাদের কর্তব্য পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে নিজেদের জন্য ইসলামের দেখানো পথ অবলম্বন করবে। এটাই একমাত্র উপায়, যা কেবল পাকিস্তানেরই সাফল্য ও কৃতকার্যতার নিশ্চয়তা দেয় না; বরং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকেও যে চোরাবালিতে সেগুলো আটকে আছে তা থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার গন্তব্যপথে নিয়ে যেতে পারে।

وما علينا الا البلاغ

সূত্র : ইসলাম আওর সিয়াসাতে হাযিরা, ১০৫-১১৩পৃ.

শরী'আতের দৃষ্টিতে জিহাদ

জিহাদ শব্দটি 'বাবে মুফা'আলাঃ'-এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। এর আভিধানিক অর্থ চেষ্টা-পরিশ্রম ও সাধনা-সংগ্রাম করা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর পথে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যে-কোনও রকমের চেষ্টা ও শ্রম-সাধনা করাকে জিহাদ বলা হয়। সে চেষ্টা মুখ দ্বারা হোক, কলম দ্বারা হোক বা অস্ত্র দ্বারা। সুতরাং জিহাদ বলতে কেবল আল্লাহর পথে অস্ত্র দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রামকেই বোঝায় না; বরং এটি একটি সাধারণ শব্দ, যা সশস্ত্র সংগ্রামসহ অন্য যে-কোনও রকমের প্রচেষ্টাকেই শামিল করে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

অর্থ : 'তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দ্বারা।'[১৩৬]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

অর্থ : 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর নিজেদের জান, মাল ও রসনা দ্বারা।'[১৩৭]

বোঝা গেল জিহাদ যেমন প্রাণের দ্বারা হতে পারে, তেমনি মালের দ্বারাও হতে পারে এবং হতে পারে মুখের দ্বারাও। অর্থাৎ আল্লাহর পথে যে-কোনও রকমের প্রচেষ্টা চালানো হয়, তার উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা, সেটাই জিহাদ। কিতাল অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামও এর একটি প্রকার।

---

১৩৬. সূরা তাওবা, আয়াত ৪১
১৩৭. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২১৪৩; আহমাদ, হাদীছ নং ১১৭৯৮; দারিমী, হাদীছ নং ২৩২৪

তবে সাধারণভাবে জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হলে তা দ্বারা আল্লাহর পথে কিতাল অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামকে বোঝায়। যাকে ذِرْوَةُ سَنَامِهِ অর্থাৎ দ্বীনের চূড়া বলা হয়েছে।[১৩৮]

জিহাদের আরও একটি অর্থ আছে। তাকে নফসের সাথে মুজাহাদা বলা হয়। অর্থাৎ নিজের নফস ও মনের চাহিদাবিরোধী কাজ করা, মনের চাহিদাকে গুনাহের দিক থেকে ফিরিয়ে পুণ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া কিংবা মনের যে প্রবৃত্তি মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে তা দমন করা। এ জাতীয় সাধনাকেও জিহাদ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। হাদীছ শরীফে আছে–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

'মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে নিজ নফসের সাথে জিহাদ করে।'[১৩৯]

অপর এক বর্ণনায় আছে– একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনও এক জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলেন। এ সময় তিনি ইরশাদ করেন–

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরছি।'[১৪০]

এ হাদীছে মনের বিরূদ্ধে জিহাদকে বড় জিহাদ বলা হয়েছে। অবশ্য এ হাদীছের বিশুদ্ধতা নিয়ে বিতর্ক আছে।

প্রকাশ থাকে যে, মনের বিরূদ্ধে সাধনা-সংগ্রামকে যে জিহাদ বলা হয়ে থাকে সেটা রূপকার্থে। তা জিহাদের প্রকৃত অর্থ নয়। জিহাদের প্রকৃত অর্থ সেটাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে অপপ্রচার

ইসলামের শত্রুগণ জিহাদ সম্পর্কে নানারকম প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে। তারা বলে থাকে, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য তাবলীগ ও ইসলাম প্রচার। তারা আরও বলে থাকে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলে থাকে, জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে, যাতে মানুষকে অস্ত্রের

---

১৩৮. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৪১; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৩৯৬৩; আহমাদ, হাদীছ নং ২১০০৮

১৩৯. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫৪৬; আহমাদ, হাদীছ নং ৩১৮২৬

১৪০. আদ-দুরারুল-মুনতাছিরাঃ ১ খণ্ড, ২৫৬ পৃ.; কাশফুল-খাফা ১ খণ্ড, ৪২৪ পৃ., হাদীছ নং ১৩৬২; এহ্‌ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩খণ্ড, ৪৭৯ পৃ.

জোরে মুসলিম বানানো যায়। বস্তুত এ সবই তাদের মনগড়া কথা ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।

জিহাদের উদ্দেশ্য

প্রকৃতপক্ষে জিহাদের উদ্দেশ্য দাওয়াত ও তাবলীগ নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল কুফরের দর্প চূর্ণ করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর ও দ্বীনী রচনাবলীতে জিহাদের উদ্দেশ্য اعلاء كلمة الله-ই বলা হয়েছে। 'ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ'-এর অর্থ কুফরের দর্প চূর্ণ করা ও তার শান-শওকত খর্ব করা এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও তাঁর শান-শওকত প্রতিষ্ঠা করা।

এই লক্ষ-উদ্দেশ্যের ভেতরে এটাও দাখিল যে, আল্লাহর যমীনে কেবল আল্লাহর আইনই চলবে। এখানে কাউকে মনগড়া আইন প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে মানুষের গোলামীতে লিপ্ত করতে দেওয়া হবে না। এ কথা সত্য যে, ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর অনুমতি দেয়নি। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

অর্থ : 'দ্বীনের ব্যাপারে (অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণ করানোর ব্যাপারে) জোর-জবরদাস্তি নেই।'[১৪১]

অর্থাৎ নিজ ধর্মে থাকার ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীন। কাউকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করা যাবে না। জোরপূর্বক মুসলিম বানানো ইসলামের বিধান নয়। তবে এটা কেবলই ব্যক্তির নিজ সত্তার সাথে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নিজে যে-কোনও ধর্মেই থেকে যেতে পারে, কিন্তু সে নিজ ইচ্ছামত আল্লাহর যমীনে যে-কোনও ধর্ম প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত থাকবে– এ অনুমতি তাকে দেওয়া হবে না। কেননা যমীন আল্লাহর, এখানে কেবল আল্লাহর দ্বীনই চলতে পারে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কারও বিধান চলতে পারে না। কাজেই এখানে কাউকে এই অনুমতি দেওয়া হবে না যে, সে মনগড়া কোনও বিধান চালু করবে এবং তার ছত্রচ্ছায়ায় আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের গোলাম বানাবে।

হযরত রিব'ঈ ইবন 'আমের (রাযি.) যখন কিসরার (পারস্য সম্রাট) দরবারে পৌছান, তখন কিসরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল– তোমরা এখানে কেন এসেছ? তিনি উত্তরে বলেন–

---

১৪১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

لِنُخْرِجَ مَنْ شَآءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللهِ

'আমরা এসেছি এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনব।'[১৪২]

অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে যেসকল বিধান জারি করেছে এবং সেই বিধানের আওতায় মানুষকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, আমরা তা থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে চাই। এটাই আমাদের জিহাদের লক্ষ।

ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ'র দু'টি ফরয

ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ তথা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ভেতর দু'টি ফরয নিহিত রয়েছে। একটি ফরয তো এই যে, কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করা এবং তাদের দর্প খর্ব করা। আর দ্বিতীয় ফরয হল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিগত জীবনে কেউ যদি নিজ ধর্ম পালন করতে চায়, তবে সে তা করতে পারে। ইসলাম তাতে কোনও বাধা দেয় না। কিন্তু আল্লাহর যমীনে কেবল আল্লাহর আইনই চলবে। এখানে অন্য কারও আইন চলতে পারে না। এটা জিহাদের বুনিয়াদী লক্ষ।

প্রোপাগাণ্ডার জবাব

জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানো নয়। জোরপূর্বক মুসলিম বানানো উদ্দেশ্য হলে জিযিয়ার বিধান দেওয়া হত না। কাফেরদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখা হয়ে থাকে–

ক. ইসলাম গ্রহণ কর;

খ. জিযিয়া আদায় কর;

গ. নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

অস্ত্রবলে মুসলিম বানানো উদ্দেশ্য হলে সোজাসাপ্টা কথা তো এটাই হত যে, ইসলাম গ্রহণ কর নয়ত মর। মাঝখানে জিযিয়ার হুকুম দেওয়া হত না।

জিযিয়ার হুকুম এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, জোরপূর্বক মুসলিম বানানো জিহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল কুফরের দর্প চূর্ণ করা ও ইসলামের শৌর্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই কেউ যদি মুসলিম হয়ে যায় তো ভালো কথা, নয়ত যদি জাহান্নামে যেতে চায় সেটা তার ইচ্ছা। তাকে বাধা দেওয়া

---

১৪২. তবারী ৩খণ্ড, ৩৪ পৃ.; ফী যিলালিল-কুরআন ২ খণ্ড, ৪৯৪ পৃ.

হবে না। তবে তাকে জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে। তা পরিশোধের নির্দেশ এ কারণে, যাতে ইসলামের শৌর্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কাফেরদের প্রতি সদাচরণের বেনজির ঘটনা

ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী– আজ পর্যন্ত কাউকে কখনও তরবারির জোরে মুসলিম বানানো হয়নি। কেউ নিজ ধর্ম ধরে রাখতে চাইলে সে স্বাধীনতা তাকে সর্বদাই দেওয়া হয়েছে, কখনওই তাকে বাধা দেওয়া হয়নি; বরং এরূপ ব্যক্তির সাথে সর্বদা সদাচরণই করা হয়েছে। এমন উদার মানবিক আচরণ করা হয়েছে, ধর্মের ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন।

হযরত ‘উমর ফারূক (রাযি.)-এর আমলে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অভিযান চালানোর পালা আসে, তখন খলীফা সেখানকার সকল অমুসলিমকে ডেকে পাঠান। তিনি তাদের বললেন, আমরা আপনাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া উসূল করি তার উদ্দেশ্য হল আপনাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা, কিন্তু এখন আমাদেরকে একটা যুদ্ধাভিযান চালাতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আপনাদেরকে জিযিয়ার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন আপনারা নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিন।

দুনিয়ার আর কোনও জাতি এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না। অমুসলিমদের প্রতি সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। কাজেই যদি বলা হয় মুসলিমগণ কাউকে জোরপূর্বক ইসলামে দাখিল করেছে, তবে এটা ইসলামের বিরুদ্ধে এক নির্জলা মিথ্যাচার।

ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ

মরহুম আকবর এলাহাবাদী একজন উঁচু মাপের কবি ছিলেন। তিনি তার বিভিন্ন কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে এসব প্রোপাগাণ্ডার চমৎকার জবাব দিয়েছেন। এক কবিতায় বলেন–

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے
غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

'নিজ দোষের প্রতি আপনাদের আছে কি কোনও ভ্রুক্ষেপ?
অথচ মিথ্যা অপবাদে বিদ্ধ করেছেন অন্যদের।
কোরাশ গাচ্ছেন সতত-তরবারি দ্বারা হয়েছে ইসলাম বিস্তার বলছেন না তো একবারও–সবার উপর কি দিলেন চাপিয়ে দাগিয়ে কামান।'

অর্থাৎ তোমাদের কথা অনুযায়ী মুসলিমগণ যদি তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করে থাকে, তবে মন্দকিছু তো প্রচার করেনি। ইসলাম বিস্তারের অর্থ হল—উত্তম চরিত্রের বিস্তার ঘটানো,সভ্যতা-ভব্যতার বিস্তার ঘটানো, সামাজিক শিষ্টাচারের বিস্তার ঘটানো এবং কল্যাণময় আদব-কায়দার বিস্তার ঘটানো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা তোপ-কামান দিয়ে কিসের বিস্তার ঘটিয়েছেন? আপনারা শক্তির জোরে বিস্তার ঘটিয়েছেন বদদ্বীনী, অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতা, নগ্নতা ও ধর্মদ্রোহিতার। তোপ-কামানের মাধ্যমে আপনারা মানুষের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করেছেন এবং সমগ্র মুসলিমবিশ্বে নিজেদের মনগড়া আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়েছেন।

আজও যেখানে যেখানে তাদের রাজত্ব কায়েম আছে, সেখানে বলতে তো সেক্যুলার ব্যবস্থা চালু আছে, কিন্তু বাস্তবে আসলে কী চালু আছে? তাদের দাবি– আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা দিচ্ছি। কিন্তু সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার দশা হল এই যে, কারও নিজের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার ইত্যাদির ফয়সালা নিজ ধর্ম মোতাবেক করার অনুমতি নেই। উচ্চ আওয়াজে আযান দেওয়ারও সুযোগ নেই। তারপরও দাবি– আমরা সেক্যুলার এবং আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা দেই।

সভ্য জগতের আজব বিচার

আজব ব্যাপার হল, মুসলিমদের প্রতি সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে অভিযোগ– তারা তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করেছে। কিন্তু নিজেদের দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। তারা যে বিশ্বব্যাপী কী কর্মকাণ্ড করছে, তা একবারও বলে না। তারা আজ সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও গণতন্ত্রের ঠিকাদার বনে গেছে। যার উপরে ইচ্ছা আগ্রাসন চালায়, যেখানে ইচ্ছা বোমা বর্ষণ করে, যেখানে চায় মিজাইল দাগে– এটা কিছু সন্ত্রাসবাদ নয়। এর নাম দেওয়া হয় শান্তিপ্রতিষ্ঠা। এটা নাকি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা!

জাতিসংঘ হোক বা আমেরিকা, তারা সকাল-সন্ধ্যা বিশ্বশান্তির গীত গায় আর এই গীত গেয়ে গেয়ে যা ইচ্ছা তাই করে। তারা শান্তির খাতিরে বোমা

বর্ষণ করে, শান্তির খাতিরে নিরীহ মানুষ হত্যা করে, শান্তির খাতিরে নগর ও বন্দর ম্যাসাকার করে দেয়।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা জগতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জ্ঞান-তত্ত্বের সাগর। সব রকমের জ্ঞান-বিদ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য এ গ্রন্থ সরবরাহ করে। সবকিছু সম্পর্কে এতে বড় বড় নিবন্ধ রয়েছে। একটি নিবন্ধ আছে অ্যাটম বোমার পরিচয় সম্পর্কে। এতে অ্যাটম বোমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। লেখা হয়েছে– জাপানের হতভাগ্য নগর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বোমা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক এ দুই নগরে বোমা নিক্ষেপ করে এর মাধ্যমে এক কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে। বেশ মজার তথ্য। একদিকে সারাজগত বলছে এ বোমা নিক্ষেপ করে নগর দু'টিতে ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে, অথচ ব্রিটানিকা বলছে এক কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে!

তথ্যটি দেওয়া হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, অ্যাটম বোমা না ফেললে এই যুদ্ধ আরও অনেক বছর দীর্ঘায়িত হত এবং তাতে প্রতি বছর এত এত মানুষ মারা পড়ত। অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে যুদ্ধের সমাপ্তি টানা হয়েছে, ফলে এক কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এই হল তাদের হিসাব এবং এই তাদের বিচারের দৃষ্টিকোণ! অর্থাৎ নিজেরা অ্যাটম বোমা ফেললেও বলে বেড়ায় এটা শান্তির জন্য করা হয়েছে আর অন্য বেচারা নিজের স্বাধীনতার জন্য বুক পেতে দাঁড়ালে সে হয়ে যায় সন্ত্রাসী! আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লাঠি তুললেও সে হয়ে যায় জঙ্গি এবং তার লাঠিটি হয়ে যায় রাসায়নিক অস্ত্র। যাক, এতো হল তাদের মেজায। তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে, তাতে দোষের কিছু নেই।

ইসলামের মডার্ণ লবির নীতি

বিপত্তি আরও আছে, আমাদের নিজেদের সমাজে সব যুগেই এমনকিছু লোক থাকে, সবসময় যাদের নজর থাকে শত্রুমহলের দিকে আর তাদেরকে খুশি করার জন্য নিজ ধর্মের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করে। যেমন আধুনিককালেও এমন এক শ্রেণী আছে, যাদের কাজ হল পশ্চিমের তরফ থেকে যখনই ইসলামের কোনও বিধানের উপর আপত্তি ওঠে, তখনই সে সম্পর্কে একেকটা আজব ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। উচিত তো ছিল বিধানটির হাকীকত উপলব্ধি করে তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া, কিন্তু তারা তা না করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে যায় আর নিবেদন করে—না হুজুর, আপনি ভুল বুঝেছেন, আপনারা যেরকম

বুঝেছেন ব্যাপারটা সেরকম নয়, আসলে বিধানটি এই এই রকমের। এভাবে তারা শর'ঈ বিধানের বিকৃতিসাধন করে এবং তাতে কাটছাঁট করে একটা নতুন রূপ দান করে। আমাদের সমাজে এরকম একটা মহল যথারীতি আছে এবং তারা তাদের নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণত তাদেরকে আধুনিকপন্থী বা ইসলামের মডার্ণ লবি বলা হয়।

এই মহলটি তাদের ধারণায় ইসলামের প্রতি বড়ই কৃপা প্রদর্শন করছে, কারণ ইসলামের উপরে যেসব আপত্তি ওঠে, সবগুলোরই জবাব দিয়ে অন্যের দুর্নাম থেকে ইসলামকে রক্ষা করছে। সেই জবাব দিতে গিয়ে ইসলামকে তারা এমনভাবে মেরামত করে, যাতে আপত্তিকারীদের চোখে ইসলাম দৃষ্টিনন্দন হয়ে যায় এবং ইসলাম একটি নির্দোষ ধর্ম হিসেবে তাদের কাছে বরিত হয়। কিন্তু এই করে যে ইসলামের অস্তিত্বেই আঘাত হানছে সেদিকে তাদের নজর নেই।

জনৈকা ছুতারের ঘটনা

তাদের এ নীতির সাথে জনৈকা ছুতারের একটি ঘটনা বেশ মিলে যায়। 'নাফহাতুল আরব' নামে আরবী সাহিত্যের একখানি বই আছে। তাতে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ছুতারের একটি বাজপাখি ছিল। একদিন ছুতার লক্ষ করল বাজপাখিটির পাঞ্জা বাঁকানো অর্থাৎ পায়ের নখগুলো নিচের দিকে মোড়ানো। সে মনে মনে বলল, বেচারা পাখিটির তো খুব কষ্ট হচ্ছে। বাঁকা পাঞ্জা দিয়ে তার পক্ষে কাজ চালানো অনেক কঠিন হয়ে থাকবে। ওর এই কষ্ট দূর করা উচিত। তার পাঞ্জাদু'টি সোজা করে দিলে এই কষ্ট দূর হয়ে যাবে। ব্যস যেই কথা সেই কাজ। সে তার পাঞ্জা সোজা করে দিল। কিন্তু এ সোজা করার পরিণাম দাঁড়াল এই যে, বেচারার পা দু'টি ভেঙে গেল, নখও আর কোনও কাজের থাকল না। এই সোজা পাঞ্জা দিয়ে এখন আর সে কোনও কিছুই করতে পারে না। বাজপাখি আর বাজপাখি থাকল না, সম্পূর্ণ অথর্ব ও অকর্মণ্য একটি পাখি হয়ে গেল। ইসলামের এই নব্যপন্থীদের অবস্থাও ঠিক সেরকম। তারা ইসলামের সঙ্গে একই আচরণ করছে। পাশ্চাত্যের চোখে ইসলামের যা-কিছুকেই বাঁকা মনে হয়, সেটাকেই তারা সোজা করার চেষ্টা করছে আর এভাবে ইসলামের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে।

আক্রমণাত্মক জিহাদ অস্বীকার

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু পশ্চিমারা এতে বক্রতা দেখল। তারা বলল, জিহাদ খুব খারাপ জিনিস, এটা সন্ত্রাসী কাজ। ব্যস এই

মহলটি জবাব দিতে দাঁড়িয়ে গেল। তারা বলল, মহোদয়গণ! আপনারা একদম নাখোশ হবেন না। আমাদের জিহাদ কখনওই আক্রমণাত্মক কাজ নয়, এটা কেবলই প্রতিরক্ষামূলক। আমরা আগে বেড়ে কারও উপর হামলা চালাই না। কেউ যদি আমাদের উপরে হামলা চালায়, কেবল তখনই আমরা লড়াই করি। আমরা আক্রমণকে প্রতিরোধ করি মাত্র। ইসলাম এই প্রতিরোধমূলক জিহাদেরই অনুমতি দিয়েছে। আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমতি দেয়নি। অর্থাৎ শুরু থেকেই কারও উপরে গিয়ে আক্রমণ চালানো ইসলামে অনুমোদিত নয়। সুতরাং আপনারা নারাজ হবেন না। আমাদের জিহাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ একটি ব্যবস্থা।

কিন্তু এরা যতই হাতজোড় করুক, যতই না কেন অনুনয়-বিনয় করে বলুক—আপনারা নারাজ হবেন না এবং তাদের চিন্তাধারা গ্রহণ করে ইসলামকে কাটছাঁট করুক, তারা কখনওই খুশি হওয়ার নয়। কুরআন মাজীদ তো বলেই রেখেছে–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ

অর্থ : 'ইহুদী ও নাসারা কিছুতেই তোমার প্রতি খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।'[১৪৩]

অভিজ্ঞতা সাক্ষী, এক শতাব্দিকাল গত হয়ে গেছে। এই মহল অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। জোরগলায় বলে বেড়াচ্ছে– জিহাদ খারাপ জিনিস। না না, ওটা আমরা করি না। আমরা তো কেবল প্রতিরোধ করি। একই রকম অপব্যাখ্যা শরী'আতের অন্যান্য বিধানেরও করছে। বলছে, সুদ খুব ভালো জিনিস। আমরাও হারাম বলি না। হারাম যেটা ছিল সেটা প্রাচীনকালের সুদ, সেটা এককালে ছিল। বর্তমানকালের যে বাণিজ্যিক বা ব্যাংকিং সুদ এটা হারাম নয়। এমনিভাবে জুয়াও এককালে হারাম ছিল। সেটা প্রাচীনকালের জুয়া। বর্তমানকালের যে জুয়া, এটা হারাম নয়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরাও এটাকে জায়েয মনে করি, হারাম বলি না। এমনিভাবে বহুবিবাহের মাসআলায়ও তারা বলে আমরাও এক স্ত্রীরই প্রবক্তা। আগের দিনে যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহে পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়েছিল তাই বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এখন আর অনুমতি নেই, আপনারা নাখোশ হবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

১৪৩. সূরা বাকারা, আয়াত ১২০

এক শতাব্দিকাল পর্যন্ত তারা এই অবস্থান গ্রহণ করে দেখেছে, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। যাদেরকে খুশি করার জন্য এতসব চেষ্টা, তারা একটুও খুশি হয়নি। দ্বীনের ভেতরে রদবদল করা, ইচ্ছামত কাঁচি চালানো এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া কোনওকিছুই তারা বাদ দেয়নি। শত্রুদের খুশি করার জন্য সব ব্যবস্থাই পরখ করে দেখেছে, কিন্তু পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই হয়নি, তাদেরকে খুশি করা যায়নি; বরং একের পর এক তারা মার দিয়েই যাচ্ছে এবং উত্তরোত্তর মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ বাড়ছেই।

এত বাড় বেড়ো না, নিজ আঁচলে তাকিয়ে দেখ

যখন তারা জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যায়িত করল, তখন এই মহলটি আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে বলল আমরা কেবল প্রতিরোধের জন্য লড়াই করি। উচিত তো ছিল এরূপ অজুহাত প্রদর্শন না করে দৃঢ়তার সাথে বলা, যারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় প্রতিনিয়ত অন্যদের উপর চড়াও হয়, অ্যাটম বোমা মেরে নগর ও বন্দর ধ্বংস করে দেয়, যার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে ভুগছে, তারা কোন্ মুখে অন্যকে সন্ত্রাসবাদী বলে? কোন্ মুখে তারা সেইসব বীরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে, যারা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, যারা মা-বোনও শিশু-বৃদ্ধদের প্রাণ রক্ষার্থে এবং যারা পবিত্র ভূমিসমূহের হেফাজতের লক্ষে জানমালের কুরবানী দেয়? তাদের জন্য তো সোজাসাপ্টা জবাব ছিল–

اتنی نہ بڑھا پاکیٔ داماں کی حکایت

دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

'নিজেদের পাক-পবিত্রতার এত গীত গেও না
তাকিয়ে দেখ একটু নিজের আঁচলের দিকে, লক্ষ কর বোতামে আঁটা জামার ভেতর'

কিন্তু তারা তা না বলে ইসলামের আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করে বসল। বলে দিল ইসলামে আগে বেড়ে যুদ্ধের কোনও অনুমতি নেই; বরং ইসলামের জিহাদ হল প্রতিরোধমূলক। বস্তুত মানুষ যখন নিজ মনে কোনও ধারণা বসিয়ে নেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে, তখন কুরআন-হাদীছকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেনে-কষে নিজ মতলব মোতাবেক বানিয়ে নেয়। সুতরাং তারা আয়াত খুঁজে বের করল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

অর্থ : 'যাদের সংগে কাফেরগণ লড়াই করে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তাদের উপরে জুলুম করা হয়েছে।'[১৪৪]

অর্থাৎ যারা মজলুম কিংবা যারা অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে এক আয়াতে আছে–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

অর্থ : 'আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের বিরূদ্ধে, যারা তোমাদের বিরূদ্ধে লড়াই করে।'[১৪৫]

এর দ্বারা বোঝা গেল জিহাদ কেবল প্রতিরোধমূলকই হতে পারে, আক্রমণমূলক নয়।[১৪৬]

জিহাদ বৈধকরণের বিভিন্ন ধাপ

এইসব বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূল কারণ কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহকে সময়কালের ধারাবাহিকতায় বিবেচনা না করা। প্রকৃতপক্ষে জিহাদের বিধান হঠাৎ করেই দেওয়া হয়নি; বরং এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ধাপে ধাপে।

প্রথম ধাপ ঃএকটা সময় ছিল যখন যে-কোনও রকমের শক্তিপ্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, তখন হুকুম ছিল–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ۝

অর্থ : 'তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারবে কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না আর তারা যে চক্রান্ত করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।'[১৪৭]

অন্যত্র ইরশাদ–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ۝

---

১৪৪. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯

১৪৫. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০

১৪৬. এর জবাব যারা বিস্তারিতভাবে জানতে চায়, তাদের জন্য দ্রষ্টব্য– তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম ৩খণ্ড, ৩-১৪পৃ.

১৪৭. সূরা নাহ্ল, আয়াত ১২৭

অর্থ : 'ক্ষমায় অভ্যস্ত হও, সৎকাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞদেরকে পাশকাটিয়ে চল।'[১৪৮]

আরও ইরশাদ–

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ﴿۹۴﴾

অর্থ : 'তোমাকে যা আদেশ করা হয় তা প্রকাশ্যে বর্ণনা কর আর মুশরিকদেরকে পাশকাটিয়ে চল।'[১৪৯]

অর্থাৎ প্রথমদিকে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল এবং তা এত কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল যে, কেউ আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করারও অনুমতি ছিল না। এ নিষেধাজ্ঞা এ কারণে নয় যে, তখন মুসলিমগণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। দুর্বল তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু এ পর্যায়ের নয় যে, কেউ ইট মারলে পাটকেলও মারতে পারত না। বদরেই বা মুসলমানদের এমন কী শক্তি ছিল? মাত্র ৩১৩ জনের একটা নিরস্ত্র বাহিনী, কিন্তু যুদ্ধ করতে হয়েছিল ১০০০ সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের তখন রণসামগ্রী বলতে ছিল মাত্র ৮ টি তরবারি, ৭০ টি উট এবং দু'টি ঘোড়া। কেউ বা লাঠি ব্যবহার করেছিল, কেউ পাথর। কিন্তু এমন একটি দুর্বল বাহিনী ১০০০ সসস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কী বিপুল বিক্রমেই না লড়াই করেছিল!

শক্তি মূলত বদরেও ছিল না, কিন্তু সেখানে যুদ্ধের অনুমতি ছিল। মক্কা মুকার্‌রামায় অনুমতি ছিল না। এখানে এতটুকু শক্তির ব্যবস্থা তো তারা করতেই পারত যে, ৮-১০ জন মিলে অতর্কিত হামলা চালিয়ে আবূ জাহেলের দফারফা করে দিত, কিন্তু তাদেরকে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মক্কী জীবনে জিহাদের হুকুম না থাকার হিকমত

মক্কী জীবনে জিহাদের অনুমতি না দেওয়ার লক্ষ ছিল তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। এটা ছিল মুসলিম জীবনের সূচনাকাল। তাদেরকে উপযুক্ত লোক করে গড়ে তোলার জন্য মুজাহাদা-সাধনার চাক্কিতে পেষাই করা দরকার ছিল। দরকার ছিল চুল্লিতে ফেলে পরিশোধন করা, যাতে সকল খাদ-মরিচা দূর হয়ে তারা শুচি-শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। সেখানে তাদেরকে সবরের তালীম দেওয়া হচ্ছিল। কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা হচ্ছিল।

---

১৪৮. সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯

১৪৯. সূরা হিজ্‌র, আয়াত ৯৪

শ্রম-সাধনার অভ্যাস গড়ে তোলা হচ্ছিল। আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর নির্মাণ হচ্ছিল। সবরকম যোগ্যতায় পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল এবং তাদেরকে যোগানো হচ্ছিল রূহের খাদ্য, যাতে তারা সর্বপ্রকারে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃঅতঃপর আসে মুসলিম জীবনের দ্বিতীয় ধাপ। তখন জিহাদ তো ফরয করা হয়নি, তবে এতটুকু অনুমতি দেওয়া হয় যে, কেউ যদি তাদের উপরে জুলুম করে তবে তার প্রতিশোধ নিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۨ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۭ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

অর্থ : 'যাদের সংগে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে– তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে, যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে (-এর অনিষ্ট) অন্যদলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকাহ্, গির্জা, 'ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ– যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।'[১৫০]

অর্থাৎ এ আয়াতে জিহাদ ও কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে তা শুরুতেই নয়; বরং শত্রুপক্ষ থেকে জুলুম বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার শর্তসাপেক্ষে। অর্থাৎ শত্রু যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে বা আঘাত হানে, তবে তার জবাবে তোমরাও তাদের উপরে আঘাত হানতে পার এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পার।

---

১৫০. সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯-৪০

তৃতীয় ধাপ ঃতৃতীয় ধাপে মুসলিমদের প্রতি জিহাদ ও কিতালকে ফরয করা হয়। কিন্তু তা কেবল সেই সময়ে, যখন অপরপক্ষ আক্রমণ চালায়। অর্থাৎ এই ধাপে প্রতিরোধমূলক জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

অর্থ : 'তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সংগে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পসন্দ করেন না।'[১৫১]

অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপে তো প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই ধাপে তাকে ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর হামলা চালায়, তাদের প্রতিরোধকল্পে তোমাদের কর্তব্য তাদের উপরেও হামলা চালানো। এভাবে দ্বিতীয় ধাপে যেটা ঐচ্ছিক ছিল, এ ধাপে সেটাকে আবশ্যিক করে দেওয়া হয়।

চতুর্থ ধাপ ঃতৃতীয় ধাপ পাড় হয়ে মুসলিমগণ যখন চতুর্থ পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন হুকুম দেওয়া হয়– এবার তোমরা অগ্রবর্তী হয়ে শত্রুর সাথে কিতাল ও সশস্ত্র সংগ্রাম কর। এবার তোমরা এই অপেক্ষায় থেকো না যে, কখন শত্রু তোমাদের উপরে আক্রমণ চালাবে আর তা প্রতিহত করার জন্য তোমরা অস্ত্র ধরবে; বরং তোমরা নিজেরাই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সামনে এগিয়ে যাও এবং শত্রুর উপর হামলা চালাও। ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ
عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ : 'তোমাদের প্রতি (শত্রুর সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পসন্দ কর অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।'[১৫২]

---

১৫১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০
১৫২. সূরা বাকারা, আয়াত ২১৬

এ আয়াতের মাধ্যমে হুকুম দেওয়া হয় যে, এখন থেকে তোমাদেরকে অগ্রগামী হয়েই যুদ্ধ করতে হবে। এখন আর কেবল প্রতিরোধ নয়, আক্রমণ চালাবে। আরও ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ۠ ﴿۲۹﴾

অর্থ : 'কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন, তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্যদ্বীনকে নিজেদের দ্বীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাবত না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।'[১৫৩]

অর্থাৎ এখন থেকে সামনে অগ্রসর হয়েই তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে, কেবল প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত হবে না। অতঃপর সূরা তাওবার এ আয়াত নাযিল হয়–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵﴾

অর্থ : 'অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে (যারা তোমাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৫৪]

এটা নবম হিজরীর কথা, যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-কে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এই হজ্জের সময় হযরত 'আলী (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ঘোষণা

---

১৫৩. সূরা তাওবা, আয়াত ২৯

করে দেন যে, যাদের সাথে মুসলিমদের কোনও চুক্তি আছে তাদেরকে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া যাচ্ছে আর যাদের সাথে কোনও চুক্তি নেই তাদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হল। চার মাসের ভেতর তারা আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাবে, অন্যথায় তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা থাকল।

যাহোক এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর আক্রমণাত্মক জিহাদও জায়েয হয়ে যায়। কেবল প্রতিরোধমূলক জিহাদেই বিষয়টাকে সীমিত রাখা হয়নি। এখন কেউ যদি ইসলামের সূচনাকালে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে ভিত্তি করে ফয়সালা দিয়ে দেয় যে, জিহাদ তো জায়েযই নয়, মুসলিমদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে সর্বাবস্থায় তারা ধৈর্যধারণ করবে, মুশরিকদের পক্ষ থেকে জুলুম-নীপিড়ন করা হলেও তারা কেবল ধৈর্য ধারণই করবে, তবে এটা যে তার মারাত্মক ভুল ও অজ্ঞতার পরিচায়ক তা বলাই বাহুল্য। ঠিক এরকমই কেউ যদি কেবল প্রতিরোধকমূলক আয়াতসমূহ নিয়ে বসে যায় আর বলে দেয় মুসলিমদের জন্য প্রতিরোধ করা তো জায়েয, সূচনামূলক যুদ্ধ জায়েয নয়, তবে এটাও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। এই উম্মতের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরে কখনও কোনও ফকীহ এ মত গ্রহণ করেননি যে, ইসলামে কেবল প্রতিরোধমূলক যুদ্ধই জায়েয, শুরুতেই আক্রমণ করা জায়েয নয়। বাস্তবতা এটাই যে, প্রথমে আঘাত হানা বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করা ইসলামে সম্পূর্ণ জায়েয।

তবে আক্রমণাত্মক জিহাদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে শেষদিকে এবং এর মাধ্যমে জিহাদের বিধানকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর এরকম কোনও শর্ত নেই যে, জিহাদ করতে হলে আগে শত্রুর পক্ষ থেকে আঘাত আসতে হবে, তাদের পক্ষ থেকে হামলা হলেই কেবল তার জবাব দেওয়া যাবে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের উপরেও হামলা চালানো যাবে।

প্রতিরোধের ভেতর অগ্রাভিযানও দাখিল

গভীর দৃষ্টিতে দেখা হলে অগ্রাভিযানও একরকম প্রতিরোধই। অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে তো অগ্রাভিযান মনে হয়, কিন্তু অন্যদিক থেকে লক্ষ করলে সেটা প্রতিরোধ। তা এভাবে যে, অগ্রাভিযান বা আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য হল কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করা। কেননা কাফেরগণ যতক্ষণ শক্তিশালী থাকবে ততক্ষণ তাদের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহ'র এ আশংকা থাকবে যে, যে-কোনও সময় তারা হামলা চালাতে পারে আর তখন প্রতিরোধের আবশ্যকতা

দেখা দেবে। সেই পর্যায় যাতে না আসে তাই আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমে আগেই তাদের শৌর্য-বীর্য খতম করে দেওয়া চাই।

দ্বিতীয়ত তাদের শান-শওকত যত বেশি হবে, মানুষের উপরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও তত বেশি থাকবে। এ অবস্থায় মানুষ মুক্তমনে সত্য-সঠিক কথা শুনতে ও বুঝতে প্রস্তুত থাকবে না। কখনও তা শুনলেও সহজে মানতে পারবে না। শত্রুর প্রভাবই তা মানার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কেননা আবহমান কাল থেকেই রীতি চলে আসছে–

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ

'মানুষ তাদের রাজা-বাদশাদের ধর্ম মেনে চলে।'

অর্থাৎ যার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তারই চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা এবং তারই সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষ তাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে এবং তার অনুসরণ করতে গৌরব বোধ করে। ক্ষমতাবানের ক্ষমতা মানুষের মন-মস্তিষ্ককে এমনভাবেই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তারা তার কথাকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যদের কথাকে ভুল মনে করে, তাতে তার কথা যতই গলদ হোক এবং যুক্তি প্রমাণের আলোকে অন্যদের কথা যতই সঠিক হোক। মন-মস্তিষ্ক যেহেতু শক্তিমানের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তার কথার বাইরে আর কিছু যে হক ও সত্য হতে পারে মানুষ তা ভাবতেই পারে না। তাই তারা সত্যকথা শুনতে প্রস্তুত হয় না। এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরী শক্তির প্রভাব ক্ষুণ্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কাছে সত্যকথা পৌছানো সম্ভব হয় না, সম্ভব হলেও সেজন্য অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। সুতরাং কুফরের দর্প চূর্ণ করাও একরকম প্রতিরোধই বটে।

এ কারণেই অনেক সময় আক্রমণাত্মক জিহাদ চালাতে হয়। এমন নয় যে, বসে বসে দেখতে থাকবে আর ওদিকে শত্রু পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি নেবে, তারা মিজাইল ও অ্যাটম বোমা বানাবে এবং সবরকম শক্তি সঞ্চয় করবে। তারা আমাদের উপরে এখনও হামলা চালাইনি– এই বলে বসে থাকা কোনও বুদ্ধির কথা নয়। এটা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যে, আমরা বসে বসে দেখতে থাকব, অবশেষে শত্রুসৈন্য যখন সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের দরজায় হাজির হয়ে যাবে তখন আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করব। যারা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের কথা বলে, তারা যেন এরকম বুদ্ধিই সরবরাহ করতে চায়।

শরী'আত সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে

শরী'আত জিহাদের বিধান দেওয়ার সাথে সাথে এর সীমারেখাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যাতে জিহাদ করতে গিয়ে কোনও রকম সীমালঙ্ঘন না হয়ে যায় এবং কল্যাণময় বিধানটি মানুষের পক্ষে কোনও রকম অকল্যাণের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَلَا اِمْرَأَةً

'তোমরা কোনও শিশু ও নারীকে হত্যা করবে না।'[১৫৫]

অপর এক বর্ণনায় আছে–

لَا تَقْتُلُوْا صَبِيًّا وَلَا اِمْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيْرًا وَلَا مَرِيْضًا وَلَا رَاهِبًا

'তোমরা হত্যা করবে না কোনও শিশুকে, কোনও নারীকে, কোনও বৃদ্ধকে, কোনও রোগীকে এবং কোনও আশ্রমবাসীকে।'[১৫৬]

তাছাড়া যারা যুদ্ধে শরীক হয়নি তাদেরকেও হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধ করা হয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশ বিকৃত করতে। মোটকথা ইসলাম জিহাদের ক্ষেত্রেও এমন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং এমন কঠিনভাবে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যার নজির অন্য কোনও ধর্ম বা অন্য কোনও জাতির ভেতর কেউ দেখাতে পারবে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা নাকি সন্ত্রাসবাদী। তারা শিশু ও নারীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, তা সত্ত্বেও তারা শান্তির পতাকাবাহী। আর আমরা রণক্ষেত্রেও শত্রুপক্ষের নারীদের প্রাণ রক্ষা করি, তথাপি আমরা সন্ত্রাসবাদী। এমনই আজ শক্তিমানদের বিচার।

জনৈক আমেরিকান কাউন্সিলরের সাথে কথোপকথন

আমার কাছে কখনও কখনও আমেরিকার লোকজনও আসে। এখানে যে আমেরিকান কাউন্সিলর, তিনি অর্থনীতি বিষয়ে ওয়াশিংটন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল অফিসার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক ডাইরেক্টর, তিনিও কখনও কখনও আসেন। প্রথমবার তিনি যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি তো কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি

---

১৫৫. মুসান্নাফ 'আব্দুর-রাজ্জাক ৫খণ্ড, ৪০৭ পৃ., হাদীছ নং ৯৭৪৭; মা'রিফাতুস-সাহাবা ৭খণ্ড, ২৬০ পৃ., হাদীছ নং ২২৮৫

১৫৬. বায়হাকী ২খণ্ড, ২৮৫ পৃ., হাদীছ নং ১৮৬১৬

নই, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করুন। তিনি বললেন, একজন স্কলার হিসেবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি।

তারপর থেকে তিনি প্রতি পঞ্চম কি ষষ্ঠ মাসে এসে থাকেন এবং নতুন কোনও কাউন্সিলর আসলে তিনিও সাক্ষাত করতে আসেন। আসার পর খুব কাটা কাটা কথা শুনে যান, কিন্তু তারপরও আসেন। একবারের ঘটনা। তিনি আসলে অনেক কথা হল। কথাবার্তার একপর্যায়ে আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, আপনি তার উত্তর দিন।

আমি বললাম, ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমবিশ্বের একটা সাধারণ অনুভূতি হল আমেরিকা তাদের দুশমন, তাদের পথের কাঁটা, সর্বদা তাদের স্বার্থবিরোধী কাজ করে।

আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সমগ্র মুসলিমবিশ্বের এই যে অনুভূতি, এটা কি আপনাদের পক্ষে ভালো না মন্দ? এটাকে কি আপনারা নিজেদের জন্য উপকারি মনে করেন না ক্ষতিকর?

তিনি বললেন, সত্যিই যদি এরকম অনুভূতি থাকে তবে আমাদের পক্ষে তা অবশ্যই ক্ষতিকর, কিন্তু আমার ধারণা জনগণের মধ্যে এরকম অনুভূতি নেই।

আমি বললাম, আপনাদের কাছে যদি এরকম তথ্য থাকে যে, জনগণের মধ্যে আপনাদের সম্পর্কে এরকম অনুভূতি নেই, তবে সেজন্য আমাকে অবাক মানতেই হচ্ছে। আপনাদের সি.আই.এ. তো তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সারাবিশ্বে মশহুর। সি.আই.এ. যদি আপনাদেরকে এরকম রিপোর্ট দিয়ে থাকে যে, জনমনে আপনাদের প্রতি কোনও অসন্তোষ নেই, তবে এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার!

তিনি বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে এসব সাদ্দাম হোসেন, খোমিনী ও গাদ্দাফীর প্রোপাগাণ্ডা, নয়ত সাধারণ্যে এরকম ধারণা নেই।

আমি বললাম, আপনার এ কথায় আমার আরও বেশি আশ্চর্যবোধ হচ্ছে। কেননা সাদ্দাম হোসেন, খোমিনী বা গাদ্দাফী যেই হোক না কেন, আপনার তো জানা থাকার কথা এ জাতীয় নেতারা পপুলারিস্ট হতে চায়। অর্থাৎ তাদের একান্ত কামনা থাকে জনগণের মধ্যে তারা ব্যাপকভাবে সমাদৃত বা প্রভাবশালী হয়ে থাকবে আর সে কারণে তারা এমন এমন শ্লোগান দেয় এবং এমন এমন কথা বলে থাকে, যা জনগণ পসন্দ করে এবং যাতে তারা খুশি হয়।

তারা যেহেতু দেখেছে জনমনে আমেরিকার বিরূদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা, তাই তারা আমেরিকার বিরূদ্ধে সরব। উচ্চকণ্ঠে আমেরিকার নিন্দা-সমালোচনা করে থাকে। জনমনে যদি আমেরিকার বিরূদ্ধে ঘৃণা না থাকত, তবে তারা কখনওই আমেরিকার বিরূদ্ধে সোচ্চার হত না এবং আমেরিকাকে গালমন্দও করত না।

পয়লা নম্বর দুশমন কে

আমি বললাম, আমার এ কথা সত্য কিনা তা আপনি এভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, আপনি এখান থেকে যখন ফিরবেন, তখন পথে পতাকা খুলে গাড়িটি প্রসিদ্ধ কোনও স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। তারপর যে-কোনও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকবেন আর লোকজনকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের পয়লা নম্বর দুশমন কে? উত্তরে তারা যদি আমেরিকাকে এক নম্বরের শত্রু না বলে, তবে আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেব। কাজেই আপনার যদি ধারণা থাকে জনমনে আমেরিকার বিরূদ্ধে কোনও ঘৃণা নেই, তবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ঘৃণা অবশ্যই আছে এবং প্রচণ্ড রকমের আছে।

আমেরিকার প্রতি ঘৃণার কারণ

তিনি বললেন, এই ঘৃণা কেন? এর কারণ কী?

আমি বললাম, এর কারণ কেবল আপনাদের নীতি। আপনাদের কাজের কারণেই মানুষ আপনাদেরকে ঘৃণা করে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ নীতির কারণে?

আমি বললাম, আপনারা প্রতিটি বিষয়ে মুসলিমদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। যখনই কোথাও ইসলামী কোনও বিষয়ের উত্থান ঘটতে শুরু করে, অমনি তা দমন করার জন্য আপনারা সর্বশক্তি ব্যয় করেন। আপনারা সর্বদা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে কমিউনিজমের বিরূদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই করার জন্য আপনারা মুসলিমদেরকে লাগিয়ে দিয়েছেন। যখন আপনাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবং কমিউনিজম পিছনে হটেছে, তখন এই মুসলিমগণকে আপনারা নিশানা বানিয়েছেন।

আফগানিস্তানে মুজাহিদগণ যতদিন রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছে, ততদিন তারা ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, কিন্তু যেই না রাশিয়া পিছনে হটল, আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে গেল, অমনি তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করলেন। চিন্তা করেছেন এটা আপনাদের কতবড় ভুল? আপনারা

গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চিৎকার করেন অথচ আজ জাযায়েরে যখন মুসলিমদের দল বিজয়ী হল এবং তারা সরকার গঠন করতে শুরু করল, তখন আপনারা বলে দিলেন এরা গণতন্ত্রের শত্রু।

আমি তো প্রথমেই আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই, তাই রাজনৈতিক ভঙ্গির কথাবার্তাও আমার আসে না। আমি তো একজন শিক্ষার্থী। আমার কোনও কথা যদি আপনাদের অপসন্দ হয়, তবে আগেই আপনাদের কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। তবে সত্যি কথা হল, আপনারা মুসলিমদেরকে ভয় পান।

তারা বলল, আমাদের এ ভয় পাওয়াটা সঠিক না ভুল?

আমি বললাম, আপনাদের নীতি যদি এরকমই থাকে তবে এ ভীতি বিলকুল সঠিক, কিন্তু আপনারা যদি এ নীতি বদলে ফেলেন এবং সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করেন, তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই।

তারা বলল, আমরা আমাদের নীতির কী পরিবর্তন করব?

আমি বললাম, আসুন আমরা একটা আপস-রফা করি। তাতে মানবতা অনেক উপকৃত হবে। কুরআন বলছে পূর্ব ও পশ্চিমের কোনও পার্থক্য নেই। আসুন একটা সন্ধি করি। একটা জিনিস আপনাদের কাছে আছে কিন্তু আমাদের কাছে নেই কিংবা কম আছে, আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে আছে কিন্তু আপনাদের কাছে নেই। যে জিনিসটি আমাদের কাছে আছে আমরা তা আপনাদেরকে দিয়ে দেব আর যে জিনিসটি আপনাদের কাছে আছে তা আমাদের দিয়ে দিন। এভাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করি, তারপর উভয় মিলে সারাবিশ্বের সেবা করি।

তারা বলল, তা কী?

আমি বললাম, যে জিনিস আপনাদের কাছে আছে আমাদের কাছে নেই তা হচ্ছে টেকনোলজি। অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তিতে আপনারা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এ জিনিস আমাদের কাছেও আছে, তবে আপনাদের কাছে যতটা, ততটা নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। আর যে জিনিস আমাদের কাছে আছে কিন্তু আপনাদের কাছে নেই তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। আপনাদের গোটা সমাজ এবং আপনাদের যাবতীয় দৌড়ঝাঁপ বস্তুকেন্দ্রিক আর এ কারণেই আপনারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন। আপনাদের পরিবার-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। বস্তুগত পর্যাপ্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আপনারা আত্মিক সুখ থেকে বঞ্চিত। আপনাদের মনে শান্তি নেই। আত্মহত্যার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটছে। সর্বত্র

অস্থিরতা বিরাজ করছে। এসবই আপনাদের আধ্যাত্মিক ও রূহানী মূল্যবোধ না থাকার পরিণাম। এই জিনিস আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিন আর আপনাদের টেকনোলজি আমাদেরকে দিন, তারপর উভয় মিলে আসুন আমরা মানবতার সেবা করি। একদিকে থাকবে আপনাদের প্রযুক্তি, অন্যদিকে আমাদের রূহানিয়্যাত। মানবতার শান্তির জন্য এ উভয়ের সম্মিলন অতীব জরুরি। মানুষের মুক্তির জন্য এরচে' উত্তম কোনও পথ হতে পারে না।

আপনাদের কাছে হাতিয়ার আছে, কিন্তু কোথায় কী পরিমাণে তা ব্যবহার করতে হবে তার নিয়ম আপনাদের জানা নেই। এরও নিয়ম-নীতি আছে এবং সেটা আছে আমাদের কাছে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নিন, তারপর দেখুন সারাবিশ্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। আপনারা শান্তির কথা বলে থাকেন, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠার নিয়ম জানেন না। শান্তিপ্রতিষ্ঠা কেবল এ পথেই হতে পারে, অন্য কোনও পথে নয়।

যাহোক কথা হচ্ছে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদও জরুরি এবং শরী'আত তা বিধেয় করেছে। নবম হিজরীর পর যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তা এটা প্রমাণ করে।

অন্যান্য আয়াত কি রহিত

প্রশ্ন হতে পারে সবশেষে যদি আক্রমণাত্মক জিহাদের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে, তবে এর আগে যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয়েছে তা কি রহিত হয়ে গেছে নাকি এখনও বলবৎ আছে?

সঠিক কথা হল তা এখনও বলবৎ আছে। অবস্থা অনুযায়ী তা অনুসরণীয়। যেখানে মুসলিমদের কাছে শক্তি না থাকে, সেখানে এখনও সবরের হুকুমই কার্যকর হবে এবং সবরের সঙ্গেই ওই সমস্ত কাজ করতে হবে, যা মক্কা মুকার্‌রামায় সাহাবায়ে কিরাম করেছিলেন। তারপর যদি শক্তি অর্জিত হয় এবং শত্রুপক্ষ হামলা চালায়, তবে প্রতিরোধ করা অপরিহার্য হবে। যদি আরও শক্তি সঞ্চয় হয়, তবে অগ্রাভিযানও চালাতে হবে। মোটকথা তিনও ধাপের তিনও রকম বিধান আপন-আপন স্থানে এখনও বলবৎ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়াহ

শত্রুপক্ষ যখন হামলা করে, তখন তা প্রতিহত করা ফরযে আইন হয়ে যায়। এজন্যই ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন–

تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

'স্বামী যদি অনুমতি নাও দেয় তবুও স্ত্রী যুদ্ধে বের হয়ে পড়বে।'

যদি প্রতিরোধমূলক না হয় বরং আক্রমনাত্মক হয় তখন যুদ্ধ হয় ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ নিজেদের পক্ষ থেকে যদি অগ্রগামী হয়ে অভিযান চালানোর সামর্থ্য থাকে, তবে মুসলিমদের উপরে জিহাদ করা ফরজে কেফায়া হয়ে যায়। একটি দল তাতে অংশগ্রহণ করলে সকলের পক্ষ থেকেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

যুদ্ধের আগে দাওয়াত

প্রশ্ন ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য যদি দাওয়াত না হয়; বরং ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করা হয়, তবে জিহাদের আগে ইসলামের দাওয়াত কেন দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কোনও ফরয বা ওয়াজিব কাজ নয়; বরং এটা সুন্নত। কেননা একবার যখন সাধারণ দাওয়াত হয়ে গেছে, মানুষের কানে ইসলামের ডাক পৌঁছে গেছে, তখন ঠিক যুদ্ধের সময় আর দাওয়াত দেওয়া ফরয নয়। এটা সুন্নত এজন্য যে, হতে পারে কোনও কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে। আর কোনও কাফের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, সেটা তার পক্ষ হতে জিযিয়া গ্রহণ অপেক্ষা শ্রেয়। জিযিয়া গ্রহণের অর্থ হল সে কুফর অবস্থায় থাকবে, যদিও মুসলিমদের আধিপত্য স্বীকার করে থাকবে। আর আধিপত্য স্বীকার করে হলেও কুফর অবস্থায় থাকাটা কিছু পসন্দনীয় কাজ নয়, কেননা ইসলাম গ্রহণেই দোজাহানের মুক্তি, তাই তার কল্যাণার্থে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সুন্নত, যাতে যে দোজাহানের মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে অন্তুতপক্ষে তাকে জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানানো হবে, যাতে এর মাধ্যমে তার জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। যদি কেবল দাওয়াতই উদ্দেশ্য হত, তবে জিযিয়ার পথ খোলা থাকত না। সে ক্ষেত্রে তার সামনে বিকল্প থাকত কেবল দু'টি– হয় ইসলাম গ্রহণ করা, নয়ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

একটি ভুল ধারণার নিরসন

কিছু লোকের ধারণা জিহাদ কেবল সেই সময় এবং সেই জাতির সঙ্গে বিধেয়, যারা দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক হয়। যদি কোনও কাফের-রাষ্ট্রে মুসলিম মুবাল্লিগ যায় এবং সেখানকার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে

চায়, কিন্তু তারা দাওয়াতের অনুমতি না দেয়; বরং তাতে বাধার সৃষ্টি করে, তবে তাদের সাথে জিহাদ করা বৈধ। পক্ষান্তরে তারা যদি দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি না করে; বরং স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও অবকাশ থাকে না।

এ ধারণা নিতান্তই ভুল। কেননা কেবল দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দেওয়ার দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, কেননা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কুফরীশক্তির দর্প চূর্ণ করা এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ

অর্থ : 'তোমরা তাদের সংগে যুদ্ধ কর, যাতে কোনও ফিতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর হয়ে যায়।'[১৫৭]

মুফাস্‌সিরগণের মতে ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরক। আয়াতে বলা হচ্ছে– যতক্ষণ পর্যন্ত কুফর ও শিরকের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

এটা একটা বাস্তবতা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে শিরক ও কুফরের প্রভাব বাকি থাকে এবং মানুষ কুফরীশক্তির ভয়ে ভীত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যের দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। যেমন আজকাল মানুষের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রভাব যথেষ্ট। মানুষ আমেরিকা ও ইউরোপের শক্তিমত্তাকে ভয় করে, যে কারণে তাদের প্রতিটি কথাই মানুষ গুরুত্বের সাথে নেয়। এর বিপরীতে যদি কোনও সত্যকথাও বলা হয়, মানুষ তাতে কর্ণপাত করতে চায় না এবং বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তা গ্রহণ করে না।

যে-কোনও কথা শান-শওকত ও বলবত্তার সাথে বলা হলে মানুষের অন্তরে তা প্রভাব বিস্তার করে এবং তারা তা সহজে গ্রহণ করে নেয়। এজন্যই কুফরীশক্তির প্রভাব খতম করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনও দেশ যদি দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি দিয়ে দেয় এবং তাতে কোনও বাধার সৃষ্টি না করে, তবে তাই দেখে এ কথা মনে করা যে, এখন আর সেই দেশের সাথে জিহাদের কোনও প্রয়োজন নেই, যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে, তবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

---

১৫৭. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৩

বর্তমানকালে কোন্ পর্যায়ের জিহাদ চলছে

প্রশ্ন ঃ আজকাল বিভিন্ন দেশে যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে, তা কোন্ পর্যায়ের জিহাদ?

উত্তর ঃ আজকাল কাশ্মীর, বসনিয়া প্রভৃতি স্থানে যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে, তা প্রতিরোধমূলক জিহাদ। বসনিয়ার মুসলিমদের প্রতি কাফেরগণ হামলা চালিয়ে তাদের উপর জুলুম করেছিল। মুসলিমগণ সেই জুলুমের মোকাবেলায় হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। এমনিভাবে ভারত জোরপূর্বক কাশ্মীরকে দখল করে নিয়েছে। কেননা দেশবিভক্তির সময় সিদ্ধান্ত এই হয়েছিল যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ নীতি অনুযায়ী কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ ছিল। কিন্তু ভারত সেখানে আগ্রাসন চালায় এবং জোরপূর্বক তা দখল করে নেয়। তাই কাশ্মীরকে অধিকৃত অঞ্চল বলা হয়। এখন সেখানকার অধিবাসীগণ যদি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে এবং কাফেরদের আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অস্ত্র তুলে নেয়, তবে সে অধিকার তাদের সম্পূর্ণ আছে এবং তাদের এ সংগ্রামকে প্রতিরোধমূলক জিহাদ বলা হবে।

এই হল জিহাদের হাকীকত ও তার লক্ষ-উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত এ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ও আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে দেওয়া হল।

সূত্র : ইন'আমুল-বারী ৭খণ্ড, ৪৬৩-৪৮০পৃ.

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝١٨

অর্থ : ‘আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে নামায কায়েম করে এবং যারা যাকাত দেয় আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরূপ লোকদের সম্পর্কে আশা আছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’[১৫৮]

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মুহতারাম অতিথিবৃন্দ এবং আমার সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ!

আস-সালামু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

এটা আমাদের সকলের জন্য অতিবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আজ আমরা একটি মসজিদের ভিত্তিস্থাপনের কাজে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। মসজিদ নির্মাণ করা কিংবা মসজিদের কোনও কাজে কোনওভাবে অংশগ্রহণ করতে পারা একজন মুসলমানের পক্ষে অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। এইমাত্র যে আয়াত তিলাওয়াত করা হল, এতে মসজিদ নির্মাণকে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই মসজিদ নির্মাণ

---

১৫৮. সূরা তওবা, আয়াত ১৮

করা একজন মানুষের মু'মিন হওয়ার আলামত এবং এটা তার ঈমানের সর্বপ্রথম দাবি।

মসজিদের মর্যাদা

ইসলামী সমাজে মসজিদের মর্যাদা কত বড় এবং এর গুরুত্ব কত বেশি, তা কোনও মুসলিমের অজানা নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযকে দ্বীনের স্তম্ভ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সতর্ক করেন, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করল সে তার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখল আর যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে তার দ্বীনের স্তম্ভ ভেঙে ফেলল। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে যথার্থ নামায সেটাই এবং তাঁর কাছে সেই নামাযই সত্যিকারভাবে কবুল হয়, যা মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা হয়। যে নামায ঘরের ভেতর পড়া হয়, ফকীহগণের পরিভাষায় তা ক্রটিপূর্ণ নামায। মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করলেই নামায কামিল ও পূর্ণাঙ্গ হয়।

মসজিদ ও মুসলিম জাতি

মসজিদ নির্মাণ মুসলিম উম্মাহ'র এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা যখন যেখানে গিয়েছে সেখানে তারা নিজের ঘরবাড়ি হোক বা নাই হোক, সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও এই বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেনি। যখন জানের উপরে হুমকি ছিল, মাল ও দৌলতের কমতি ছিল এবং অভাব-অনটনের ভেতর দিন কাটছিল, সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও এ জাতি মসজিদ নির্মাণকে প্রথম কাজ গণ্য করেছে। কোনও অবস্থাতেই তারা এ কাজ পিছনে ফেলেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটনা

আমার স্মরণ আছে, প্রায় সাত বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এক সফর ছিল। এ দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের একদম দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। সেখানকার মশহুর নগর 'কেপটাউন' সারাবিশ্বে পরিচিত। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মালয় থেকে আগত। মালয়কে বর্তমানে মালয়েশিয়া বলা হয়। কেপটাউনে যত মুসলিম আছে তার ৮০ শতাংশ মালয় থেকে আগত অভিবাসী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মালয়ের লোক এখানে কিভাবে আসল? এর জবাবে আমাকে আশ্চর্যজনক এক ইতিহাস শোনানো হল। এর ভেতর সকলের জন্যই মূল্যবান শিক্ষা আছে।

মালয়বাসীদের কেপটাউন আগমন

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ যেভাবে ভারতবর্ষে আগ্রাসন চালিয়ে এখানকার মানুষকে গোলাম বানিয়েছিল, ঠিক সেরকম আগ্রাসন তারা মালয়দ্বীপেও চালিয়েছিল। তারা জোরপূর্বক এ দেশটি দখল করে নেয় এবং মানুষের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু সেখানকার সমস্ত মানুষ ইংরেজ আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বিপুল সংখ্যক মালয়বাসী তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তারা স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তারা ছিল নিঃসম্বল। ছিল না যুদ্ধসামগ্রী এবং অন্য কোনও উপায়-উপকরণ। শেষ পর্যন্ত বৃটিশশক্তি তাদের উপরে বিজয়ী হল। অতঃপর তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাতে লাগল। হাজার হাজার মালয়বাসীকে গ্রেফতার করে তাদের পায়ে শিকল লাগিয়ে কেপটাউনে নিয়ে আসল। এভাবে কেপটাউনে বিপুল সংখ্যক মালায়ান মুসলিমদের আগমন ঘটল। মূলত তারা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্দি। আজ বৃটিশ এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ মানবতাবাদের গীত গায়, মানবাধিকারের শ্লোগান দেয় এবং বিশ্ববাসীকে গণতন্ত্রের সবক শেখায়। অথচ একসময় তারা বিশ্বের কোটি কোটি স্বাধীন মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তাদের হাতে-পায়ে শিকল পড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, নিজ ধর্মপালনের অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছিল। বন্দি মুসলিমদের এ অনুমতি ছিল না যে, তারা নিজেদের রীতি মোতাবেক নামায পড়বে। নিজ ঘরেও তাদের নামায আদায়ের স্বাধীনতা ছিল না। কাউকে নামায পড়তে দেখলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। অথচ আজ তারাই কিনা মানবতাবাদী এবং তারাই আজ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী।

রাতের অন্ধকারে নামায আদায়

মালয় থেকে ধরে নিয়ে আসা সেই বন্দি মুসলিমদেরকে কেপটাউনে কঠিন কঠিন শ্রমের কাজে নিয়োজিত করা হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। রাতের বেলা খানা খাওয়ার পর তাদের মনিব যখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যেত, তখন বন্দিদের পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হত, যাতে তারা তাদের বন্দিনিবাসে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিতে পারে। মনিব তো ভাবত শ্রমিকগণ আপন আপন স্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু এদিকের দৃশ্য ছিল ভিন্ন। তারা শিকল থেকে মুক্তি পেয়ে চুপিসারে কোনও পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেত। সেখানে তারা সারাদিনের নামায একত্রে

জামাতের সাথে আদায় করত। এভাবে তারা দীর্ঘকাল লুকিয়ে লুকিয়ে নামায আদায় করতে থাকল।

নামায পড়ার অনুমতি

আল্লাহ তা'আলার আজব কারিশমা। পৃথিবীর দেশে দেশে দাসদের সাথে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। রাজ্যবিস্তারের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে কেপটাউনও নিস্তার পেল না। এখানে ডাচ বাহিনী হামলা করে বসল। মালায়ান মুসলিমগণ যেহেতু অত্যন্ত লড়াকু ছিল, তাদের বীরত্বের সুখ্যাতি ছিল, বৃটিশরা তা প্রত্যক্ষও করেছিল, এবার তারা তাদের সেই বীরত্বকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে চাইল। তারা তাদেরকে বলল, আমাদের শত্রুগণ এখানে হামলা চালিয়েছে, আমরা চাই তোমরা আমাদের সহযোগিতা করবে। তোমরা তাদের মোকাবেলায় নেমে পড়। তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তাদের সাথে লড়াই কর। তাদেরকে এখান থেকে হটিয়ে দাও। কোনওক্রমেই যাতে তারা কেপটাউন দখল করতে না পারে। মালায়ান মুসলিমগণ বলল, কেপটাউন তোমাদের শাসনাধীন থাকুক বা ডাচদের, আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের পক্ষে তোমরা উভয়েই সমান। ডাচগণ বিজয়ী হলে তাতে আমাদের মনিব বদল হবে মাত্র। আজ তোমরা মনিব আছ, কাল তারা মনিব হবে। উভয় অবস্থাতেই আমাদের হাল সমান। বিজয়ী তোমরা হও বা তারা, তাতে আমাদের অবস্থার কোনও বদল হবে না। অবশ্য তোমরা যদি আমাদেরকে তাদের সাথে লড়তে বল, তবে আমরা সেজন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের দাবি শুধু একটা– আমাদেরকে কেপটাউনে নামায পড়তে দেওয়া হোক এবং সেজন্য আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হোক।

মসজিদ নির্মাণের দাবি

দেখুন তাদের ঈমান। তারা টাকা-পয়সা দাবি করল না, স্বাধীনতা দাবি করল না এবং পার্থিব কোনও সুযোগ-সুবিধাও চাইল না। দাবি একটা করল বটে, কিন্তু তা কেবলই 'ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়– আমাদেরকে নামায পড়তে দেওয়া হোক, আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হোক। ইংরেজ তাদের দাবি মেনে নিল। সেমতে তারা ডাচদের মোকাবেলায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসম বীরত্বের সাথে তারা লড়াই করল। ডাচ বাহিনী তাদের সে বীরত্বের সামনে টিকতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। পরিশেষে তারা জয়লাভ করল।

ডাচদেরকে হটিয়ে দেওয়ার পর মুসলিমগণ বৃটিশদের বলল, আমরা মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চেয়েছিলাম। তোমরা আমাদের সে দাবি মেনে নিয়েছিলে। সুতরাং এবার তা পূরণ করা হোক। ইংরেজগণ তাদেরকে অনুমতি দিল। তারা কেপটাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করল। কেপটাউনে তারা যখন মসজিদ নির্মাণ করে, তখন তারা অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিন কাটাচ্ছিল। তাদের না ছিল অর্থ, না আসবাব-উপকরণ। এমনকি কিবলা কোন্ দিকে তা বিশুদ্ধভাবে নির্ণয় করার মত কোনও মাধ্যমও তাদের কাছে ছিল না। কেবল অনুমানের ভিত্তিতে তারা কিবলার দিক নির্ণয় করে নেয়। সে নির্ণয়ে তাদের কিছুটা ভুল হয়ে যায়। প্রকৃত দিক থেকে বিশ কি পঁচিশ ডিগ্রী সরে যায়। সে ভুল ধরা পড়ে অনেক পরে। আজ সেই মসজিদে নামাযকালে কাতারে একটু বাঁকিয়ে দাঁড়াতে হয়। সোজাসুজি দাঁড়ালে রোখ ঠিক হয় না।

যাহোক তারা সেদিন কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা দাবি করেনি। আমাদেরকে ঘর-বাড়ি বানিয়ে দাও, টাকা-পয়সা দাও, পানাহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দাও ইত্যাদি পার্থিব কোনও বিষয়ের দাবি সেদিন তারা তুলেনি। সর্বপ্রথম যে দাবি তারা সেদিন উত্থাপন করেছিল, তা ছিল কেবলই মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে—আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণ করতে দাও, যাতে আমরা নামায পড়তে পারি। এটাই মুসলিম উম্মাহ'র ইতিহাস। তারা সর্বদা মসজিদ নির্মাণকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যত সংকটাপূর্ণ অবস্থাই হোক, মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বে তারা কখনও শিথিলতা প্রদর্শন করেনি।

ঈমানের আস্বাদ

প্রকৃতপক্ষে ঈমানের স্বাদ ও মজা কেবল এ ধরনের লোকই পেয়ে থাকে। আমি-আপনি তো দ্বীন পেয়েছি বসে বসে। মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্ম হয়েছে, তাদেরকে মুসলিম পেয়েছি, ব্যস আমরাও মুসলিম। দ্বীন অর্জনের জন্য কোনও রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি, টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়নি, কোনও রকমের কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়নি এবং দিতে হয়নি কোনও কুরবানী। একদম মুফতে পেয়ে গেছি। তাই মুফতে পাওয়া দ্বীনের কোনও মূল্য ও মর্যাদা আমাদের অন্তরে নেই। কিন্তু এই দ্বীনের জন্য যাদেরকে কষ্ট করতে হয়েছে, কুরবানী দিতে হয়েছে, বিভিন্ন রকমের ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে, দ্বীনের সত্যিকারের মূল্য তারাই বোঝে এবং তারাই এর স্বাদ ও মজা উপলব্ধি করে থাকে।

আমাদের উচিত শুক্র আদায় করা।

ঘটনাটি আমি এমনি এমনিই বর্ণনা করিনি। এটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুক্রের চেতনা জাগ্রত করা। আমাদের উচিত এজন্য আল্লাহর শুক্র আদায় করা যে, তাঁর মেহেরবানীতে মসজিদ নির্মাণে আমাদের কোনও বিধি-নিষেধ নেই, কোনও রকমের ঝামেলা পোহাতে হয় না, কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয় না; বরং যখন যেখানে মসজিদ বানাতে চাই অনায়াসেই বানিয়ে ফেলতে পারি। এ মসজিদের সাথে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক। মসজিদকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন আবর্তিত হয়। কাজেই মসজিদ নির্মাণের এই সময়টি আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ সৌভাগ্য আমাদের উপলব্ধি করা উচিত এবং সেজন্য এ নির্মাণকার্যে আমাদের প্রত্যেকেরই শরীক থাকা উচিত, তা যেভাবেই হোক, টাকা-পয়সা দিয়ে হোক, পরামর্শ দিয়ে হোক, কায়িক শ্রম দিয়ে হোক, কথা বা কাজ দিয়ে হোক। মোটকথা যেভাবেই হোক না কেন, মসজিদ নির্মাণে শরীক থাকতে পারাটা অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মসজিদ আবাদ হয় যেভাবে

আমি দ্বিতীয় যে কথা আরয করতে চাই তার সম্পর্ক মসজিদ আবাদ করার সাথে। আমরা মসজিদ আবাদ করা বলতে এর প্রাচীর, ছাদ ও অবকাঠামো নির্মাণকে বুঝি। কিন্তু এটা মসজিদের প্রকৃত আবাদকরণ নয়। ইট-বালু, সিমেন্ট-সুরকি ইত্যাদির দ্বারা একটা ঘর তৈরি হয় মাত্র। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আপনাদের জানা আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বপ্রথম যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ মসজিদে নববী, তার দেয়াল, ছাদ কিছুই পাকা ছিল না; বরং খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর খেজুর পাতার ছাউনি দিয়ে নিতান্তই সাদামাঠা একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে মসজিদে হারামের পর সেই মসজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান কোনও মসজিদ অস্তিত্বলাভ করেনি। এর দ্বারা বোঝা গেল মসজিদ কেবল দেয়াল-ছাদের নাম নয়, মিনার ও মেহরাবের নাম নয়। ইট-বালু ও সিমেন্ট-সুরকি দ্বারা স্থাপনা তৈরি করলেই মসজিদ হয়ে যায় না। প্রকৃতপক্ষে মসজিদ হল সিজদাকারীদের সিজদাস্থলের নাম। একটি আলিশান স্থাপনা তৈরি করা হল, তাতে বেহিসাব টাকা-পয়সা খরচ করা হল, অসাধারণ নকশা ও কারুকার্যে চমকে দেওয়া হল, কিন্তু সেখানে কোনও মুসল্লি নেই, কারও সিজদা পড়ে না। মুসল্লি থেকে বিরান

একটা শানদার ঘর মাত্র। তা যতই শানদার হোক না কেন, মুসল্লিবিহীন ওই স্থাপনা সত্যিকারের কোনও মসজিদ নয়, একটা বিরান ঘর মাত্র। বস্তুত মসজিদ আবাদ হয় নামাযীদের দ্বারা। যিক্‌র ও তিলাওয়াতের দ্বারা।

কিয়ামতের আগে মসজিদের অবস্থা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের আগে যা-যা ঘটবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সেগুলোকে কিয়ামতের আলামত বলে। এ রকমের একটি আলামত হল–

مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ فَرَاغٌ

'তাদের মসজিদসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু তা হবে বিরান।'[১৫৯]

অর্থাৎ তখন চমৎকার-চমৎকার মসজিদ তৈরি করা হবে। অত্যন্ত শানদার স্থাপনা, দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য। বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোনও কমতি থাকবে না, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তা হবে বিরান ও পরিত্যক্ত, কারণ তাতে নামাযী থাকবে না কিংবা খুব কমই থাকবে। যে কাজের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কাজ তাতে কমই করা হবে। নামায, যিকর, তিলাওয়াত ইত্যাদির দারুণ অভাব থাকবে। এরকম মসজিদ বাহ্যত যতই আবাদ হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা বিরান। এরকম মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করেই মরহুম ইকবাল বলেন–

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

'ঈমানের উত্তাপধারীগণ মসজিদ তো বানিয়ে ফেলল রাতারাতি,
কিন্তু মন তাদের পুরোনো পাপী, নামাযী হতে পারল না তা বহু বছরেও।'

শেষকথা

যাহোক যেসকল লোক এ মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছে তারা বড় সৌভাগ্যবান, সে অংশগ্রহণ যে পন্থায়ই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে সহজ করে দিন, সবরকম জটিলতা দূর করে দিন এবং একে পরিপূর্ণতায় পৌছিয়ে দিন– আমীন।

---

১৫৯. শু'আবুল ঈমান ৪খণ্ড, ৪২৩ পৃ., হাদীছ নং ১৮৫৮

কিন্তু আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কেবল স্থাপনা তৈরিতেই শেষ হয়ে যায় না। ইমারত দাঁড় করানোর পরও দায়িত্ব বাকি থেকে যায়; বরং সেটাই আসল দায়িত্ব। অর্থাৎ মসজিদকে নামাযের দ্বারা আবাদ করা এবং যিকর ও তিলাওয়াত দ্বারা মুখর করে রাখা। আমরা যেন এসব কাজে সদা যত্নবান থাকি।

ইসলামী সমাজে মসজিদ কেন্দ্রীয় মর্যাদার ধারক। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম জীবন আবর্তিত হয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই আখলাক-চরিত্র নির্মিত হয়, নীতি-নৈতিকতা গঠিত হয়, কাজকর্মে সুষ্ঠুতা আসে, চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ হয়, জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে। বস্তুত এসব কাজের জন্যই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাহ্যিক আবাদের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ আবাদও লক্ষবস্তু থাকে এবং তা থাকাই চাই। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ– এই মসজিদ প্রতিষ্ঠাকে যেন তিনি এই মহল্লাবাসীর জন্য কল্যাণ ও বরকতের উপায় বানিয়ে দেন, এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য যা-কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, তা পালনের তাওফীক এই মহল্লাবাসীকে দান করেন এবং এই মসজিদকে সত্যিকারের একটি আবাদ মসজিদ হিসেবে কবুল করে নেন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১০ খণ্ড, ১৭৫-১৮২ পৃ.

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা : শর্ত ও সীমারেখা

عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَالِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" وَ لَمْ اَكُنْ لَاُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ" فَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ اِبْنُ عَبَّاسٍ

'ইকরিমা (রহ.) থেকে বর্ণিত, একদল লোক ইসলাম পরিত্যাগ করলে হযরত 'আলী (রাযি.) তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেন। বিষয়টা হযরত ইবন 'আব্বাস (রাযি.)-এর কানে গেলে তিনি বললেন, আমি হলে তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে হত্যা কর। আমি তাদেরকে আগুনে জ্বালাতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিও না। একথা হযরত 'আলী (রাযি.)-এর কানে গেলে তিনি বললেন, ইবন 'আব্বাস সঠিক বলেছে।'[১৬০]

এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত 'আলী (রাযি.) যাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাদের অপরাধ ছিল ইসলাম ত্যাগ করা। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সাবাঈ দলের লোকজনকে। সাবাঈ বলা হয় 'আব্দুল্লাহ ইবন সাবার অনুসারীদেরকে। সাহাবায়ে কিরামের যমানায় যে ফিতনার উদ্ভব হয়েছিল, তার মূলে ছিল এই ব্যক্তি। মূলে সে ছিল ইহুদী। ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করেছিল। শিয়া-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের মূলেও এই ব্যক্তি। সে দাবি করেছিল হযরত 'আলী (রাযি.) ঈশ্বর। তার অনুসারীগণ এই বিশ্বাস গ্রহণ করে নেয়।

---

১৬০. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৩৭৮; বুখারী, হাদীছ নং ২৭৯৪; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৯৯১; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৮৭; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২৫২৬

হযরত 'আলী (রাযি.) যখন এ কথা জানতে পারেন, ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি প্রথমত তাদেরকে তাওবা করতে বলেন, কিন্তু তারা তাওবা করল না। শেষে তিনি তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেন।

যাহোক হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রাযি.) যখন এই শাস্তির কথা জানতে পারলেন, তখন এতে তিনি আপত্তি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, আমি হলে তাদেরকে এই শাস্তি দিতাম না; বরং তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা এ ক্ষেত্রে হত্যা করাই বিধান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে হত্যা কর। অপরপক্ষে তিনি আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর কাজ। আল্লাহর এই বিশেষ শাস্তি কেবল তিনিই দিতে পারেন, অন্য কারও দেওয়ার অধিকার নেই। পরে যখন হযরত 'আলী (রাযি.) হযরত ইবন 'আব্বাস (রাযি.)-এর এই আপত্তির কথা জানতে পারলেন তিনি স্বীকার করলেন যে, ইবন 'আব্বাস সঠিক বলেছেন। বাস্তবিকই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। সেই হিসেবে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা আমার উচিত হয়নি। আমার উচিত ছিল তাদেরকে হত্যা করা।

মুরতাদের শাস্তি

এ হাদীছ দ্বারা মৌলিকভাবে দু'টি বিধান জানা গেল। প্রথমত জানা গেল কোনও মানুষ বা জীবজন্তুকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল মুরতাদের শাস্তি হত্যা করা। অর্থাৎ কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনও ধর্মের অনুসারী হয়ে যায় বা নাস্তিক হয়ে যায়, তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।ফকীহগণের সকলেই এ ব্যাপারে একমত। দীর্ঘ তেরশ' বছর এ বিষয়ে ঐকমত্যও ছিল। কারও কোনও দ্বিমত ছিল না।

এ বিষয়ে ভিন্নমতের উদ্ভব হয়েছে আমাদের এই শেষ যমানায়। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের এই যুগের কিছু লোক ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। তারা ইসলামের আধুনিক রূপ দান করার জন্য ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। ইসলামের নতুন ব্যাখ্যাদানকে তারা একটি আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা শোর তুলেছে। তার মধ্যে মুরতাদের শাস্তিও একটি। তাদের মতে মুরতাদকে হত্যা করা 'চিন্তার স্বাধীনতা' বা 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'-এর পরিপন্থী। পাশ্চাত্য সভ্যতা নতুন নতুন দ্বীন খাড়া করছে। এ সভ্যতার একটা কলেমা

হল জন্মগতভাবে প্রতিটি লোক স্বাধীন চিন্তার অধিকারী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। এটা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মতবাদের ভিত্তিতেই তারা প্রশ্ন তুলেছে– একজন লোক মুসলিম হয়েছে, কিন্তু ইসলাম তার বুঝে আসেনি; বরং (না'উযুবিল্লাহ) সে ইসলামকে একটা ভুলধর্ম মনে করে। সে এই ভুলের উপর থাকতে চায় না।তাই সে তার ধর্ম বদল করেছে। ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? ধর্ম পরিবর্তন করা পার্থিব কোনও অপরাধ তো নয়! অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তবে সেটা কেবলই আখিরাতের ব্যাপার। সেজন্য আখিরাতে যা হওয়ার হবে। দুনিয়ায় কেন কাউকে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধা দেওয়া হবে এবং কেনই বা ধর্ম পরিবর্তন করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে? যদি ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দেওয়া হয় কিংবা সে কারণে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে তা হবে তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং তা হবে তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ।

একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা

আমাদের সমাজে একটা মহল আছে, যাদের কাজ হল ইসলামের সবকিছুকে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার সংগে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। যখনই পাশ্চাত্যের দিক থেকে ইসলামের উপর কোনও প্রশ্ন তোলা হয়, এই মহলটি হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। তারা বলে আপনাদের এই আপত্তি আমাদের ধর্মের ব্যাপারে খাটে না। আমাদের ধর্ম ওরকম নয়। যেমন, পাশ্চাত্য যখন মুরতাদের শাস্তি নিয়ে আপত্তি তুলল, এই মহলটি বলে উঠল শুধু শুধুই আপনারা ইসলামের বদনাম করছেন। ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হত্যা করা নয়। তারা কুরআন মাজীদের একটি আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। ইরশাদ হয়েছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

অর্থ : 'দ্বীনের বিষয়ে কোনও জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।'[১৬১]

সুতরাং এ আয়াতের আলোকে যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, যার ইচ্ছা আনবে না। এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারও উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। স্বাধীনভাবে যার ইচ্ছা সে ঈমানের উপর থাকবে আবার যদি

১৬১. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

ঈমান ছেড়ে দিতে চায়, সেই স্বাধীনতাও তার থাকবে। এ আয়াতের আলোকে তা থাকাই চাই। সেই হিসেবে কেউ ইসলাম পরিত্যাগ করলে তা কোনও অপরাধ হবে না এবং সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়াও যাবে না।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং কিছু প্রশ্ন

প্রথমে এ বিষয়টা বুঝে নেওয়া দরকার যে, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশে স্বাধীনতা কি কোনও নীতি-নিয়মের মুখাপেক্ষী, নাকি এটা বল্গাহীনভাবে চলতে পারে? অর্থাৎ যার যা ইচ্ছা চিন্তা করবে, যার যা মনে চায় করবে এবং যখন যা খুশি বলতে পারবে? এ ব্যাপারে কারও কোনও আপত্তি তোলার বা কোনও বাধা সৃষ্টি করার অধিকার নেই? এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা শোনাচ্ছি।

'অ্যামানেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে। তার হেড অফিস প্যারিসে। বছর কয়েক আগে এই সংস্থার জনৈক রিসার্চ স্কলার সার্ভে করার জন্য পাকিস্তানে আসল। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কেন সে আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসে গেল। সে তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, আমাদের উদ্দেশ্য চিন্তার মুক্তি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কাজ করা। অনেক লোক মুক্তচিন্তার কারণে কারাগারে বন্দি আছে। এটা এমনই একটি অবিসংবাদিত বিষয়, যে সম্পর্কে কারও কোনও ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। এ বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের মতামত জানার জন্য আমাকে পাকিস্তান পাঠানো হয়েছে। আমি শুনেছি বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানীজন ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে এবং আপনি নিজেও একজন বিদ্বান ও চিন্তাশীল মানুষ। তাই আমি আপনাকেও কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

আমি তার সার্ভে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তার কোনওরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর বললাম, অনুমতি দিলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। তিনি বললেন, প্রশ্ন করতে তো আমি এসেছিলাম, কিন্তু উল্টো আপনি প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন। ঠিক আছে, তাই হোক।

আমি বললাম, আপনার সংস্থাটি মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাদানের লক্ষে কাজ করছে। আমি জানতে চাচ্ছি আপনারা কি বলতে চান চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার,যা প্রতিটি মানুষ নিঃশর্তভাবে ভোগ করবে, নাকি এর জন্য কোনও শর্ত ও সীমারেখা আছে? উদাহরণত এক ব্যক্তি বলে, দুনিয়ায় যত বিত্তবান লোক আছে তারা অবৈধ পন্থায় অর্থবিত্ত সঞ্চয় করেছে, তাই তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। সে তার এ চিন্তা ও মতটি সর্বস্তরে

ছড়িয়ে দিতে চায়। এজন্য তার একটি দল প্রতিষ্ঠারও ইচ্ছা আছে, যেই দলটির কাজ হবে ধনীর ঘরে ডাকাতি করে তার সমস্ত সম্পদ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। এই যে লোকটি এভাবে চিন্তা করছে, তার এই চিন্তা কি সঠিক এবং তার এই মত প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, নাকি তাকে এর থেকে নিবৃত্ত করা হবে?

তিনি বললেন, তাকে এই মত প্রচারের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাকে বাধা দিতে হবে।

আমি বললাম, কেন বাধা দেওয়া হবে? যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং এটা যখন নিঃশর্তভাবেই ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, তখন তাকে এই মতপ্রকাশে কেন বাধা দেওয়া হবে? বাধা দেওয়া হলে তো তার অর্থ দাঁড়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অবাধ ও নিঃশর্ত নয়; বরং এর জন্য কিছু শর্ত ও সীমারেখা আছে। এটা এমনকিছু শর্তের অধীন, যা রক্ষা করা জরুরি। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সেই শর্তসাপেক্ষেই ভোগ করা যাবে। তাহলে কি আপনি স্বীকার করছেন যে, মতপ্রকাশের জন্য কিছু শর্ত ও সীমারেখা থাকা চাই?

তিনি বললেন, হাঁ এর জন্য কিছু শর্ত থাকা চাই। সুনির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত। উদাহরণত আমার মত হল, মুক্তচিন্তার সাথে এই শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে যে, তা যেন অন্যের উপরে চরমপন্থা আকারে প্রকাশ না পায়। অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে অন্যের উপর কিছুতেই চড়াও হওয়া যাবে না।

আমি বললাম, আপনি যেমন নিজ চিন্তা অনুযায়ী মুক্তচিন্তার উপরে একটি শর্ত আরোপ করেছেন, তেমনি অন্যকেউ যদি নিজ চিন্তা অনুযায়ী ভিন্ন কোনও শর্ত আরোপ করে, তবে তারও সেই অধিকার থাকবে কিনা? যদি তা না থাকে তাহলে এর কী যুক্তি যে, আপনার চিন্তাকে তো মূল্যায়ন করা হবে, কিন্তু আরেকজনের চিন্তাকে করা হবে প্রত্যাখ্যান? সুতরাং মূল প্রশ্ন হল যে, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশে স্বাধীনতা কী কী শর্তের আওতাধীন হবে এবং আপনার কাছে এমন কী মাপকাঠি আছে, যা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবেন এর জন্য কি কি শর্ত আরোপ করা হবে এবং কি কি শর্ত আরোপ করা হবে না?

তিনি উত্তর দিলেন, আমরা এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যথারীতি চিন্তা করিনি।

আমি বললাম, আপনি এতবড় আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত আর এ কাজের সার্ভে করার জন্য আপনি এতদূর এসেছেন, অথচ মুক্তচিন্তার জন্য কী সীমারেখা থাকা উচিত সেই প্রশ্ন এখনও পর্যন্ত আপনার মাথায় আসেনি। এদিকে লক্ষ করে আমার ধারণা হয় আপনাদের পরিকল্পনা সফল হওয়ার নয়।

তিনি বললেন, আপনার এসব চিন্তা-ভাবনা আমি আমার সংস্থায় পৌছাব আর এ সম্পর্কে আমাদের যে লিটারেচার আছে তাও আপনার কাছে পৌছাব। এই বলে সে আমার শুকমত একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

এই ঘটনার উল্লেখ দ্বারা আমার বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যারা মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে এবং এই অস্পষ্ট শ্লোগান নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে, তাদের নিজেদেরই খবর নেই– কোন্ মুক্তচিন্তা কাম্য এবং কোন্টা কাম্য নয়, কোন্ মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে এবং কোন্টি প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া যায় না আর এই স্বাধীনতার সীমারেখা ও শর্তাবলীই বা কি। এবার চিন্তা করুন এই অস্পষ্ট ভাবনার ভিত্তিতে কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহ'র মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে চায় এবং কুরআন-সুন্নাহকে টেনে-কষে এই মতের সপক্ষে দাঁড় করাতে চায়, তবে কি তা আদৌ কোনও বুদ্ধিমত্তার কাজ হতে পারে এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির আলোকে এ কাজ কি আদৌ অনুমোদনযোগ্য হতে পারে?

অপব্যাখ্যার জবাব

যারা কুরআন মাজীদের আয়াত لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ (দ্বীনের বিষয়ে কোনও জবরদস্তি নেই।)– এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে, তাদের কাছে মূলত এ আয়াতের অর্থ স্পষ্ট নয়। বস্তুত এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে– কাউকে জোরপূর্বক ইসলামে দাখিল করা হবে না। অর্থাৎ এ আয়াতের সম্পর্ক ইসলামে দাখিল করানোর সাথে, ইসলামগ্রহণ পরবর্তী কর্তব্য-কর্মের সাথে নয়। এ কারণেই পরে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى ۚ

অর্থ : 'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল।'[১৬২]

---

১৬২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬

এ আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য জানাচ্ছে, যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারব না। তাকে এই চাপ দেওয়া যাবে না যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, অন্যথায় শাস্তি পেতে হবে। এ আয়াতের শানে-নুযূল দ্বারাও এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী যুগের আগে অনেক সময় শিশুদেরকে ইহুদীধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হত। যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করল, আনসারগণ চিন্তা করলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে তো এখানে শিশুদেরকে ইহুদী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত, সেই হিসেবে এখন আমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছি না কেন? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

মুরতাদকে হত্যা করার বিধান কেন

এতো গেল ইসলাম গ্রহণের আগের কথা। কিন্তু কেউ যখন একবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তখন ইসলামের বিধানাবলী অনুসরণ করতে সে বাধ্য। তার জন্য ইসলাম পরিত্যাগেরও কোনও অনুমতি নেই। মুসলিম-রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় সে যদি ইসলাম পরিত্যাগ করতে চায়, তবে তা শৃংখলাবিরোধী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী একটি কাজ বলেই গণ্য হবে। মুসলিম-রাষ্ট্রে এরূপ কাজের অনুমতি দেওয়া যায় না। সে যদি ইসলাম ত্যাগ করতে চায়, তবে মুসলিম-রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে যাক এবং কোনও অমুসলিম-রাষ্ট্রে চলে যাক। অতঃপর সেখানে সে যা ইচ্ছা তাই করুক। সেখানে তো আমাদের কোনও কর্তৃত্ব নেই, তাই তার কোনও কাজের দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে না। পক্ষান্তরে মুসলিম-রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় সে ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলে তা কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। সেটা হবে শরীরের কোনও অঙ্গে পচন ধরার মত। এরূপ অঙ্গকে কেটে ফেলা জরুরি, অন্যথায় সেই পচন অন্যান্য অঙ্গেও সংক্রমিত হবে, ফলে সম্পূর্ণ দেহই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য পচন ধরা অঙ্গটি কেটে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

'যে ব্যক্তি তার দ্বীন বদলে ফেলবে, তাকে হত্যা করো।'[১৬৩]

---

১৬৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৩৭৮; বুখারী, হাদীছ নং ২৭৯৪; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৯৯১; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৭৮৭; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ২৫২৬

মুরতাদকে হত্যা করা সম্পর্কিত হাদীছ অর্থের দিক থেকে প্রায় 'মুতাওয়াতির' (অর্থাৎ প্রতি যুগে তার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত বিপুল যে, তারা সবাই সম্মিলিতভাবে মিথ্যা বর্ণনা করেছে বলে ধারণা করার অবকাশ নেই। এরূপ হাদীছ দ্বারা সন্দেহাতীত জ্ঞান অর্জিত হয়, ফলে তা মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়)। আমি 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুরতাদকে হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীছসমূহ একত্র করেছি। তাতে দেখা যায় সতেরটি হাদীছ ও আছার দ্বারা মুরতাদের এ শাস্তি প্রমাণিত। কাজেই মুরতাদের শাস্তি হত্যা করা নয়— এ দাবি করার কোনও বৈধতা নেই।

মুনাফিককে হত্যা করার বিধান কেন দেওয়া হয়নি

প্রশ্ন হতে পারে, ইসলামে মুনাফিককে হত্যা করার বিধান কেন দেওয়া হয়নি? এর উত্তর হল, মুনাফিকী একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা মানুষের মনের ব্যাপার। দুনিয়াবী শাস্তির ভিত্তি বাহ্যিক অবস্থার উপরে। আমরা কারও বুক চিরে বলতে পারি না সে মু'মিন না মুনাফিক। মুনাফিককে যদি হত্যা করার বিধান দেওয়া হত, তবে সে বিধান কার্যকর করা সম্ভব হত না। কারণ যেহেতু এটা মনের বিষয়, তাই কারও সম্পর্কে এটা কী করে নির্ণয় করা যাবে যে, সে মুনাফিক? তা যেহেতু করা যায় না, তাই তাকে হত্যার বিধানও দেওয়া হয়নি। কিন্তু মুরতাদের বিষয়টা এরকম নয়। যে ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করে, সে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই করে। অর্থাৎ মুরতাদ হওয়াটা একটা প্রকাশ্য বিষয়। এ কারণেই তার উপরে হত্যার বিধান জারি করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুনাফিকদেরকে হত্যা না করা

প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের বেলায় তো এ কথা সঠিক যে, কে মুনাফিক আমরা তা নিরূপণ করতে পারি না, যেহেতু বিষয়টা প্রকাশ্য নয়, কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো ওহীর মাধ্যমে অনেক মুনাফিক সম্পর্কে তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তা সত্ত্বেও তিনি কেন তাদেরকে হত্যা করলেন না?

এর উত্তর হল, তিনি তাদেরকে কী কারণে হত্যা করেননি তা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। একবার জনৈক সাহাবী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি মুনাফিকদেরকে হত্যা করেন না কেন? উত্তরে তিনি জানান, আমি তাদেরকে হত্যা করলে ইসলামের শত্রুগণ এই অপপ্রচার চালাবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সংগীদেরকেও হত্যা করেন। অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে স্বীকার করে, তারাও তাঁর কাছে নিরাপদ নয়। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তা যাতে না হারায় এবং ইসলাম গ্রহণকে মানুষ জান-মালের নিরাপত্তাবিধায়ক বলে বিশ্বাস করে, সে লক্ষ্যেই তিনি মুনাফিকদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকেন।

মুরতাদকে হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীছের অপব্যাখ্যা

যারা মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে অস্বীকার করে, তারা যেসব হাদীছে এ শাস্তির কথা বলা হয়েছে তার বিভিন্ন মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। যেমন, তারা বলে এসব হাদীছের সম্পর্ক বিদ্রোহীর সাথে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা। হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনওরকম অবকাশ নেই। কেননা হাদীছের ভাষা হল– مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ। নিয়ম হল, যখন কোনও মূলধাতু থেকে উৎপন্ন বিশেষ্যের উপর কোনও বিধান আরোপ করা হয়, তখন সে মূলধাতুর অর্থটি সে বিধানের কারণ হয়ে থাকে। এ হাদীছে بَدَّلَ دِيْنَهٗ (যে ব্যক্তি দ্বীন পরিবর্তন করে)-এর উপর اُقْتُلُوْهُ (তাকে হত্যা কর)- এর বিধান আরোপ করা হয়েছে। বোঝা গেল দ্বীন পরিবর্তন করা হল হত্যার কারণ। বিদ্রোহ নয়, কারণ বিদ্রোহের কথা এ হাদীছের কোথাও নেই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهٖ (দ্বীন পরিত্যাগকারী)- এর সাথে اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (দল পরিত্যাগকারী)-এরও উল্লেখ আছে। কেউ কেউ এর দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, হত্যার বিধান দেওয়ার জন্য কেবল দ্বীন পরিত্যাগই যথেষ্ট নয়; বরং দল পরিত্যাগের শর্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থানে আমি এর বিস্তারিত জবাব দিয়েছি। বস্তুত اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ কথাটি اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهٖ -এর ব্যাখ্যামূলক বিশেষণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীন পরিত্যাগ করে, সে দলত্যাগীও বটে। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করার কোনও সুযোগ নেই।

মুরতাদকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের আমল

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে এ বিধানটি পালন করেছেন এবং মুরতাদের উপরে মৃত্যুদণ্ড জারি করেছেন, তাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, একমাত্র হত্যাই মুরতাদের শাস্তি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.)-কে ইয়ামানের গভর্ণর করে পাঠান, তখন সেখানকার গভর্ণররূপে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) কার্যরত ছিলেন। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.) সেখানে পৌছে দেখেন

এক ব্যক্তিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন এ লোক কে? বলা হল সে মুরতাদ হয়ে গেছে। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যক্তিকে হত্যা না করা হবে, ততক্ষণ আমি সওয়ারী থেকে নামব না। সুতরাং তাকে সে অবস্থায়ই হত্যা করা হল।[১৬৪]

দেখুন এখানে কোনও বিদ্রোহ পাওয়া যায়নি। কোনও দল ছিল না। একা এক ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল। তা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করা হয়। এর দ্বারা বোঝা গেল বিদ্রোহ শর্ত নয়, কেবল ইসলাম ত্যাগই হত্যার বিধান জারি হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এমনিভাবে বুখারী শরীফে 'আব্দুল্লাহ ইবন খতালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগালি করত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দান করেন। অথচ তার দিক থেকেও কোনও বিদ্রোহ পাওয়া যায়নি। এসবই প্রমাণ করে কেবল মুরতাদ হওয়ার কারণেও মৃত্যুদণ্ড জারি করা হবে।

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী ২ খণ্ড, ১১০-১১৭ পৃ.

---

১৬৪. বুখারী, হাদীছ নং ৬৪১২; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৪০৩

অপরাধ ও অপরাধ প্রতিরোধ

'করাচিতে চব্বিশ ঘন্টায় ১৬ চুরি, ৫৪ ব্যক্তি গ্রেফতার', 'স্বামীর হাতে স্ত্রীর নাসিকা কর্তন এবং দেবর কর্তৃক ভাবীর গায়ে এসিড নিক্ষেপ''এক মেয়ের জন্য সশস্ত্র দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, ১ নিহত ১৪ আহত', 'হত্যা, সন্ত্রাস, ছুরিকাঘাতের অপরাধে পুলিশের হাতে ৮ গ্রেফতার', 'সতীত্ব বিক্রির অভিযোগে১৩ কিশোরী ও ৫ নারী গ্রেফতার', 'চরস চোরাচালানি প্রসঙ্গে স্থানীয় ফার্মের মালিক গ্রেফতার'।

এগুলো হল প্রসিদ্ধ একটি দৈনিকের মাত্র একদিনের একপৃষ্ঠার শিরোনাম এবং এর সবগুলোই কেবল করাচির ঘটনা। এটা কেবল আজকের সংবাদপত্রেরই বিশেষত্ব নয়, প্রতিদিনই এ জাতীয় সংবাদে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরা থাকে। বছরের পর বছর এরকম চলে আসছে। ফলে মানুষের দৃষ্টি এ জাতীয় ঘটনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই এখন আর এর বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। একটা সময় ছিল যখন কোথাও কোনও হত্যার ঘটনা ঘটলে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হওয়ার কারণে মাসের পর মাস সে নিয়ে আলোচনা চলত, রাষ্ট্রীয় সব মেশিনারি সচল হয়ে উঠত,সরকারের সকল বিভাগে নাড়া পড়ে যেত, এবং হত্যাকারীকে তার কর্মের পরিণতিতে না পৌছানো পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত হত না। কিন্তু এখন তো দিনে-দুপুরেই মানুষের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং এগুলোকে কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয়ই মনে করা হয় না।

আপনি-আমি হররোজ এ জাতীয় সংবাদ পড়ছি। পড়েই ক্ষান্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি বড়জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, তারপর একদম নীরব।

আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন অপরাধ প্রবণতা এভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছে কেন? কেন নিত্যদিন এরকম খুন-খারাবি হচ্ছে? মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু আক্রান্ত হচ্ছে? আমাদের সমাজ-জীবন কি হামেশা এসব

চরিত্রহীনতার স্বীকার হয়ে থাকবে, নাকি এ অভিশাপ থেকে মুক্তির কোনও উপায়ও আছে?

সারাবিশ্বের চিন্তাশীল ও বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়ে নিজেদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ব্যবহার করে দেখেছে। বিভিন্নজন এর বিভিন্ন কারণও নির্দেশ করেছে। কেউ বলছে এসব অপরাধের একমাত্র কারণ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন, কেউ বলছে এর কারণ হল আইন-শৃংখলার অভাব, কেউ কেউ মনে করেন রাষ্ট্রীয় শিথিলতার কারণেই এসব নৈরাজ্য ঘটতে পারছে, কেউ আবার অজ্ঞতা ও অশিক্ষাকেই এ সুরতহালের জন্য দায়ী করছে। মোটকথা, যতমুখ ততকথা। এটা এমনই এক জটাজাল, যার মাথা যে কোথায় আছে তা কেউ খুঁজে পায় না।

প্রকৃতপক্ষে উপরে বর্ণিত প্রতিটি কথাই আপন-আপন স্থানে সঠিক। আলাদাভাবে এর প্রতিটিই অপরাধবৃদ্ধির কারণ। কিন্তু যে-কেউ গভীর দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে, সে বলতে বাধ্য হবে এর কোনওটিই অপরাধের মূল কারণ নয়। কেননা এসবই যদি অপরাধের আসল কারণ হত, তবে যেসকল দেশে এসব কারণের একটিও পাওয়া যায় না সেগুলো তো ফিরিশতাদের বাসভূমিতে পরিণত হয়ে যেত। আজকালকার পরিভাষায় যেগুলোকে উন্নত রাষ্ট্র বলা হয়, সেই পশ্চিমা জগতের কোনও দেশে এতটা দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন নেই এবং নেই অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। আর আইন-শৃংখলা তো এমনই উন্নত, সারাবিশ্বেই যা দ্বারা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। অপরাধ প্রতিরোধের বিভাগসমূহ এমনই চৌকস ও সচেতন, যার তুলনা সম্ভবত অতীতে কখনও ছিল না। কিন্তু ওইসকল দেশে এ জাতীয় অপরাধ যে কতবেশি ঘটে, তা জানলে আপনি হয়রান হয়ে যাবেন। সেখানকার অপরাধসমূহের বার্ষিক রিপোর্ট পড়ে দেখুন। পরিমাণ ও সংখ্যায় তৃতীয় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ রাষ্ট্রটিও তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' গেল বছরের অপরাধ সম্পর্কে আগষ্ট ১৯৭২ খৃ. তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তাতে প্রকাশ– আমেরিকায় এ বছর প্রতি ত্রিশ মিনিটে একজন নিহত হয়েছে। এ রিপোর্ট মোতাবেক প্রতি ৩৯ সেকেণ্ডে কোনও না কোনও অপরাধ অবশ্যই সংঘটিত হয়, প্রতি ১৩ মিনিটে আমেরিকান কোনও না কোনও নারী ধর্ষিত হয়, প্রতি ৮১ সেকেণ্ডে কোথাও না কোথাও ডাকাতি হয়, প্রতি ৮৬ সেকেণ্ডে আমেরিকার যে-কোনও নগরে কারও না কারও উপর দৈহিক আক্রমণ হয়। এ বছর সমগ্র দেশে অপরাধের হার ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;

হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে ১১ শতাংশ; চুরি, ছিনতাই প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ শতাংশ। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর ১৭৬৩০ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ১৭৭০ পরিমাণ বেশি। বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় হতাহতের ঘটনা ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বিয়াল্লিশ হাজার। এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি আর বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় ৬৪ শতাংশ বেশি। এ বছর মারধরসহ ডাকাতির সংখ্যা ঘটেছে তিনলাখ পঁচাশি হাজার নয়শ' দশটি, যা ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১১ শতাংশ এবং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৪৫ শতাংশ বেশি।

দারিদ্র্য, মূর্খতা ও আইন-শৃংখলার অভাবই যদি অপরাধের মূল কারণ হয়ে থাকে, তবে আমেরিকার মত রাষ্ট্রে অপরাধের হার এতবেশি কেন? এর কী রহস্য যে, সেখানকার ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্যের ভেতরও এতবেশি অপরাধ ঘটছে? আমেরিকার শিক্ষামান তো এতই উন্নত যে, সারাবিশ্বের মানুষ সেখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারাকে গর্বের বিষয় মনে করে। রাজনীতি এমনই সুশৃংখল, যা সারাবিশ্বের জন্য শিক্ষণীয়, কোনও রকমের বিশৃংখলা তাতে পরিলক্ষিত হয় না। সেখানকার আইন-শৃংখলার পরিস্থিতির গীত সারাবিশ্বেই গাওয়া হয়। সেখানকার পুলিশ এখানকার চেয়ে হাজারগুণ বেশি প্রশিক্ষিত, চৌকস ও করিৎকর্মা। অপরাধ-অনুসন্ধান ও গোয়েন্দাকর্মের এমন এমন আসবাব-উপকরণ তাদের হাতে আছে, যা পূর্বে কারও কল্পনায়ও আসত না। এতদসত্ত্বেও সেখানকার অবস্থা হল–

مرض بڑھتا ہے گیا جوں جوں دوا کی

'যতই চিকিৎসা করা হয়, রোগ ততই বাড়ে।'

যেসব দেশে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য এবং নৈরাজ্য ও বিশৃংখলাকে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করার দাবি করা হয়ে থাকে, যেসব দেশ সভ্যতা-ভব্যতায় সারাবিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে, যেখানে ঘরে-ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে গেছে এবং বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে জ্ঞানার্জনের লক্ষে যে দেশে পাড়ি জমাচ্ছে অগণ্য শিক্ষার্থী, যে দেশের মানুষ চাঁদ-সেতারার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্য ও কৃতকার্যতায় মানবীয় কল্পনার সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, সেসব রাষ্ট্রেও সর্বাপেক্ষা বড় সামাজিক সমস্যা হল অপরাধের ক্রমবর্ধমান বিস্তার। কেউ যদি এসব রাষ্ট্রে সংঘটিত অপরাধের রিপোর্টসমূহ

পাঠ করে, তবে সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে– এসব দেশে মানুষ নয়; বরং হিংস্র বন্য পশুরাই বসবাস করে, যাদের উপর কখনও সভ্যতা-ভব্যতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আইন-শৃংখলার ছায়াও পড়েনি।

এসব বাস্তবতা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অপরাধের মূল কারণ দারিদ্র্যও নয়, শিক্ষার অভাবও নয় এবং নয় আইন-শৃংখলার শিথিলতাও। প্রকৃতপক্ষে অপরাধের মূল কারণ মন-মানসিকতার ওই ব্যাধি, যা দিক-বলয়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই জগতকেই নিজের সবকিছু ধরে নিয়েছে, যা এই জড়জগতের অপর পাড়ে উঁকি মেরে দেখার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত এবং যার দৃষ্টিতে দু'দিনের এ জীবনের বৈষয়িক লাভ ও ইন্দ্রিয় আনন্দই মানুষের পরম লক্ষবস্তু।

মানবমনে অপরাধের বীজ মূলত তখনই বপন হয়, যখন সে মনে করে বসে– আমার লাভ-লোকসানের গোটা ভুবন কেবল এই পার্থিব জীবনের ভেতরই সীমাবদ্ধ এবং আমার সুখ-শান্তি ও দুঃখ-বেদনার পরিসমাপ্তি কবরের কিনারাতেই ঘটে যাবে। কাজেই আমি যদি এখানে বেশি বেশি অর্থ-সম্পদ, বেশি বেশি সুনাম-সুখ্যাতি এবং বেশি বেশি আরাম-আয়েশ অর্জন করতে না পারি, তবে তো আমি আমার জীবনটাই নষ্ট করে ফেললাম এবং সত্যিকার অর্থে চিরবঞ্চিত থেকে গেলাম। বঞ্চনা ও ব্যর্থতার এ ভীতিই মূলত সকল অপরাধের মূল। এই ভীতির জন্ম নেয় আখিরাত সম্পর্কিত অপরিচিত ওই মানসিকতা থেকে, যা মৃত্যু-পরবর্তী কোনও স্থায়ী জীবনকে স্বীকার করে না। যে ব্যক্তি মনে করে মৃত্যুতে যখন আমার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে তা আর কখনও খোলার নয়, যে মনে করে আখিরাত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সবটাই (না'উযুবিল্লাহ) কল্পকাহিনী, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা সবই উদ্ভট ভাবনা কিংবা যে ব্যক্তি আখিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারটাকে খোলাখুলি অস্বীকার করার সাহস রাখে না, কিন্তু এক রকমের সন্দেহ তার অন্তরে বিরাজ করে, মনে মনে ভাবে– আল্লাহ তা'আলাই জানেন মৃত্যুর পর আর কোনও জীবন আসবে কিনা এবং হিসাব-নিকাশ আদৌ হবে কিনা, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে সত্যিই কিছু আছে কিনা, তাই কাল্পনিক পরিণামের চিন্তায় এই সবুজ-শ্যামল পৃথিবীর আনন্দ-ফূর্তি ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে তার মনের ডাক হয়ে থাকে–

بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

'রে মন, জীবন ভোগ করে নে, জগত তো আরেকবার আসার নয়।'

এসব চিন্তা-ভাবনাই মানুষের লোভ-লালসা উসকে দিয়ে তার ভেতরে এক অনিবারণীয় পিপাসা ও অন্তহীন ক্ষুধার জন্ম দেয়। অতঃপর মানুষ সুখ ও আনন্দের কোনও মাত্রায় গিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। আরাম-আয়েশের কোনও স্তরেই তার পরিতৃপ্তি আসে না। পার্থিব বঞ্চনা ও ব্যর্থতার ভীতি এক অদৃশ্য দৈত্যের মত তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে চেপে বসে এবং তাকে বিষয়াসক্তির উন্মাদনায় লিপ্ত করে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে সে নিজের এবং কেবলই নিজের লালসা পূরণ ছাড়া জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য দেখতে পায় না। তাই এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বনেও কোনও লজ্জাবোধ করে না।

সুতরাং মন-মানসিকতা থেকে এই রোগের নির্মূলই এখন আসল কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত মন-মানসিকতা থেকে এই ব্যাধির অবসান না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কোনও কৌশল ও কোনও ব্যবস্থাই অপরাধ নির্মূল করতে পারবে না। আইন যতই উন্নত হোক এবং আইন প্রয়োগের বিভাগসমূহ যতই শক্তিশালী হোক,যদি মানবমনে আখিরাত বিস্মৃতির মানসিকতা অবশিষ্ট থাকে, তবে তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কেননা এই মানসিকতাই আইনের সকল জাল ছিন্ন করার কৌশল উদ্ভাবন করে নেবে এবং সবরকম ব্যবস্থাপনার ভেতর ফাঁক-ফোকর খুঁজে বের করে ফেলবে।অভিজ্ঞতা সাক্ষী, মানুষের যেই মন-মস্তিষ্ক অপরাধের অনুসন্ধান ও তা নিরূপণ করার উন্নত উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম, সেই মন-মস্তিষ্কই অপরাধে লিপ্ত হওয়ার নিত্য-নতুন ধরন উদ্ভাবনেরও যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। উভয় দিকে যখন উভয়েরই অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা সমান সমান, তখন অপরাধী ও তার সন্ধানীর মাঝখানে সর্বদাই সমান দূরত্ব বাকি থাকবে,তা হ্রাস পাবে না কখনওই।

হাঁ অপরাধ প্রতিরোধের কোনও ফলপ্রসূ উপায় যদি থেকে থাকে তবে সে উপায় কেবলই এই যে, মানুষের মনে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা জন্ম দেওয়া হোক। মানুষের মন-মানসিকতায় যদি এই সত্য বদ্ধমূল করে দেওয়া যায় যে, জীবন কেবল ইহজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আসল জীবন তো সেটাই, যার সূচনা হবে মৃত্যুর পর, কবরে পৌছার দ্বারা মানুষের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের ধারা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় না; বরং সেখান থেকে তার এমন এক জীবনের সূচনা হয়, যা কখনও শেষ হওয়ার নয়, মানুষ ইহজগতে চিরদিন থাকার জন্য আসে না, এটাই তার জীবনের শেষ মঞ্জিল নয়, সে এখানে আসে একদিন চলে যাওয়ার জন্য, তার আগমনের মূল

উদ্দেশ্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, মূলত সেই জীবনই তার আসল জীবন, তবে এই চেতনাই তাকে সমস্ত অন্যায়-অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

এটাই সেই চেতনা, যা মানুষের মন-মস্তিষ্কে যদি ভালোভাবে জমাট বাঁধতে পারে, তবে তা মানুষের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার উপর রাতের অন্ধকারে এবং বনের নির্জনতায়ও পাহারাদারী করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও আইনের পিছনে এই সত্যের বিশ্বাস সক্রিয় না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কর্মজগতে সফলতা লাভ করতে পারে না। মূলত এটাই সেই রহস্য, যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদ তার প্রতিটি আইনের আগে-পরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতবিষয়ক বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে। সে কোনও আইনই তাকওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ ছাড়া উপস্থাপন করেনি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে সমগ্র আরব-উপদ্বীপ নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির জাহান্নামে পরিণত হয়ে ছিল। মানুষের জান-মালের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। কদমে-কদমে খুন-খারাবি লেগে থাকত। লুটতরাজকে বীরত্ব মনে করা হত। ঘরের বাইরে ছিল জানের ঝুঁকি এবং ভেতরে ইজ্জত-আবরুর। নিজ কলিজার টুকরোকে যারা জ্যান্ত কবর দিত, তারা শত্রুর সংগে কী আচরণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। অশান্তি ও নৈরাজ্যের সেই পরিবেশেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–

"এমন একটা সময় আসবে, যখন একা এক নারী মক্কা মুকার্‌রামা থেকে হীরা পর্যন্ত সফর করবে আর তখন সে থাকবে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।"[১৬৫]

বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহলোক পরিত্যাগের আগেই সেই সময় এসে গিয়েছিল। যেই আরব-উপদ্বীপে সর্বদা পারস্পরিক ঘৃণা ও আত্মকলহের আগুন লেগে থাকত, যেখানে কারও জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা ছিল না, সেখানেই ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ফুল ফুটতে শুরু করেছিল এবং সেখানে কাউছার ও তাসনীমে ধোওয়া এমন এক সমাজ গড়ে ওঠেছিল, যার নজির এ আকাশ-বাতাস কখনও দেখেনি।

---

১৬৫. বুখারী, হাদীছ নং ৩৩৩৮

প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিস্ময়কর বিপ্লব, এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হয়েছিল? কোনও পুলিশবাহিনী ও সরকারি অফিস-আদালতের মাধ্যমে, নাকি অন্য কোনও উপায়ে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেখানে না কোনও পুলিশবাহিনী ছিল, না কোনও সুশৃংখল অফিস-আদালত। আজকালকার মত তদন্ত-অনুসন্ধানকার্যের কোনও সায়েন্টেফিক যন্ত্রও ছিল না। যান্ত্রিক কোনও রকমের সুযোগ-সুবিধা তখন কারও কল্পনায়ও ছিল না। যে জিনিসটি তখন ছিল এবং যার বদৌলতে এই মহাপরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তা ছিল কেবলই আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা। এই বস্তুই তখনকার মন-মানস থেকে ওই রোগের জীবাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছিল, যা মানুষের ভেতর অন্যায়-অপরাধের স্পৃহা সৃষ্টি করে তাকে হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করে।

এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই কৃতিত্ব ছিল যে, তিনি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের অন্তরে এমনভাবে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ যেন জান্নাত ও জাহান্নাম নিজের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। তারই অপরিহার্য ফল ছিল যে, প্রথমত কেউ কোনও অপরাধের দিকে অগ্রসরই হতে পারত না আর কখনও কারও দ্বারা ঘটনাক্রমে কোনও অপরাধ হয়ে গেলে আখিরাতের চিন্তা তাকে অস্থির করে ফেলত। যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিকার না হয়, স্বস্তিতে বসে থাকতে পারত না। সুতরাং একদা যে সমাজে অনাচার-ব্যভিচার ছিল তারুণ্যের মামুলি খেলার মত, সেখানে চক্ষুষ্মানেরা দেখতে পেয়েছে ব্যভিচারের হার নামতে নামতে এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। অনেক অনেক বছরের মাথায় আকস্মিকভাবে যখন কারও দ্বারা এক-আধটা ঘটনা ঘটে যেত, তখন নিজেই তা স্বীকার করে প্রাণঘাতী শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে আইনের হাতে ছেড়ে দিত। হযরত মা'ইজ আসলামী (রাযি.) ও গামিদিয়্যাহ (রাযি.)-এর ঘটনা হাদীছ গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। তারা নিজেরাই পীড়াপীড়ি করে প্রস্তারাঘাতে হত্যার যন্ত্রণাময় শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন।[১৬৬]

ইতিহাস ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে আজ পর্যন্ত এই অনন্যসাধারণ ঘটনা সংরক্ষিত আছে যে, হযরত গামিদিয়্যাহ (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিজ অপরাধের কথা স্বীকার

১৬৬. বুখারী, হাদীছ নং ৬৩২৪; মুসলিম, হাদীছ নং ৩২০৩

করছেন আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে অপরাধী হিসেবে মানতে অস্বীকার করছেন। তিনি জানতেন যে, আমাকে অপরাধী স্বীকার করা হলে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিটিবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে পীড়াপীড়ি করছেন যে, আমার উপরে শরী'আতী শাস্তি জারি করুন। যখন তার উপর্যুপরি স্বীকারোক্তি দ্বারা অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যেহেতু গর্ভবতী, তাই এখন তোমার উপর শাস্তি আরোপ করা যাবে না। যখন শিশুটির জন্ম হয়ে যাবে এবং তার দুধপানের মেয়াদও শেষ হবে, তখন তুমি আমার কাছে এসো, তখন তোমার উপর শাস্তি আরোপ করা হবে। হযরত গামিদিয়্যাহ (রাযি.) তখনকার মত চলে যান। তার প্রতি লক্ষ রাখার জন্য কোনও পুলিশ নিযুক্ত করা হয়নি, কোনও রেজিস্ট্রারে তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হয়নি এবং কাউকে জামিনও রাখা হয়নি। দিনের পর দিন চলে যায়। অবশেষে শিশুটির জন্ম হয়। দুধপানের মেয়াদও পার হয়ে যায়। তারপর একদিন হযরত গামিদিয়্যাহ (রাযি.) রিসালাতের দরবারে এসে উপস্থিত হন। লোকে দেখছে তার কোলে একটি শিশু। শিশুটির মুখে রুটির টুকরো। বোঝা যাচ্ছে তার দুধপানের মেয়াদ শেষ। তার প্রতিপালনের জন্য মায়ের দুধের আর প্রয়োজন নেই। ভাবতে পারেন, কি রকম আবেগ-অনুভূতির সংগে কঠিন লড়াইয়ের পর সেই নারী ন্যায়বিচারের সেই আদালতে পৌঁছেছিল! দু'-তিন বছর পার হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অনুতাপ-অনুশোচনার মাত্রা কমে যায়। জীবনের স্বপ্নিল হাতছানি ওই অনুভূতির উপরে প্রবল হয়ে যায়। তারপর এক শিশুর মা হয়ে যাওয়ার পর একজন নারীর কাছে জীবন কতই না সক্রিয় হয়ে ওঠে। শিশুর চিত্তাকর্ষী হাবভাব মায়া-মমতাকে কতই না প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবেই এই নারীকেও এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এসব ভাবাবেগ তাকেও নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তিনি অবিচলতার পাহাড় হয়ে এইসব ভাবাবেগের মোকাবেলা করতে থাকেন, কারও কোনও ডাক ছাড়াই নিজে নিজেই হাজির হয়ে যান, ব্যভিচারের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেন। তারপর পাথরের বৃষ্টির ভেতর প্রাণ উৎসর্গ করে সেই মাকাম হাসিল করে নেন, যার জন্য হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)-এর মত সাহাবীরও ঈর্ষাবোধ হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

"উমর! এই নারী এমন তাওবাই করেছে, যার এক-দশমাংশও যদি সমস্ত মদীনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তবে সকলের মাগফিরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।"[১৬৭]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যমানায় এরকমই ছিল মুসলিম-সমাজচিত্র। হয়ত ব্যভিচার হতই না, আর কখনও কালেভদ্রে ঘটে গেলেও তার শাস্তিগ্রহণের জন্য অপরাধকারীর অন্তরে সৃষ্টি হত এরকম উন্মাদনা। এটা ছিল কেবলই আখিরাত-বিশ্বাসের কারিশমা, যা মুসলিম-সমাজের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছিল।

আজও অপরাধের প্রতিরোধ করার উপায় কেবল ওই একটিই হতে পারে। অপরাধ-প্রবণতাকে দমন করার কোনও কার্যকর পন্থা যদি থেকে থাকে, তবে তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, মানুষকে তার নিজের ও তার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা জগতের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভেতরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতচিন্তা না জন্মাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মন-মস্তিষ্কে পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের আকীদা জমাট না বাঁধবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে মৃত্যুপরবর্তী অবস্থাদির ধ্যান স্থায়ী না হয়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধের ক্রমবর্ধিষ্ণু গতিকে কিছুতেই থামানো যাবে না। আপনি কেবল কাগুজে আইন-কানুন, পুলিশি পাহারা ও আদালতের ভয় দ্বারা অপরাধ-প্রবণতার উপরে উপরে মলম লাগাতে পারেন, কিন্তু তা দ্বারা অপরাধের কেবল বেশবদলই হতে পারে, নির্মূল কিছুতেই হবে না। কেননা অন্তঃকরণের উপরে পাহারা বসানোর পথ আছে কেবল একটাই, আর তা কেবলই আখিরাতচিন্তা, অন্যকিছু নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আজকের সভ্য জগত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ এই সত্য সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি গাফেল! আজকের জ্ঞানীজনদের বুদ্ধিমত্তার অবস্থা হল, তারা একদিকে আল্লাহ ও আখিরাত-ভাবনাকে মন-মানসিকতা থেকে খুটে খুটে বের করছে, জড়বাদী চিন্তা-চেতনা মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে দিচ্ছে, প্রচার-প্রচারণা ও শিক্ষা-দীক্ষার যাবতীয় উন্নত আসবাব-উপকরণ মানুষকে কেবল পার্থিব আনন্দ-ফূর্তি লোটার কাজে উৎসাহিত করছে, মানুষের ইন্দ্রিয় লালসা কদমে কদমে

---

১৬৭. মুসলিম, হাদীছ নং ৩২০৭; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৩৮৫৩; আহমাদ, হাদীছ নং ২১৮৭১; দারিমী, হাদীছ নং ২২২১

লেলিহান করে তোলা হচ্ছে, অতঃপর যখন এসকল ব্যবস্থার পরিণামে গোটা সমাজ অন্যায়-অপরাধে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন এই জ্ঞানীজনেরাই চিৎকার করতে থাকে যে, আমরা ধ্বংসের কিনারায় কিভাবে পৌছে গেলাম। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির এই মানদণ্ড সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি আজও তাদের দৃষ্টিতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল, প্রাচীনপন্থী ও সংকীর্ণমনা, যে তাদেরকে লক্ষ করে বলে–

مذدکی ہو کہ فرنگی ہوس خام میں ہے

امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے

তোমরা যে যাই বলনা কেন ভাই,
শান্তি ও নিরাপত্তা ইসলাম বিনা আর কোথাও নাই।

প্রশ্ন থেকে যায়, অন্তরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতচিন্তা জন্মানোর জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে? এটা এমনই এক প্রশ্ন, যার সুনির্দিষ্ট কোনও জবাব দেওয়াও কঠিন।

আসল কথা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানী-গুণীগণ এবং প্রচারমাধ্যমের দায়িত্বশীলগণ প্রথমে তাদের অন্তরে এই সত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করুক। তা যদি করতে পারে, তবে তাদেরকে এই লক্ষ অর্জনের পন্থা শেখানোর কোনও প্রয়োজন পড়বে না। তাদের অন্তরে যদি এই লক্ষার্জনের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ থাকে, তবে তারা নিজেরাই তাদের প্রতিটি প্রোগ্রামে এদিকে লক্ষ রেখেই কাজ করবে।

ইসলাম যখন বাস্তবে কার্যকর ছিল এবং ইসলামী অনুশাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইসলামী ইতিহাসের সেই কালে মানুষের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার কাজটি মায়ের কোল থেকেই শুরু হয়ে যেত। মাতৃকোলই ছিল তখন প্রথম শিক্ষালয়, যেখানে তার মনে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও মহব্বত, গুনাহ ও ছওয়াবের ধারণা, আখিরাতের চিন্তা, পুণ্যের আগ্রহ ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সিঞ্চিত করে দেওয়া হত। অতঃপর শিক্ষাব্যবস্থার গোটা অবকাঠামো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যা দ্বারা আল্লাহভীতি ও আখিরাতচিন্তায় উৎকর্ষ সাধিত হত। পার্থিব জীবনের বিপরীতে পরকালীন জীবনের চিন্তা-চেতনা প্রতি কদমে অগ্রাধিকার লাভ করত। ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মপরায়নতার বিপরীতে ত্যাগ-তিতিক্ষার মানসিকতা সৃষ্টি করা হত। শিক্ষালয় থেকে শুরু করে হাট-বাজার পর্যন্ত এবং অফিস-আদালত থেকে শুরু করে বিনোদনকেন্দ্র পর্যন্ত সর্বত্র এমন পরিবেশ-

পরিমণ্ডল তৈরি করা হত, যাতে পুণ্যের বিস্তার সহজ হয়ে যায় এবং পাপের পুষ্টি হয়ে ওঠে সুকঠিন।

অতঃপর যারা তালীম-তারবিয়াত ও এই পুণ্যময় পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করত না এবং যাদের স্বভাবের ভেতরই অপরাধ ও পাপকর্মের আসক্তি নিহিত থাকত, তাদের জন্য এমন কঠোর-কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যা স্থায়ীভাবে দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকত। আজকের সভ্য ও উন্নত বিশ্ব চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করা এবং বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক শাস্তি বলে প্রচার করে থাকে। এমনকি হিরোশিমা ও নাগাসাকির দরদী বাহাদুরগণও এ শাস্তিকে অত্যন্ত কঠিন গণ্য করে থাকে এবং যাদের জেলখানাসমূহ যথারীতি অপরাধী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়ে গেছে, তারা পর্যন্ত ইসলামী দণ্ডবিধির উপর আপত্তি তুলতে লজ্জাবোধ করছে না। তাদের এই দয়াদ্রতার উদাহরণ ঠিক এরকম- কারও শরীরের পচন ধরা একটা অঙ্গকে কেটে ফেলার কথা শুনে কেউ মায়াকান্না শুরু করে দিল আর বলতে লাগল, তোমরা এমন নিষ্ঠুর, শরীর থেকে একটা অঙ্গ কেটে ফেলে দেবে? বলুন তো এরূপ দয়া-দরদের পরিণাম গোটা দেহের জন্য ধ্বংসাত্মক নয় কি? পচন ধরা একটা অঙ্গের জন্য মায়াকান্না কাঁদা গোটা দেহের প্রতি নিকৃষ্টতম জুলুম ছাড়া আর কিছু? ওই জ্ঞানী-গুণীদের এই মজলুম মানবতার প্রতি কোনও দয়া আসে না, যা অন্যায়-অপরাধের জ্বলন্ত হাতিয়ারের নিচে পড়ে গোঙ্গাচ্ছে। কিন্তু ওই গণা-গুনতি জালেম ও অপরাধীর হাত কাটার কারণে তাদের মানবদরদ সহসাই উথলে ওঠে, যাদের অস্তিত্বই মানব-সমাজের জন্য ভয়াবহ ক্যান্সারস্বরূপ। যার প্রতি দয়া করার অর্থ গোটা মানব-সমাজকে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কঠিন আযাবে লিপ্ত করে রাখা।

ইসলামে চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে চাবুক মারা কিংবা পাথর মেরে হত্যা করার শাস্তি আরোপ করার জন্য কঠিন কঠিন শর্ত রাখা হয়েছে। ফলে এসব শাস্তির উপযুক্ত এমন কিছু গণা-গুনতি লোকই হতে পারে, যারা মানবতা ও লজ্জা-সম্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে খুইয়ে বসেছে,এর ছিটেফোঁটাও যাদের মধ্যে নেই এবং যাদের সংশোধন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে গেছে।

এ শাস্তির সুফল এই যে, যেখানে এই শাস্তি কার্যকর করা হয়, তা হয়তো অত্যন্ত সল্প সংখ্যকের উপর, কিন্তু যখন একবার কার্যকর হয়ে যায়, তখন বছরের পর বছর মানুষের অন্তরে তার ভীতি সক্রিয় থাকে। ফলে তারা

অপরাধের চিন্তা করতেও আতঙ্কবোধ করে এবং এক পর্যায়ে অপরাধের নাম-নিশানাও সম্পূর্ণ মুছে যায়।

এটা কেবল অতীতের কথা নয়, আজও যার ইচ্ছা সে সৌদি আরবে গিয়ে দেখুক। সেখানে সে শান্তি ও নিরাপত্তার এমন পরিবেশ নিজ চোখে দেখতে পাবে, যা ইতিপূর্বে সে কল্পনাও করেনি। আজকের এই চরম অবক্ষয়ের যমানায়ও সেখানে মানুষ তাদের পণ্যেভরা দোকান নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে খোলা রেখে চলে যায়, কিন্তু কারও সাহস হয় না যে, সেখান থেকে একটা দানাও তুলে নেবে। মধ্যরাতেও যেখানে ইচ্ছা সেখানে সোনা-রূপা দেখিয়ে দেখিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু কারও সাধ্য হবে না আপনার দিকে একবার অসৎ দৃষ্টিতে তাকানো।

কিছু সংখ্যক দূরাত্মাকে যদি তার দুষ্কর্মের কঠোর পরিণতিতে পৌছানোর দ্বারা মানবতার নিরাপত্তাবিধান সম্ভব হয় এবং মানুষের স্বস্তি-সুখের ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেটা না করে দলে দলে মানুষকে জেলখানায় নিক্ষেপ করতে থাকার উপর এত পীড়াপীড়ি কেন? এই পীড়াপীড়ি কি কোনও সুবুদ্ধির পরিচায়ক?

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারা ৩৫-৪৩ পৃ.

পত্রিকা সম্পাদকদের সমীপে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগতকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্যের ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

কোনও জাতির মন-মানসিকতা নির্মাণ ও বিনাশে সাংবাদিকতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কোনও সচেতন ব্যক্তির তা অজানা নয়। বর্তমানকালে এমন কোনও শিক্ষিত পরিবার পাওয়া যাবে না, সংবাদপত্রের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই; বরং সংবাদপত্র এখন শিক্ষিত মানুষের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে সত্য-সঠিক কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে যায়। বিশেষত দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া তো আজকাল বলতে গেলে চলেই না। যারা লেখাপড়া জানে না, সংবাদপত্র পড়তে পারে না এমনকি ভালোভাবে বুঝতেও পারে না, তারা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এদিকে লক্ষ করলে সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত, তাদের উপর সমগ্র জাতির অত্যন্ত কঠিন দায়-দায়িত্ব বর্তায়। তারা জীবনের যে শাখা অবলম্বন করেছে, তা কেবল একটা বাণিজ্যিক পেশা বা উপার্জন-মাধ্যম মাত্র নয়; বরং জাতির চিন্তা-চেতনা গঠন ও মন-মানসিকতার পথপ্রদর্শনের জন্য এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদমর্যাদা, যে পদের দায়িত্ব অতি নাজুক এবং যিম্মাদারী অতি ভারী। কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টা যদি জাতীয় ও সামষ্টিক সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে বলতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার প্রতি অনেক বড় মেহেরবানী। এটা তার বিশাল নি'আমত। কেননা এই অবস্থান থেকে তার দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ একই কাজ দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এ কাজকে খালেস ব্যবসা সাব্যস্ত করত এর সামষ্টিক স্বার্থকে ব্যবসায়িক মুনাফার নজরানা বানিয়ে দেওয়া হবে।

আফসোস! আমরা যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের সাংবাদিকতাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন কেবল আক্ষেপ ও হতাশাই প্রকাশ করতে হয়। আমাদের এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পিছনের আটাশ বছর আমাদের সাংবাদিকতা নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা বিগড়ানো, তাদের আখলাক-চরিত্র ধ্বংস করা এবং তাদেরকে ইন্দ্রিয়চাহিদার গোলাম বানানোর কাজ ষোল আনাই আঞ্জাম দিয়েছে, এ ব্যাপারে কোনওরকম ত্রুটি করেনি। একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব হল, যে বিষয়টাকে দেশ ও জাতির অবস্থাদৃষ্টে সত্য-সঠিক মনে করবে, তাকে নির্ভয়ে-নিঃসংকোচে সত্য বলবে এবং তার প্রকাশে কোনওরকম প্রলোভন ও রক্তচক্ষুকে প্রতিবন্ধক হতে দেবে না। কিন্তু আফসোস! আমাদের সাংবাদিকতায় হক-নাহকের ফয়সালা বেশিরভাগ সরকার বা জনগণের গতিবিধি দেখেই করা হয়ে থাকে।

আমাদের সাংবাদিকমহলের একটা গ্রুপ এমন আছে, যারা ক্ষমতাসীনদের প্রশংসা ও গুণকীর্তণে এবং তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের সমর্থনদানে কোনওরকম কার্পণ্য করে না। এ কাজে তাদের অভ্যাস এমনই পাকাপোক্ত, কোনওরকম পরিস্থিতির বদল তার ব্যাত্যয় ঘটাতে পারে না। আমাদের সাংবাদিকতায় এমন নজির এক-দু'টি নয়; বরং অসংখ্য পাওয়া যাবে যে, একই ব্যক্তি কোনও ক্ষমতাসীনকে তার আমলে যুগের চন্দ্র-সূর্য সাব্যস্ত করছে, তার প্রতিটি জায়েয ও নাজায়েয কাজকে সঠিক ও সুন্দর সাব্যস্ত করছে এবং সে কাজের সপক্ষে উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু যেই না সে ব্যক্তি শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় এবং তার স্থানে তার বিরোধী কোনও ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়, অমনি সেই প্রাক্তন সরকারকে একজন দুঃশাসক ও চরম স্বৈরাচারী সাব্যস্ত করছে এবং তার শাসনকালকে অসংকোচে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাসনকাল বলে ধিক্কার দিচ্ছে।

অন্যদিকে একদল সাংবাদিক এমন যে, সর্বস্তরে সমাদৃত ও জননন্দিত হওয়াই তাদের পরম লক্ষবস্তু। এই লক্ষার্জনের স্বার্থে তারা জনগণকে সঠিক পথপ্রদর্শন করার পরিবর্তে তাদের খেয়াল-খুশির অনুগমন করে থাকে এবং যে কথা জনগণের প্রশংসা কুঁড়াবে না বা তাদের কাছে পসন্দ হবে না, তারা সর্বদা এমন কথা এড়িয়ে যায়, বাস্তবিকপক্ষে তা জনগণের পক্ষে যতই কল্যাণকর হোক না কেন। বলতে দ্বিধা নেই এটা আমাদেরই কর্মফল যে, আমরা কখনও সর্বজনপ্রিয় কোনও শাসক পাইনি আর এরই ফলশ্রুতিতে

দেশে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে যে, সরকারের বিরূদ্ধে দু'কলম লিখতে পারলে সে জনগণের হিরো হয়ে যায়। এমনিতে কথাটি ভালো কি মন্দ তা বিবেচ্য থাকে না। সরকারের বিরূদ্ধে হলেই ব্যস তা জনগণ লুফে নেয় এবং তা তাদের প্রশংসা কুড়ায়। এ কারণেই কোনও কোনও সাংবাদিক সরকার-বিরোধিতাকে নিজের লক্ষবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। এরূপ করাটা জনস্বার্থের জন্য জরুরি কিনা এবং দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর কিনা, অনেক সময়ই সেদিকে লক্ষ থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে কেবল এটাই যে, এর বিনিময়ে জনগণের পক্ষ হতে নির্ভিক ও সত্যভাষী হওয়ার খেতাব জুটে যাবে এবং গলায়প্রশংসা ও সাধুবাদের মালা পরানো হবে। পরিণামে সংবাদপত্রের মাধ্যমে গণমানসিকতার যে পথপ্রদর্শন করা সম্ভবপর ছিল, তা সরকারবিরোধী ও সরকারপক্ষ কোনও সংবাদপত্র দ্বারাই অর্জিত হচ্ছে না।

আরও বেশি বিপজ্জনক ব্যাপার হল আজকালকার সংবাদপত্রসমূহ তার বাহ্যিক কাঠামো ও নৈতিক নীতিমালা তৈরি করার সময় জাতির উপর বিশেষত অপরিপক্ক মানসিকতার উপর তার কী প্রভাব পড়বে, তা একটুও ভেবে দেখার দায়বোধ করে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লিখতে হচ্ছে যে, ব্যবসায়িক মুনাফার দৌড়ে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ নীতি-নৈতিকতার সকল মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে। আজ অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি সংবাদপত্র অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সিনেমার বিজ্ঞাপণসমূহ যে কতটা নোংড়া এবং তা যে কী পরিমাণ চরিত্র ধ্বংসের জীবাণুবাহী, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার পড়ে না। অথচ পত্রিকাসমূহ তা প্রকাশে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। অনেক সময় তো পত্রিকার সাধারণ সংবাদের প্রচারও এমনভাবে হয়ে থাকে, যা কোনও শরীফ ও লাজুক ব্যক্তির পক্ষে শিশুদের সামনে পড়া সম্ভব হয় না। আখলাক-চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধের খবর অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তার বিশদ বিবরণ এমন চুটিয়ে চুটিয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, যেন তারচে' মজাদার খাদ্য আর কিছু নেই। আর কিছু না হোক, অন্ততপক্ষে ভিনদেশী কোনও নায়িকা-নর্তকির রসালো খবর প্রচার করার জন্য পত্রিকাগুলো যেন মুখিয়ে থাকে। তুচ্ছ-তুচ্ছ বাহানায় তাদের নগ্ন বা অর্ধ উলঙ্গ ছবি ছেপে দেওয়া হয়। বিশেষত সান্ধ্যকালীন পত্রিকাসমূহ তো এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনের চরমে পৌছে গেছে। নীতি-নৈতিকতার কোনও

রকম ধারই তারা ধারে না। এসব পত্রিকার এমন কোনও সংখ্যা পাওয়া যাবে না, যাতে চরিত্রবিধ্বংসী কোনও ছবি থাকে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিদেশী কোনও রাজকন্যা কারও সাথে যদি অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা প্রসিদ্ধ কোনও নারী কোনও দ্বীপে গিয়ে স্বামীর সংগে হানিমুন পালন করে, তবে তাতে এ দেশের তরুণদের কী অপরাধ যে, তার বিশদ কেচ্ছা শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের মন-মানসিকতা নষ্ট করা হচ্ছে? তাছাড়া এটা এমন কী সংবাদ, যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া এ দেশবাসীর জন্য ফরয হয়ে গেছে? কিংবা কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মান-অভিমানের পর যদি সমঝোতা হয়ে যায়, তবে এ দেশের নবীনদের কী দায় পড়ল যে, তার বিশদ সম্পর্কে তাদের জানতেই হবে? কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রসমূহ এমন যে, তা এ জাতীয় সংবাদ অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে তার গলিত পুঁজ আমাদের তরুণদের সামনে পরিবেশন করে এবং তা এমনই গুরুত্বের সঙ্গে যে, সারাজগতে যেন এরচে' দরকারি কোনও সংবাদ নেই।

এমনিতেও সাংবাদিকতাকে নিছক ব্যবসায়ের মাধ্যম বানানো কোনও ভালো কাজ নয়; বরং এটাকে একটা নিন্দনীয় কাজই বলতে হবে। তথাপি ব্যাপারটা এতটুকুতে সীমিত থাকলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি গড়িয়েছে তো আরও বহুদূর। কাঁচামনের দুর্বলতাকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার মত ঘৃণ্যকাজ আর কিছু হতে পারে কি? আমাদের সংবাদপত্রসমূহ আজ এই নিকৃষ্টতম বাণিজ্য অবলীলায় করছে। সাংবাদিকতার মত পবিত্র কাজ এই ন্যক্কারজনক তৎপরতার ফলে আজ পুঁতিগন্ধময় হয়ে গেছে। তারচে' আফসোসের কথা হল, আমাদের সাংবাদিকতায় এই পাক-নাপাকির অনুভূতিটুকু পর্যন্ত যেন শেষ হতে চলেছে এবং উত্তরোত্তর এই বিপজ্জনক কর্মপন্থা আরও বেশি সঙ্গিন হয়ে উঠছে। বিগত কয়েক বছরে পরিস্থিতি কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য আজ থেকে বিশ বছর আগের কোনও সংবাদপত্রকে আজকের সংবাদপত্রের সাথে তুলনা করে দেখুন। তাহলে অনুমান করতে পারবেন আমাদের সাংবাদিকতায় নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিষাক্ত জীবাণু কী ক্ষীপ্রতার সাথে সংক্রমিত হয়েছে।

আজকের এই আলোচনায় আমরা আমাদের দেশের পত্রিকা সম্পাদকদের সমীপে আবেদন রাখতে চাই যে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিরীহ জনগণের উপর একটু দয়া করুন। আজ তারা বৈষয়িক ও নৈতিকভাবে চরম অবক্ষয়ের

সম্মুখীন। নিজ মেজায ও রুচি এবং দ্বীন ও ধর্মের দিক থেকে এ জাতি এরকমের ইন্দ্রিয়বিলাসের ক্ষমতা রাখে না এবং আমাদের বৈষয়িক উপায়-উপকরণের যে অবস্থা, তা এর অনুমতিও দেয় না। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি অশ্লীলতা ও নগ্নতা এবং ভোগপরায়ণতায় ভেসে গিয়ে দুনিয়ায় দু'দিনের মজা লুটতে চাইলে তা লুটতে পারে। কিন্তু আমরা তো মুসলিম উম্মাহ। কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা আমাদের ভিত্তিমূল গঠিত। কোনও রকমের ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয়সেবা এই ভিত্তিমূলের সাথে যায় না। কাজেই ভোগ-বিলাস, আনন্দ-ফূর্তি ও ইন্দ্রিয়বিলাসের পথ অবলম্বন করলে তাতে এ জাতির ধ্বংস বিনাশ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে চিন্তাজগতের নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। আপনারা আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-শ্রমের মাধ্যমে এ জাতিকে আখলাক-চরিত্রের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। এই নীতিতে কাজ করলে মানবতার সেবা করার সুবাদে এ জাতির যাবতীয় কৃতিত্ব আপনাদের আমলনামায় লেখা হতে পারে। এটা আপনাদের পদমর্যাদাগত দায়িত্ব যে, নতুন প্রজন্ম কোনও ভুলপথ অবলম্বন করলে আপনারা নিজেদের হিকমত ও অন্তর্দৃষ্টি এবং মহব্বত ও মমত্বের সাথে তাদের গতিপথ বদলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কোনওরকম বিপথগামিতায় তাদের উৎসাহবর্ধনে ভূমিকা রাখা আপনাদের কাজ হতে পারে না। আপনাদের পূর্বসূরীগণ আপনাদের জন্য সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা ও চরিত্রবত্তার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তা আপনারা আপনাদের সন্তানদের জন্য কী উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাচ্ছেন? নির্লজ্জতার? চরিত্রহীনতার? সম্ভ্রমহীনতার? নাকি হীনতা ও লাঞ্ছনার?

এ ধরনের অশ্লীল ও নগ্ন বিষয়বস্তু এবং এ জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তুচ্ছ বাড়তি রোজগার হয়ে থাকে, আপনাদের দৃষ্টি কেবল সেদিকে। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করুন এসব যে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন প্রজন্মের চরিত্র নষ্ট করছে এবং মন-মানসিকতা বরবাদ করছে তার বিপরীতে এই সামান্য বাড়তি রোজগার কি মনে প্রশান্তি ও আত্মায় স্বস্তি জোগাতে পারে? এই রোজগার এবং এর মাধ্যমে নির্মিত আয়েশী ঘরবাড়ি শেষ পর্যন্ত তো এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু এর যে ভয়াবহ পরিণাম আখিরাতে অপেক্ষা করছে এবং দুনিয়ায় এটা যে কুখ্যাতির জোগান দিচ্ছে, তা তো কখনও সঙ্গ ত্যাগের নয়। যতদিন দুনিয়া আছে, ততদিন এ কুখ্যাতিও থেকে যাবে আর আখিরাতের শাস্তি তো অনিঃশেষ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑲

অর্থ : 'স্মরণ রেখ, যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক– এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।'[১৬৮]

সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে সংবাদপত্রের নীতিমালায় পুনর্বিবেচনা করুন। এতে চারিত্রিক অপরাধ সংক্রান্ত খবর, অশ্লীল বিষয়বস্তু ও নগ্ন বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করুন। সৎ ও স্বচ্ছ সাংবাদিকতার উৎকর্ষ সাধন করুন। জাতিকে নগ্নতার প্রতি আকৃষ্ট না করে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও শ্লীলতা এবং সাধুচরিত্রের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করুন। তাদের ভেতরে এমন পরিপক্ক জাতীয় চেতনা জাগ্রত করুন, যা এ জাতিকে মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা নির্মাণ ও উন্নয়নের পথে ধাবিত করবে।

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে, তার একটা বড় দায় সংবাদপত্রের পাঠকদের উপরেও বর্তায়। এখনও পর্যন্ত এই পাঠকদের সিংহভাগই এমন, যারা সংবাদপত্রের এ নীতিমালাকে আদৌ পসন্দ করে না। তারা মনে মনে এর প্রতি বেজায় নাখোশ। কিন্তু আফসোসের কথা হল, আমরা আমাদের সব অসন্তোষ ভেতরে ভেতরেই হজম করে ফেলি, কদাচ প্রকাশ করলেও তা কেবলই নিজেদের একান্ত মজলিসে। বাইরে তা সহজে উচ্চারণ করি না। সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপকদের কাছে তা প্রকাশ করি না। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয় না। তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনও চিঠিপত্রও পৌছে না। অন্য কোনও পন্থায়ও এ নীতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয় না।

আমাদের অনুরোধ, সংবাদপত্রের এ নীতিমালাকে যদি আপনারা অপসন্দই করে থাকেন এবং আপনাদের দৃষ্টিতে সাংবাদিকতার এ কর্মপন্থা আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে থাকে আর সেজন্য এই কচিমনাদের প্রতি আপনাদের কোনও দয়ামায়া লেগে থাকে, তবে নিজেদের এই অনুভূতি আপনজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাংবাদিকমহলেও পৌছানো উচিত। বিশেষত তাদের মধ্যে যারা নীতিনির্ধারক, তাদের দৃষ্টি এদিকে অবশ্যই আকর্ষণ করা উচিত। আপনারা তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নাগরিকশ্রেণীর

---

১৬৮. সূরা নূর, আয়াত ১৯

মধ্য থেকে প্রতিনিধিদল পাঠান, তাদের কাছে চিঠি লিখুন এবং তাদের কাছে দাবি জানান, তারা যেন তাদের এ নীতি পরিবর্তন করে এবং সাংবাদিকতাকে এই নোংড়ামি থেকে বের করে আনে। এ কাজকে কেবল 'উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে ন্যস্ত রেখে নিশ্চিন্তে বসে থাকাটা কোনওভাবেই আখিরাতের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই এর তাওফীক দান করুন– আমীন।

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী ১৪ মুহার্‌রম, '৯৬ হিজরী

সূত্র : ইসলাহে মু'আশারা ৫১-৫৫ পৃ.

ইজতিহাদ

রবিউল আউয়াল ১৪০৪ হিজরী তারিখে ধর্মমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইসলামাবাদে এক 'উলামা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মাদ জিয়াউল হক সাহেবও এতে অংশগ্রহণ করেন। এ কনভেনশনের একটা বিষয়বস্তু ছিল– 'দেশে ইজতিহাদী কার্যক্রমের সূচনা কিভাবে করা যায়'। এ অনুষ্ঠানে 'আল-বালাগ'-এর সম্পাদক যে মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন, ধর্মমন্ত্রণালয় টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশ করে। সামান্য সম্পাদনার সাথে সে ভাষণটি এবারের সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করা হল।

সম্মানিত সভাপতি ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী!

আস-সালামু 'আলাইকুম।

আমি মনে করি সংক্ষিপ্ত সময়ে এই কনভেনশনের চারও কমিটি যে সুপারিশমালা তৈরি করেছে, বিদ্যমান পরিস্থিতিদৃষ্টে তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উৎসাহবর্ধক। যখন এ প্রোগ্রামের ঘোষণা হয়েছিল, তখন আশা করা যায়নি এতটা সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর এরকম সুপারিশমালা তৈরি করা সম্ভব হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চারও কমিটির পক্ষ থেকে যে সুপারিশমালা এসেছে, তা অত্যন্ত মূল্যায়নযোগ্য ও সাহসসঞ্চারক।

যেহেতু একেকজনকে একেক কমিটিতে রাখা হয়েছিল, অন্য কমিটিতে তার মতপ্রকাশের কোনও সুযোগ ছিল না, তাই কোনও পুনরাবৃত্তির দিকে না গিয়ে যেসব কমিটিতে আমি ছিলাম না তার পক্ষ থেকে যেসকল প্রস্তাবনা এসেছে, সে সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা জরুরি মনে করছি। এ কনভেনশনের মূল লক্ষ ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার গতিকে বেগবান করা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে যেসব প্রস্তাবনা এসেছে, আমি অক্ষরে অক্ষরে তার সমর্থন করি। সেই সংগে এই অনুরোধও রাখব যে, অনুগ্রহপূর্বক গভীর চিন্তা-ভাবনার সাথে প্রস্তাবনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হোক,

এর অন্তর্নিহিত যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হোক এবং যথাশীঘ্র একে বাস্তবায়ন করা হোক।

এমনিভাবে ঐক্য ও সংহতিবিষয়ক কমিটি যে প্রস্তাবনা পেশ করেছে, তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। নিশ্চিত বলা যায় এ অনুযায়ী কাজ করলে বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার যে মহামারি চারদিকে চলছে, তার প্রশমনে ইনশাআল্লাহ এই উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি বিশেষভাবে যেই কমিটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু আরয করতে চাই সেটি হল তৃতীয় কমিটি, যেটি গঠিত হয়েছে ইজতিহাদী কার্যক্রম প্রসঙ্গে। এ সভায় তার সুপারিশমালা পেশ করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মালেক সাহেব কান্ধলভী ও 'আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মাদ রযী।

আমার দৃষ্টিতে এটি যেহেতু অনেকটা 'উলামায়ে কিরামের প্রতিনিধিত্বমূলক সভা এবং এর পক্ষ থেকে যা-কিছুই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তার প্রভাবও হবে সুদূর বিস্তারি, তাই আমি সংক্ষেপে ইজতিহাদ প্রসঙ্গে আরয করতে চাই যে, আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান। পরস্পরবিরোধী সেই ভুল বোঝাবুঝিরই ফল যে, কখনও কখনও চরম পর্যায়ের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয় এবং কখনও কখনও বল্গাহীন স্বাধীনতা।

আমার দৃষ্টিতে, এবং এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত মতই নয়; বরং এটা কুরআন-সুন্নাহ এবং ফুকাহায়ে কিরামের মতামত থেকে গৃহীত ও আহরিত। ইজতিহাদ মূলত একটি দোধারী তরবারি। ইজতিহাদকে যদি ভালোভাবে বুঝেশুনে তার সীমারেখার ভেতর যথাযথ শর্তাবলীর সাথে ব্যবহার করা হয়, তবে তার সুফল ওই আজীমুশ্শান ফিকহী জ্ঞানভাণ্ডাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা নিয়ে এই উম্মত রীতিমত গর্ব করতে পারে। আবার এই ইজতিহাদেরই যদি গলদ ব্যবহার করা হয়, ভুল লোক এর ব্যবহার করে কিংবা এই হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় গলদ পন্থায়, তবে তার কুফলও হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। এ পথেই উম্মতের ভেতর সৃষ্টি হয়েছে নানা বাতিল মতবাদ, উদ্ভূত হয়েছে দ্বীনের মনগড়া ব্যাখ্যাদানের বিভিন্ন আন্দোলন। 'আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল' জাতীয় গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘ একটা যুগ মানুষ এদের শোরগোল শুনেছে, কিন্তু আজ বইয়ের পৃষ্ঠা ছাড়া অন্য কোথাও এদের অস্তিত্ব নেই।

এই ইজতিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ'র জন্য সঠিক চলার পথ সন্ধান করা যায় আবার এর মাধ্যমেই মানুষকে নিয়ে যাওয়া যায় ভ্রান্ত ও বক্রপথের দিকে এবং নিয়ে যাওয়া যায় সর্বনাশা গন্তব্যে। এ জাতীয় বিপজ্জনক ইজতিহাদ আমাদের এ দেশেও করা হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদের আয়াত–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

অর্থ : 'চোর ও চোরনী– উভয়ের হাত কেটে দাও।'[১৬৯]

নব্য মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন– চোর ও চোরনী দ্বারা পুঁজিপতিকে বোঝানো হয়েছে, আর তাদের হাত কেটে দেওয়ার অর্থ হল তাদের মিল-কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করা। এ ব্যাখ্যা এমন কোনও ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা হয়নি, সমাজে যার কোনও 'ইলমী মর্যাদা স্বীকৃত নয়। আমাদেরই দেশের এমন এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এটা যথারীতি মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে, যাকে বিশিষ্ট জ্ঞানী-বিদ্বানদের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এমনিভাবে এ দেশে ইজতিহাদের ভিত্তিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম নয়, ইজতিহাদের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে মদ হারাম নয়, এই ইজতিহাদের ভিত্তিতেই পশ্চিমা সভ্যতার মহামারি ও তাদের সরবরাহকৃত প্রতিটি অভিশাপকে বৈধকরণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই ইজতিহাদের মাধ্যমেই দ্বীনকে বিকৃত করার এক নিরবচ্ছিন্ন সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে।

এ কারণেই আমি আরয করেছি ইজতিহাদ এক দোধারী তরবারি। আমি এর উদাহরণে বলে থাকি, পুলসিরাত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে যে বলা হয়েছে, তা তরবারির চেয়েও ধারালো এবং চুলের চেয়েও চিকন, ইজতিহাদও ঠিক সেরকমই। এর সীমারেখা ও শর্তবলীর দিকে লক্ষ রাখা ব্যতিরেকে এবং এর যথাযথ যোগ্যতা অর্জন না করে কেউ যদি এ কাজ করে, তবে তার পরিণতি দাঁড়ায় কেবলই এই যে, সে দ্বীনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেবে, দ্বীনের উপরে অস্ত্রপচার করবে এবং দ্বীনের চরম বিকৃতি ঘটাবে। এভাবেই ইজতিহাদের মাধ্যমে চরম পর্যায়ের গোমরাহী সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কেউ কেউ মনে করে ইজতিহাদের অর্থ হল নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং আকল ও নিজ রায়ের ভিত্তিতে ইসলামী

১৬৯. সূরা মায়িদাঃ, আয়াত ৩৮

বিধানাবলী সম্পর্কে কোনও ফয়সালা দিয়ে দেওয়া। তাদের এ ধারণা নিতান্তই ভুল। ভালোভাবে বুঝে রাখতে হবে এই জাতীয় কাজকে আজ পর্যন্ত কেউ ইজতিহাদ মনে করেনি। কেউ যদি এটাকে ইজতিহাদ মনে করে, তবে প্রকৃতপক্ষে সে চরম গোমরাহীর স্বীকার। ইজতিহাদ সম্পর্কে তার ছিটেফোঁটাও ধারণা নেই।

ইজতিহাদ সম্পর্কে হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.)-এর হাদীছ সুপ্রসিদ্ধ। সেই হাদীছের ভিত্তিতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত করেছেন। তিনি যে দরজা খুলে দিয়েছেন, তা বন্ধ করার অধিকার কারও নেই। কিন্তু সেই হাদীছের ভেতরই এ ব্যাখ্যা উপস্থিত রয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– তুমি যদি কোনও বিষয় আল্লাহর কিতাবে না পাও, সে বিষয়ে কিভাবে ফয়সালা দেবে? হযরত মু'আয (রাযি.) উত্তরে বলেন, সুন্নাহ'র ভিত্তিতে ফয়সালা দেব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যদি সুন্নাহ'র ভেতরও না পাও? তিনি বললেন, আমি নিজ রায়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করব। এ হাদীছ সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছে– যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ কোনও বিধান দিয়ে দিয়েছে, তাতে ইজতিহাদের কোনও অবকাশ থাকে না। তথাপি কেউ যদি সে সম্পর্কে ইজতিহাদ করে, সেটা তার ইজতিহাদ হবে না; হবে মনগড়া ব্যাখ্যা এবং হবে দ্বীনের বিকৃতিসাধন।

যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে ইজতিহাদের অনুমতি দেওয়া হলে আমি মনে করি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের কোনও সার্থকতা থাকে না। আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালাম তো ওহী নিয়ে আসেন এ লক্ষে যে, যেসব বিষয়ে মানববুদ্ধি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, ওহীর মাধ্যমে সে বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দান করা হবে এবং দেখানো হবে যথাযথ পথ। ব্যাপারটা যদি এরকম হত যে, তোমাদের নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় যা বুঝে আসে তাই করতে পার, তবে তো কুরআন-সুন্নাহ'র অনুসরণ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বলে দেওয়া হত– প্রত্যেক যুগের মানুষ যে পথ ও পন্থাকে সমীচীন মনে করে সেটাই অবলম্বন করবে, যে কাজকে তারা আকল-বুদ্ধি মোতাবেক মনে করবে তাই তাদের জন্য করা জায়েয হবে এবং যে বিষয়টা তাদের জন্য কল্যাণকর অনুভূত হবে, সেই মোতাবেক তারা জীবনযাপন করবে। এ ক্ষেত্রে

কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল করার কোনও দরকার ছিল না। তাই বলি- ইজতিহাদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই ভুল ধারণার অবসান দরকার। এই কনভেনশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে, তাতে এদিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখা চাই।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ হল– অনেক সময় ইজতিহাদের এই অর্থ করা হয় না বটে যে, কুরআন-সুন্নাহ'র নামে নিজ আকল-বুদ্ধিকে চালিয়ে দেওয়া হবে, তবে যখন ইজতিহাদ করার পালা আসে তখন মন-মানসিকতায় এই ধারণা উদিত হয় যে, আজই যেন প্রথমবার কুরআন-সুন্নাহ আমাদের উপরে নাযিল হল, বিগত চৌদ্দশ' বছরে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনও কাজ হয়নি, পরিশেষে আমরাই প্রথমবার নিজ আকল ও সমঝের ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছি, ব্যস আমরা এর যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব সেটাই ইজতিহাদ এবং সেটাকেই বাস্তবায়ন করা উচিত।

অনেক সময়ই এ ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে। অথচ বাস্তবতা হল, আজ আমরা কোনও শূন্যস্থানে এসে বসিনি। আমরা এমন এক যুগে আছি, যখন আমাদের হাতে রয়েছে পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া দ্বীনী জ্ঞানের বিপুল ঐশ্বর্য। সেই পূর্বসূরীদের মধ্যে রয়েছেন মহান সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন, তাব'উত-তাবি'ঈন, বুযুর্গানে দ্বীন, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিছীন এবং উম্মতের ফুকাহা ও সুলাহা। তারা এ দ্বীন অর্জনের জন্য জীবন বাজি রেখেছেন। কুরআন-সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য অকল্পনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন। অভুক্ত থেকে, শুকনো রুটি খেয়ে, মোটা ছেঁড়া কাপড় পরে এবং পার্থিব সবরকমের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে কুরআন-সুন্নাহ'র জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এভাবে আমাদের জন্য রেখে গেছেন 'ইলমের বিপুল বিস্ময়কর সম্ভার। সেই জ্ঞানসম্ভার উপেক্ষা করে যদি কেউ মনে করে আজ আমরা প্রথমবার সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসাইল আহরণ ও ইজতিহাদের চেষ্টা করব, তবে বলতে হবে সে চরম আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার।

তার কথার অর্থ দাঁড়াবে চৌদ্দশ' বছরে কুরআন-সুন্নাহ'র উপর কোনও কাজ হয়নি, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কেউ এগিয়ে আসেনি, তার জ্ঞানবিস্তারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং তা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টাও করা হয়নি। ভাবা যায় এটা কত বড় মূর্খতা? কাজেই ইজতিহাদের এই অর্থও যদি কারও মাথায় থাকে যে, অতীতের ফিকহী ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একদম গোড়া থেকে ইজতিহাদ শুরু করা হবে, তবে এই

ভাবনাকে কিছুতেই সমর্থন করা চলে না। ইজতিহাদের এই ধারণা চরম বিভ্রান্তিকর যে, সমস্ত ফিকহী জ্ঞানভাণ্ডারকে উপেক্ষা করে আজ নতুনভাবে মাসাইল উদ্ভাবন করা হবে এবং নতুন আঙ্গিকে ও নতুন নিয়মে ফিক্‌হ প্রস্তুত করা হবে। হাঁ ইজতিহাদ সম্পর্কে এতটুকু কথা সঠিক যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত পুরোনো যে মূলনীতি আছে তার আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান তালাশ করা হবে। এতে কোনও সন্দেহই নেই যে, প্রতি যুগে এমন অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব ঘটে, যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআন-সুন্নাহে পাওয়া যায় না, এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরাম তাদের গবেষণালব্ধ যে জ্ঞান রেখে গেছেন তার ভেতরও এর কোনও উল্লেখ থাকে না, উল্লেখ থাকলেও এ সময়ের পক্ষে তা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক হয় না। কাজেই ইজতিহাদের এই সীমারেখার ভেতরে থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান খোঁজা, তার জন্য শরী'আতের মেজায উপলব্ধি করা এবং সেমতে তা সাধারণ্যে তুলে ধরা এখন সময়ের দাবি। আর এ পর্যায়ের ইজতিহাদ সবসময়ই জরুরি। এর দরজা কেউ কখনও বন্ধ করেনি এবং তা বন্ধ করার কোনও অবকাশ নেই।

এটা একটা ভ্রান্ত প্রোপাগাণ্ডা যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মূলত ইজতিহাদের দরজা কেউ কখনও বন্ধ করেনি। এ দরজা তো স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলে দিয়েছেন। তাঁর খুলে দেওয়া দরজা কিয়ামত পর্যন্তই খোলা থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত লোকের হাতে ইজতিহাদ থাকবে, ততক্ষণ কেউ এটা বন্ধ করতে পারবে না। এটা ইজতিহাদের দ্বিতীয় স্তর, যা আমাদের এ যুগে কাম্য। সবযুগেই কাম্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমাদের সামনে এমন বেশুমার মাসাইল উপস্থিত রয়েছে, সরাসরি যার ফয়সালা পুরোনো গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। এর ফলে আমরা আমাদের যাপিত জীবনে নানা জটিলতার সম্মুখীন হই। কাজেই এর সমাধান জরুরি আর সেজন্য ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে একটা বিষয়ের প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ কমিটির উপরে ন্যস্ত কাজের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানে ইজতিহাদের কার্যক্রম কিভাবে শুরু করা হবে'। এই শিরোনাম থেকে এরকম একটা ধারণার আঁচ পাওয়া যায় যে, এ যাবতকাল বুঝি এরকমের কাজ কখনও করা হয়নি, এখনই আমরা এটা শুরু করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ একটা শূন্যস্থান আমাদের দ্বারা পূরণ হতে যাচ্ছে। আমি আরয করতে চাই ব্যাপারটা এ রকমের নয় কিছুতেই। যেই ইজতিহাদ কাম্য এবং যার প্রয়োজন এ

উম্মতের সবসময়ই ছিল এবং থাকবে, তা অতীতে কখনও করা হয়নি, আমরাই সবে করতে যাচ্ছি, ব্যাপারটা এ রকমের নয় আদৌ। কেউ এরকম মনে করলে নেহাতই ভুল করবে। বস্তুত এটা আগেও করা হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই 'উলামায়ে কিরাম আপন আপন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখন যদি এ কাজকে কোনও সাংগঠনিকরূপ দান করা হয় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ যুগের চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে সেটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এ কথা মনে করা চরম ভুল হবে যে, 'উলামায়ে কিরাম ইতিপূর্বে কখনও ইজতিহাদ করেননি। যে ধরনের ইজতিহাদ কাম্য তা আগেও করা হয়েছে এবং আগামীতেও তা চলতে থাকবে।

এ তো ছিল কয়েকটি মৌলিক কথা। আমাদের সামনে যে প্রস্তাবনা এসেছে তা হল, এ কাজের জন্য 'উলামায়ে কিরামের একটা বোর্ড তৈরি করা হোক, যারা ইজতিহাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন এবং উদ্ভূত মাসাইল সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করবেন। এ বিষয়ে আমার একটা মৌলিক গুজারেশ রয়েছে। তা হল, আপনারা সম্পূর্ণ চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা দেখতে পাবেন ইসলাম ইজতিহাদের জন্য খৃষ্টজাতির মত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও সংস্থা কায়েম করেনি। যার কথাই হবে শেষকথা এবং তারপর কারও কিছু বলার অবকাশ থাকবে না, এ জাতীয় কোনও সংস্থার অস্তিত্ব ইসলামের ভেতর আপনার চোখে পড়বে না। এটা আছে খৃষ্টজগতে। তাদের পোপ যে কথা বলেন, সেটাই চূড়ান্ত কথা। পোপ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দান করেন, তারপর কারও কোনও মতামত দেওয়ার অবকাশ থাকে না। পোপকে সবরকম ভুলের উর্ধ্বে এক পবিত্র সত্তা গণ্য করা হয়ে থাকে।

কিন্তু ইসলামী ইজতিহাদ আদৌ এ রকমের নয়। ইসলামে ইজতিহাদের জন্য এমন কোনও সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা দাঁড় করানো হয়নি, যাকে চূড়ান্ত রায় প্রদানের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামের নীতি হল, কোনও ফকীহ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরামের সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করার এবং তার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ'র ভিত্তিতে তা সঠিক না ভুল সে সম্পর্কে মীমাংসা কেবল এক পন্থায়ই হতে পারে। তা এই যে, সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মাহ যে ইজতিহাদকে গ্রহণ করে

নেবে, সেটাই সঠিক আর যে ইজতিহাদকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে, তা ভুল। সুতরাং ইজতিহাদের জন্য কোনও বোর্ড গঠন করার পিছনে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী সক্রিয় থাকে যে, এ বোর্ড ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে ফয়সালা নেবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেটাই হবে চূড়ান্ত কথা, তার বিপরীতে অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামের ভিন্নমত পোষণের কোনও এখতিয়ার থাকবে না, তবে আমার দৃষ্টিতে সে দৃষ্টিভঙ্গীও সঠিক নয়।

চতুর্থ কথা হল, এ সময়ে আমরা ইজতিহাদের নামে যদি পৃথক কোনও সংস্থা গঠন করি, তবে তার জন্য ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক কিছু সমস্যাও দাঁড়াতে পারে। কাজেই তার পরিবর্তে আমার প্রস্তাব হল, আমাদের এখানে আগে থেকেই এ জাতীয় কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন 'ইসলামী নাজরিয়াতি কাউন্সিল' এবং 'ইদারা তাহকীকাতে ইসলামী'। যেসকল মাসাইলে 'ইসতিম্বাত', 'ইস্তিখরাজ' ও 'ইজতিহাদ'-এর প্রয়োজন আছে, যেমনটা মাওলানা বললেন, তার একটি তালিকা তৈরি করার পর এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে তা ন্যস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য যখন উদ্ভূত কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য ইজতিহাদ করা হবে, তখন সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার কাজ কেবল সংস্থার সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য 'আলেম-'উলামাকেও তার সঙ্গে যুক্ত করা চাই। সে বিষয়ে তাদের মতামত জেনে ইসলামী নাজরিয়াতি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হোক। এ পন্থা অবলম্বন করলে একদিক থেকে অর্থনৈতিক চাপও কম পড়বে, অন্যদিক থেকে পৃথক পৃথক চিন্তা-ভাবনার ফলে মতভিন্নতার যে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাও কমে যাবে। অন্যথায় একদিকে আপনাদের ইজতিহাদী বোর্ড থাকবে, অন্যদিকে ইসলামী নাজরিয়াতি কাউন্সিলও কাজ করবে, তারপর উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তার নিরসনকল্পে তৃতীয় কোনও কমিটি বা তৃতীয় একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে। ফলে নতুন নতুন জটিলতা সৃষ্টির আশংকা থাকবে। সুতরাং প্রথমে যদি ইসলামী নাজরিয়াতি কাউন্সিল বা ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, তারা এরূপ মাসাইলের তালিকা তৈরি করবে, তারপর দেশের সক্ষম, নির্ভরযোগ্য ও মুত্তাকী 'উলামায়ে কিরামকে একত্র করত এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করবে, অতঃপর সকলে মিলে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করবে, তবে তাই শ্রেয় হবে।

হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রাযি.) থেকে 'মাজমা'উয-যাওয়াইদ' গ্রন্থে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছটির সনদ সহীহ। তাতে নবী কারীম

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে এমন কোনও সমস্যাও দেখা দিতে পারে, যে বিষয়ে আপনার পক্ষ হতে কোনও আদেশ বা নিষেধ নেই, সে ক্ষেত্রে আমরা কী করব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত শব্দে আমাদেরকে নির্দেশনা দান করেন। তিনি বলেন–

شَاوِرُوْا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ

'এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা এরূপ লোকের সাথে পরামর্শ করবে, যারা ফকীহ, দ্বীনের সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞান রাখে এবং যারা 'আবেদ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে। সে ব্যাপারে তোমরা ব্যক্তিবিশেষের মত কার্যকর করবে না।'[১৭০]

অতি স্পষ্ট নির্দেশনা। ব্যক্তিবিশেষের মত গ্রহণ না করে সমষ্টির সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে। কাদের কাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে, তাও বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হবে, যাদের মধ্যে ফিক্‌হ অর্থাৎ দ্বীনের সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞান আছে এবং যারা 'ইবাদতগুজারও বটে।

ইসলামী নাজরিয়াতি কাউন্সিল ও ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী যদি এসব মূলনীতি সামনে রেখে কাজ করে এবং যখন প্রয়োজন বোধ হবে 'উলামায়ে কিরামকে একত্র করে তাদের পরামর্শও নেয়, অতঃপর সকলে মিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা প্রকাশ করে, সেই সঙ্গে তাদের সিদ্ধান্তের উপর অন্যান্য 'উলামায়ে কিরামের পর্যালোচনা করার এখতিয়ার থাকে, তাদের কোনও ভিন্নমত থাকলে তা জানানোর সুযোগ থাকে, তবে সেটাই হবে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও নিরাপদ পন্থা। এভাবে কাজ করলে সামগ্রিকভাবে তা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাতে ইজতিহাদের এ কার্যক্রম তার স্বভাবগত গতিধারায় চলতে পারবে, যেমনটা চৌদ্দশ' বছর যাবত চলে আসছে। পক্ষান্তরে আমরা যদি এর জন্য কোনও কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করি, তবে আমার দৃষ্টিতে এ কার্যক্রমের সচলতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে; বরং চলাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সবশেষে আরেকটি কথা আরয করব– সরকারি তত্ত্বাবধানে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো হলে তাতে একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা

---

১৭০. কানযুল-উম্মাল ৩ খণ্ড, ৪১১ পৃ., হাদীছ নং ৭১৯১; আল-মু'জামুল-আউসাত ২ খণ্ড, ১৭২ পৃ., হাদীছ নং ১৬১৮; মাজমা'উয-যাওয়াইদ ১ খণ্ড, ১৭৮ পৃ.

চাই। তা হচ্ছে, সে প্রতিষ্ঠান যেন অবশ্যই দল ও মত নিরপেক্ষ হয়। সরকার বদলাতে থাকে। লোকজনও আসতে-যেতে থাকে। তাই এ নীতিমালা এমন হওয়া চাই, যা সর্বাবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য হয়। এর সদস্য নির্বাচন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না হয়ে খালেস 'ইলম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে হওয়া চাই, যেমনটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ ফিক্‌হ ও 'ইবাদত-বন্দেগী হবে মনোনয়নের মানদণ্ড। এটা যদি প্রতিষ্ঠানের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ ইজতিহাদের এ কার্যক্রম আমাদের পক্ষে রহমত সাব্যস্ত হবে এবং এর ফলে আমরা ওইসকল আশংকা থেকেও রক্ষা পাব, যা ইজতিহাদের অপব্যবহারের দরুন আমাদের সমাজে জন্ম নিতে পারে।

উপরিউক্ত এই ব্যাখ্যা ও সংশোধনীর সাথে আমি এ কমিটির সুপারিশমালার সাথে ঐকমত্য ঘোষণা করছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাম আওর জিদ্দাত পাসান্দী, ৮৯-৯৬ পৃ.

শরী'আতের দৃষ্টিতে ছবি

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ

'হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন।'[১৭১]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ؟ فَقَالَ: بَلٰى وَلٰكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ

'হযরত 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উতবা (রহ.) বলেন যে, তিনি হযরত আবূ তালহা আনসারী (রাযি.)-এর অসুস্থতাকালে তাকে দেখতে গেলেন। সেখানে হযরত সাহ্ল ইবন হুনায়ফ (রাযি.) আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবূ তালহা আনসারী (রাযি.) এক ব্যক্তিকে ডাকলেন, যাতে তার নিচ থেকে চাদরটি সরিয়ে দেয়। হযরত সাহ্ল (রাযি.) বললেন, এটি সরাবেন কেন? তিনি বললেন, এতে ছবি আছে, অথচ এ বিষয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তা আমার জানা আছে (অর্থাৎ ছবি রাখা ও ছবি তৈরি করা জায়েয নয়)। হযরত সাহ্ল (রাযি.) বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবিকে নাজায়েয সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথা কি বলেননি যে, ওই ছবি ব্যতিক্রম, যা কাপড়ে নকশারূপে থাকে? (এর দ্বারা বোঝা যায়, কাপড়ের উপরে নকশা হিসেবে যে ছবি আঁকা হয়, সে কাপড় ব্যবহার জায়েয।) হযরত আবূ তালহা (রাযি.) বললেন, হাঁ তিনি এ কথা বলেছিলেন, তবে আমার মনে এটাই বেশি ভালো লাগে যে, এরকম ছবিও ব্যবহার করব না।'[১৭২]

---

১৭১. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬৭১

১৭২. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬৭২; নাসাঈ, হাদীছ নং ৫২৫৪; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৪১২; মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৫২৪

ছবি সম্পর্কে ফকীহগণের মতভিন্নতা

এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক (রহ.) এ হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন যে, ছায়াযুক্ত ছবি নাজায়েয আর ছায়াবিহীন ছবি জায়েয। ছায়াযুক্ত ছবি বলতে মাটি, পাথর, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি দ্বারা তৈরি মূর্তি ও ভাস্কর্যকে বোঝায়। কেননা মাটিতে এগুলোর ছায়া পড়ে আর এরূপ ছবি নাজায়েয ও হারাম। আর যে ছবি এরকম শরীর ও কাঠামোধারী নয়, তার ছায়া মাটিতে পড়ে না। এরকম ছবি জায়েয, যেমন কাগজ, কাপড়, দেওয়াল ইত্যাদিতে অঙ্কিত ছবি। এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে এরকম ছবি হারাম নয়; বরং মাকরূহে তানযীহী। মালিকী মাযহাবের বহু 'আলেম এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামায়ে কিরামের মতে শরীরযুক্ত হোক বা না হোক, উভয় প্রকারের ছবি নাজায়েয। তা কাপড় ও কাগজে অঙ্কিত হোক বা কাঠ-পাথর দ্বারা প্রস্তুতকৃত হোক,উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সবটাই হারাম ও নাজায়েয। ইমাম মালিক (রহ.)-এর একটা মতও এরকম।

যে মতে তিনি (ছয়াবিহীন ছবি) নাজায়েয বলেছেন, তার সপক্ষে তাঁর দলীল হল–

إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ

'ওই ছবি ব্যতিক্রম, যা কাপড়ে নকশারূপে থাকে।'[১৭৩]

এ হাদীছে কাপড়ের নকশা হিসেবে যে ছবি থাকে, তাকে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল ছায়াবিহীন ছবি জায়েয।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ প্রথমত দলীল দেন ওইসমস্ত হাদীছ দ্বারা, যাতে সাধারণভাবেই ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাতে ছায়াযুক্ত ও ছায়াবিহীনের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। যেমন উপরে হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ

'হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন।'[১৭৪]

---

১৭৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬৭২; নাসাঈ, হাদীছ নং ৫২৫৪; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৪১২; মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৫২৪

এ হাদীছে শরীরযুক্ত ও শরীরবিহীন কিংবা ছায়াযুক্ত ও ছায়াবিহীন ছবির মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি, সাধারণভাবে সব ছবিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে আরেক হাদীছে আছে–

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللهُ

'যে ব্যক্তি কোনও ছবি তৈরি করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন।'[১৭৫]

এ হাদীছেও কোনও পার্থক্য নেই। অধিকাংশ হাদীছই এমন, যার ভেতর সাধারণভাবে সর্বপ্রকার ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, দেহধারী ও দেহবিহীনের মধ্যে কোনও প্রভেদ করা হয়নি।

এ মাসআলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহায়ে কিরামের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট দলীল হল উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীছ। তিনি বলেন–

"আমি আমার কক্ষে একটি পর্দা লাগিয়েছিলাম। তাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, সেই পর্দায় চোখ পড়ল। তিনি থেমে গেলেন এবং আপত্তি জানালেন। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ পর্দা না সরাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভেতরে প্রবেশ করব না, কারণ এতে ছবি আছে।"[১৭৬]

এ হাদীছটির আলোকে যদি আপনি إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ (ওই ছবি ব্যতিক্রম, যা কাপড়ে নকশারূপে থাকে।)– সম্পর্কিত হাদীছটি পাঠ করেন, তবে এর ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই যে, رَقْمٌ শব্দটি দ্বারা এমন নকশা বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনও প্রাণীর ছবি থাকে না, কেবল প্রাণহীন বস্তুরাজির ছবিই থাকে, যেমন গাছ, ফুল, পাহাড় ইত্যাদি। আরবী ভাষায় رَقْمٌ শব্দটির অর্থ 'নকশা'। কাজেই নকশা যে জিনিসেরই হোক, তা কোনও প্রাণীর হোক বা নিষ্প্রাণ বস্তুর, তাকেই رَقْمٌ বলা হবে। إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ- এর মাধ্যমে নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবিকে নিষেধাজ্ঞা থেকে খারিজ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাপড়ে যদি কোনও প্রাণহীন বস্তুর নকশা থাকে তাতে কোনও ক্ষতি নেই। হযরত সাহ্ল ইবন হুনায়ফ (রাযি.) প্রাণহীন বস্তুর নকশা সম্পর্কেই বলেছেন যে, এটা জায়েয। কিন্তু হযরত আবূ তালহা আনসারী (রাযি.) সেটাকেও পসন্দ করেননি। তিনি বলেন, এই নকশাও আমার পসন্দ নয়, কাজেই আমার নিচ থেকে এই চাদর সরিয়ে দেওয়া হোক।

---

১৭৪. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬৭১

১৭৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৬৭৩; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৭০

১৭৬. মুসলিম, হাদীছ নং ৩৯৩৯

যাহোক اِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ - এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে এর 'ইসতিছনা' (ব্যতিক্রম) হবে 'মুনকাতি' (পূর্বের সাথে সম্পর্করহিত) পর্যায়ের, 'মুত্তাসিল' (পূর্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত) পর্যায়ের নয়। কেননা প্রথম বাক্যে প্রাণীর ছবিই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অতঃপর নিষ্প্রাণ বস্তুকে তার ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। কাজেই উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর হাদীছের আলোকে মালিকীদের প্রদত্ত দলীল যথার্থ হয় না।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রহ.), আর তার মতে ছায়াবিহীন ছবি জায়েয। হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী কোনও রাবী যদি নিজ বর্ণিত হাদীছের বিপরীতে ফতোয়া দেন, তবে তার দ্বারা বোঝা যায় তার নিকট হাদীছটির ভিন্ন কোনও ব্যাখ্যা আছে অথবা হাদীছটি 'মানসূখ' (রহিত)। মালিকীগণও এস্থলে এই ব্যাখ্যাই করে থাকেন যে, কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রহ.) ছায়াবিহীন ছবিকে জায়েয বলে থাকেন। কিন্তু ছবির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত আছে এবং সবই সাধারণ অর্থাৎ তার ভেতরে ছায়াদার ও ছায়াবিহীনের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতই বেশি শক্তিশালী এবং বেশি সতর্কতার পরিচায়ক।

ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবির বিধান

ছবি সম্পর্কে যখন ফুকাহায়ে কিরামের ভিতরে আলোচনা পর্যালোচনা চলছিল, তখন ক্যামেরার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন ছবি হাতে আঁকা হত বা হাতিয়ার দ্বারা তৈরি করা হত। যখন ক্যামেরা আবিষ্কৃত হল এবং এর দ্বারা ছবি তোলা শুরু হল তখন নতুন প্রশ্ন উঠল যে, এ ছবির বিধান কী হবে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে উপায়-উপকরণের পরিবর্তনের কারণে বিধানের পরিবর্তন হয় না। একটা জিনিস আগে হাতে তৈরি হত, এখন মেশিনে তৈরি হয় । জিনিস কিন্তু একই, কেবল মাধ্যমের বদল। মাধ্যম বদলে যাওয়ার কারণে জায়েয-নাজায়েয ও হালাল-হারামের মধ্যে প্রভেদ ঘটে না। ছবি যদি না জায়েয হয়ে থাকে, তবে তা হাতে আঁকা হোক বা ক্যামেরায় তোলা হোক উভয় অবস্থায়ই না জায়েয হবে।

অবশ্য মুফতী আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বুখাইত (রহ.) নামে মিশরে একজন বড় আলেম ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি মিশরের মুফতী ছিলেন। অত্যন্ত মুত্তাকী পরহেযগার ছিলেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন না। তিনি "আল জাওয়াবুশ্ শাফী ফী ইবাহাতি সূরাতি ফুতূগ্রাফী" নামে একটি পুস্তিকা

লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেন, ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি নাজায়েয নয়। দলিল হিসেবে বলেন, হাদীছে ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার যে কারণ বলা হয়েছে তা হল 'মুশাবাহাত বিখালকিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যস্থাপন বা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ কিছু করা। তো আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ কেবল তখনই হতে পারে, যখন কেউ নিজ কল্পনা ও উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা নিজ হাতে কোনও ছবি তৈরি করবে। ক্যামেরার মাধ্যম যে ছবি তোলা হয়, তাতে কল্পনাশক্তির কোনও ভূমিকা থাকে না; বরং ক্যামেরার ছবিতে যা হয় তা হচ্ছে, আল্লাহর এক সৃষ্টি আগে থেকেই বর্তমান আছে, ক্যামেরা তার প্রতিবিম্ব নিয়ে তা সংরক্ষণ করে। কাজেই এটা আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ হলো না; বরং ছায়া সংরক্ষণ ও প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হল। এটা নাজায়েয নয়। এই হল মুফতী আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বুখাইত (রহ.)-এর মত। মিশর ও আরব এলাকার বহু 'আলেম এ ব্যাপারে তাঁর মত সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামায়ে কিরাম তাঁর এ যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করেননি। তাঁর কালেও না পরবর্তীকালেও না, বিশেষত এই উপমহাদেশের 'আলেমগণ। তাদের মতে 'মুশাবাহাত বিখালকিল্লাহ' সর্বাবস্থায়ই হয়ে থাকে। তা পূর্বে বিদ্যমান থাকা কোনও বস্তুর প্রতিচ্ছবি নেওয়া হোক কিংবা নিজ কল্পনাশক্তি দ্বারা এমন কোনও ছবি আঁকা হোক, যার কোনও অস্তিত্ব আগে ছিল না। শায়খ মুহাম্মাদ বুখাইত (রহ.) যে বলেছেন– আগে বিদ্যমান থাকা বস্তুর ছবি তৈরি করা জায়েয, তা যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে তো ক্যামেরা দ্বারা তোলা হোক বা হাতে আঁকা হোক সর্বাবস্থায়ই তা জায়েয হবে। অথচ হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ছবির ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন, তা ছিল হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ঘোড়ার ছবি। সে ঘোড়া তো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিই ছিল।[১৭৭]

সুতরাং সে ছবি কোনও কাল্পনিক বস্তুর ছবি ছিল না, অথচ তা সত্ত্বেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে আপত্তি তুলেছেন। এর দ্বারা বোঝা গেল আগে থেকে বিদ্যমান থাকা বস্তুর ছবি এবং কল্পনাশক্তি খাটিয়ে তৈরি করা ছবির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। উভয়টাই নাজায়েয। কুরআন ও সুন্নাহয় পার্থক্যের কোনও দলীল নেই। আর যা দ্বারা ছবি তোলা হয়, সে মাধ্যম সম্পর্কে কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মাধ্যমের পরিবর্তনের

---

১৭৭. বুখারী, হাদীছ নং ২০৭৩; আহমাদ, হাদীছ নং ২৬৭১

কারণে বিধানের মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'উলামায়ে কিরামের কাছে এ মতই বেশি শক্তিশালী যে, হাতের তৈরি ছবি যেমন নাজায়েয তেমনি ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবিও নাজায়েযই হবে। তাই এর থেকে বিরত থাকা জরুরি।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছবির বিধান

অবশ্য এই মতভেদ প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার সামনে এসে যায়। তা হল, ছবির জায়েয-নাজায়েযের বিষয়টা দুই কারণে ইজতিহাদী বা তর্কসাপেক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। একটি কারণ হল, এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.)-এর ভিন্নমত থাকা। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ক্যামেরার ছবি প্রসঙ্গে 'আল্লামা বুখাইত (রহ.)-এর ফতোয়া। যদিও তার সে ফতোয়া আমাদের মতে সঠিক নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নতুন বিষয় সম্পর্কে একজন পরহেযগার সুযোগ্য 'আলেমের মতের গুরুত্ব আছে। তাই এ মাসআলা তর্কসাপেক্ষ হয়ে গেছে। যে মাসআলায় বিতর্ক আছে, ব্যাপক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাতে কিছুটা অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং যেসকল ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দেবে, যেমন পাসপোর্ট, আইডি কার্ড ইত্যাদি, সেখানে ছবি ব্যবহারের অবকাশ থাকবে এবং তাকে জায়েযই বলা হবে। এমনিভাবে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের পরিচয়দানের জন্য ছবির প্রয়োজন হয় এবং ছবির মাধ্যমে পরিচয়দান ছাড়া কাজ চলেনা, সে ক্ষেত্রেও ছবি ব্যবহার জায়েয হবে। এরকম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া ছবি ব্যবহার কিছুতেই জায়েয নয়, এর থেকে বিরত থাকা অবশ্যকর্তব্য।

প্রাণহীন বস্তুর ছবি

এই যে দীর্ঘ আলোচনা এতক্ষণ যাবত হল, এর সম্পর্ক প্রাণীর ছবির সাথে। যেসকল বস্তুর প্রাণ নেই, তার ছবি তোলা জায়েয। সুতরাং 'মুসনাদে আহমাদ'-এর একটি হাদীছে এ পার্থক্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে– প্রাণবিশিষ্ট বস্তুর ছবি তোলা জায়েয নয় আর প্রাণহীন বস্তুর ছবি তোলা জায়েয।

এ পার্থক্যের কারণ হল, যে বস্তুর প্রাণ নেই তার অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে মানবচেষ্টার কিছু না কিছু বাহ্যিক ভূমিকা অবশ্যই থাকে, যেমন গাছ-বৃক্ষ। একটা গাছ জন্মানোর জন্য মানুষ মাটি নরম করে, তাতে বীজ বোনে, পানি দেয়, সংরক্ষণ করে, যত্ন নেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যে বস্তুর প্রাণ আছে তার অস্তিত্বলাভে মানবীয় চেষ্টার কোনও ভূমিকা নেই।

টেলিভিশনের হুকুম

ক্যামেরার পর আবিষ্কৃত হয়েছে টেলিভিশন। এতেও ছবি আসে। সে ছবি দেখাও যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ছবি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কী হবে? প্রথম কথা হচ্ছে, বর্তমানকালে টেলিভিশনের ব্যবহার যেভাবে হয়ে থাকে তা নানারকম আপত্তিকর বিষয়ের সমষ্টি। অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা কী নেই তাতে! এ কারণে আমাদের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেওয়া হয় ঘরে টেলিভিশন রাখাই জায়েয নয়। এবার সামনে যে ব্যাখ্যা পেশ করতে যাচ্ছি তা টেলিভিশন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও দৃষ্টিভঙ্গীগত আলোচনা। মনোযোগের সাথে শুনুন।

টেলিভিশন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও দৃষ্টিভঙ্গীগত পর্যালোচনা

টেলিভিশনে যেসকল প্রোগ্রাম দেখানো হয় তা তিন রকম–

এক. এমনসব প্রোগ্রাম, যার ছবি আগে থেকেই থাকে। টেলিভিশনের স্ক্রীণে তা বড় করে দেখানো হয়। এগুলো যে ছবি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই তা দেখা হারাম। সাধারণ ছবি সম্পর্কে যা বিধান, সে একই বিধান এ ক্ষেত্রেও প্রজোয্য।

দুই. এমনসব প্রোগ্রাম, যাতে মাঝখানে ফিল্মের কোনও ব্যাপার থাকে না; বরং তা সরাসরি টেলিকাসট করা হয়। উদাহরণত এক ব্যক্তি টিভি স্টেশনে বসে বক্তৃতা করছে অথবা অন্য কোনও স্থানে বক্তৃতা করছে আর টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি তার বক্তৃতা এবং তার ছবি টিভি স্ক্রীণে দেখানো হচ্ছে, মাঝখানে ফিল্ম ও রেকর্ডিংয়ের কোনও ব্যাপার নেই। 'উলামায়ে কিরামের একটি বড় দল একেও ছবি সাব্যস্ত করে থাকেন এবং এর ব্যবহারকে নাজায়েয বলেন। কিন্তু এর ছবি হওয়ার ব্যাপারে আমার খটকা আছে।

তিন. এমনসব প্রোগ্রাম, যা ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখানো হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।

লাইভ প্রোগ্রাম প্রসঙ্গ

সরাসরি দেখানো ছবি সম্পর্কে আমার যে খটকা তার কারণ, ছবি বলা হয় এমন জিনিসকে, যা কোনও জিনিসে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত বা স্থাপিত করে দেওয়া হয়। কাজেই যে ছবি কোনও জিনিসে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত বা স্থাপিত নয়, তাকে মূলত ছবি বলা যায় না; বরং তা সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব। টেলিভিশনে সরাসরি যে প্রোগ্রাম দেখানো হয়, তার ছবিও প্রকৃতপক্ষে ছবি

নয়; বরং প্রতিবিম্ব। যেমন, এক ব্যক্তি এখান থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত। তার হাতে একটা বাইনক্যুলার আছে, সেই বাইনক্যুলারের মাধ্যমে সে এখানকার দৃশ্য দেখছে। বলাবাহুল্য, দু' মাইল দূর থেকে সে বাইনক্যুলারের সীসার ভেতর এখানকার প্রতিবিম্ব দেখছে, ছবি দেখছে না। কেননা এই প্রতিবিম্ব স্থায়ীভাবে কোনও বস্তুতে অঙ্কিত ও স্থিত নয়। ঠিক এরকমই টেলিভিশনে যে লাইভ প্রোগ্রাম দেখানো হয়, তাতে টেলিকাস করার সময় তড়িৎকণার মাধ্যমে মানবাকৃতির কণাসমূহ স্থানান্তরিত করা হয়, অতঃপর স্ক্রীণের মাধ্যমে তা দেখানো হয়। কাজেই এটা ছবির তুলনায় প্রতিবিম্বরই বেশি নিকটবর্তী।

ভিডিও ক্যাসেটের বিধান

তৃতীয় প্রকার ছিল ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখানো ছবি। অর্থাৎ কারও কোনও বক্তৃতা এবং তার ছবির কণাসমূহ নিয়ে ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষণ করা হয়, তারপর সেই কণাসমূহকে যেই ধারাবাহিকতায় ধারণ করা হয়েছিল, আনুপূর্বিক সেইভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে হুবহু সেই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। আমার মতে এটাকেও ছবি বলা কঠিন। কেননা ভিডিও ক্যাসেটে যে জিনিস সংরক্ষিত থাকে তা আদৌ ছবি নয়; বরং কেবলই তড়িৎকণা। এজন্যই ভিডিও ক্যাসেটের রিল যদি কেউ দুরবিন লাগিয়ে দেখে, তবে তার ভেতর কোনও ছবি দেখতে পাবে না। এজন্যই আমার মনের ঝোঁক এদিকেই যে, এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বিধান ঠিক ছবির বিধানের মত হবে না। তাই এমন বিশুদ্ধ কোনও প্রোগ্রাম যদি টেলিভিশন বা ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখানো হয় যা এমনিতে জায়েয, তবে তা দেখা মৌলিকভাবে জায়েয হবে।

এসব কথা 'উলামায়ে কিরামের জন্য কেবলই বোঝার ও পারস্পরিক আলোচনার বিষয়। এর বেশি প্রচার বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা তাতে মানুষ টিভি ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ পাবে। তাই জনসাধারণের মধ্যে এটা বয়ান করারও প্রয়োজন নেই। তাদেরকে কেবল এ কথাই শোনানো চাই যে, টিভি নাজায়েয। কেননা নাজায়েয প্রোগ্রাম থাকবে না, এমন টিভির কল্পনা করাও এ যুগে অসম্ভব। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য।

সূত্র : তাকরীরে তিরমিযী ২খণ্ড, ৩৪৬-৩৫২ পৃ.

সূর্যগ্রহণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ঘোষণা করেছেন আগামী ২৪-শে অক্টোবর পাকিস্তানে সূর্যগ্রহণ হবে। দেশের কোনও কোনও এলাকায় পূর্ণগ্রহণ হবে এবং কোনও কোনও এলাকায় আংশিকগ্রহণ। বলা হয়ে থাকে, এতবড় গ্রহণ প্রায় দু'শ বছর পরে হতে যাচ্ছে। সূর্যগ্রহণের বাহ্যিক কারণ তো হল পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চাঁদ ঢুকে পড়া। চাঁদের আড়ালের কারণে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌছতে পারে না, ফলে পৃথিবীতে চাঁদের ছায়া পড়ে। সেই ছায়ায় পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হলে দিনের বেলায়ও রাতের মত অন্ধকার হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় আকাশে নক্ষত্রও পরিদৃষ্ট হয়। বলা হয়ে থাকে, সূর্যগ্রহণ অবস্থায় চাঁদের যে ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তা আনুমানিক দেড়শ' মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং ঘন্টায়প্রায় বিশ হাজার মাইল গতিতে তা চলতে থাকে। পৃথিবীর যে অংশ সেই ছায়ার আওতায় এসে যায়, সেখানেই সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। অবশেষে যখন চাঁদ সূর্যের সম্মুখ থেকে সরে যায়, তখন তার ছায়াও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং গ্রহণের সমাপ্তি ঘটে। অনন্তর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌছতে শুরু করে।

এটাও আল্লাহ তা'আলার অপার হিকমতের কারিশমা যে, আয়তনের দিক থেকে সূর্য চাঁদের চেয়ে চারশ' গুণ বড়, তাই সাধারণ অবস্থায় চাঁদ সূর্যকে আড়াল করতে পারে না, কিন্তু পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যেহেতু সূর্যের তুলনায় চারশ' গুণ কম, তাই আমাদের চোখে উভয়ের আয়তন সমান মনে হয়, ফলে চন্দ্র যখন সূর্যের ঠিক বরাবর পৌছে যায়, তখন সে চন্দ্রকে পুরোপুরি আড়াল করে ফেলে। যখন পুরোপুরি আড়াল করে ফেলে, তখনকার সে অবস্থাকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ বলে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ মাত্র এক সেকেণ্ডই স্থায়ী হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে ইতিহাসে এ পর্যন্ত পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়ীত্ব সর্বোচ্চ সাত মিনিট রেকর্ড করা হয়েছে। তবে পূর্ণগ্রহণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর আংশিকগ্রহণ দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতে পারে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের আগে আরব এলাকায় প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনও বড় ব্যক্তির ইন্তিকাল হলে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ

লাগে কিংবা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগলে তা এ কথার আলামত হয়ে থাকে যে, কোনও বড় ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন অথবা এরচে'ও বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে। বস্তুত এটা ছিল তাদের কুসংস্কার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের এই কুসংস্কারকে কঠোরভাবে রদ করেন।

ঘটনাক্রমে হিজরী দশ সালে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীমের ওফাত হয়ে যায়, ঠিক সেদিনই মদীনা মুনাওয়ারায় সূর্যগ্রহণ হয়। কিছুলোক তাদের প্রাচীন ধর্মানুযায়ী বলতে শুরু করে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীমের ইন্তিকালের কারণেই সূর্যগ্রহণ লেগেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ দেন এবং তাতে তাদের এ ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। তিনি ইরশাদ করেন–

"কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে চাঁদ-সূর্যের গ্রহণ লাগে না; বরং এ দু'টো আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন।"[১৭৮]

আমাদের ঘিরে রাখা রহস্যময় এ সৃষ্টিজগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় তার মধ্যে অনেক ঘটনা এমন, যেগুলোর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উৎকর্ষ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমরা অবগত হতে পারিনি (বরং অধিকাংশ ঘটনাই এমন)। কিছু কিছু ঘটনা এমনও আছে, অন্ততপক্ষে যার বাহ্যিক কারণ আমরা জানতে পেরেছি। তবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যা-কিছু আমরা অবগত হতে পেরেছি, সেগুলো এসব ঘটনার বাহ্যিক কারণ মাত্র। কিন্তু সেসব বাহ্যিক কারণের পিছনে এসব ঘটনার মূল কারণ ও রহস্য কী, তা আমরা আমাদের দুরবীন এবং বস্তুদর্শনের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও অবগত হতে পারিনি। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যদি (সূর্যের তুলনায়) চারশ' গুণ (কম না হয়ে এর চেয়ে) বেশি হত, তবুও সূর্যের পরিপূর্ণ গ্রহণ লাগত না অথবা সূর্যের আয়তন যদি চাঁদের তুলনায় চারশ' গুণেরও বেশি হত, তখনও চাঁদ সূর্যকে আড়াল করতে পারত না। প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্যকে চাঁদের চেয়ে চারশ' গুণ বড় বানিয়ে পৃথিবী থেকে তার দূরত্বের অনুপাতও সূর্যের তুলনায় সেই চারশ' গুণ কম কে রাখল? এবং কেন রাখা হল? পরন্তু চাঁদ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের এমন হিসাব কে নির্ধারণ করল এবং কেন নির্ধারণ করল, যদ্দরুন এক নির্দিষ্ট তারিখ ও নির্দিষ্ট সময়ে কোনও এলাকায়

১৭৮. বুখারী, হাদীছ নং ৯৮৫; মুসলিম, হাদীছ নং ১৫০৮; আহমাদ, হাদীছ নং ১৩৮৯৭; দারিমী, হাদীছ নং ১৪৮৪

সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে এবং অন্যান্য স্থানে ও অন্যান্য সময়ে এ ঘটনা ঘটে না? কুরআন মাজীদে সূরা আর-রাহমানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, চাঁদ ও সুরুজ একটি হিসাবের অধীনে আছে।[১৭৯]

এ কারণেই হিসাব করতে ভুল না হলে বহু বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, অমুক তারিখ অমুক সময়ে অমুক স্থানে সূর্যগ্রহণ হবে। (চীনসম্রাট চিংকিয়াং খৃষ্টপূর্ব ২১৩৭ সালে দু'জন রাজ-জ্যোতিষীকে কেবল এ কারণে হত্যা করেছিল যে, তারা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি।) কে তিনি, যিনি এরকম ঠিকঠাক হিসাব নির্ধারণ করে বিস্ময়কর এই মহাজাগতিক বস্তুরাজিকে সেই হিসেবের অধীন করে দিয়েছেন? কে তিনি, যিনি গ্রহ-নক্ষত্রের এই নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে স্থির করে দিয়েছেন, যদ্দরুন ঠিক অমুক সময় অমুক স্থানেই গ্রহণ দেখা যাবে? এবং সেই সুনির্দিষ্ট স্থানসমূহ বা সুনির্দিষ্ট সময়সমূহকে নির্বাচনের পিছনেই বা কী রহস্য লুক্কায়িত আছে?

এসব প্রশ্নের একটি সরল উত্তর এই দেওয়া হয়ে থাকে যে, এসবই আকস্মিকতার (Coincidence) কারিশমা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই মহাজগতে অচেতন আকস্মিকতা বলতে কিছু নেই। মহাজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তা'আলার অপার হিকমতেই পরিচালিত। তাঁর হিকমতের বাইরে একটা কণাও নড়ে না। আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধির সাহায্যে এই নড়াচড়ার রহস্য বুঝতে পারি না। তাই আমরা আমাদের অজ্ঞতাকে আকস্মিকতার আড়ালে লুকিয়ে রাখি। অন্যথায় এই যাবতীয় আকস্মিক ঘটনাবলির ভেতর কোনও না কোনও রহস্য সেখানে বিদ্যমান আছে, যেখান থেকে মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। যেসকল লোকের দৃষ্টি এসব ঘটনার কেবল বাহ্যিক কারণসমূহের ভেতর সীমাবদ্ধ, তাদের জন্য তো মহাজগতের এসব দৃশ্য এক আকর্ষণীয় তামাশার বেশি কিছু নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি এসব বাহ্যিক কারণ ছাপিয়ে আরও দূরে চলে যায়, সে এসব ঘটনাকে আল্লাহ তা'আলার অপার হিকমত এবং তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের ধ্যান তাজা করার কাজে ব্যবহার করে।

এসব ঘটনার যে বাহ্যিক কারণ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের মাধ্যমে জানা যায়, আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালাম তা বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কেননা এসব কারণ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা

---

১৭৯. সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৫

মানুষকে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের পুঁজি দান করেছেন। মানুষের কর্তব্য তা ব্যবহার করা। এর জন্য ওহীর নির্দেশনা প্রয়োজন নেই। আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালাম এসব বাহ্যিক কারণের উর্ধ্বস্থিত বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন, যেসব বিষয় পর্যন্ত পৌঁছতে মানববুদ্ধি অক্ষম। মানুষ সে অক্ষমতাকে আকস্মিকতা নাম দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করে। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গলদ বিশ্বাস খণ্ডন করেন যে, কারও জীবন-মরণের সাথে চাঁদ-সূর্যের কোনও সম্পর্ক আছে। কিন্তু তাই বলে এর এই সায়েন্টেফিক কারণ বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নেই যে, মাঝখানে চাঁদ এসে যাওয়ার কারণে সূর্যগ্রহণ লাগে, যেহেতু এর সম্পর্ক কেবলই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শনের সাথে। তার পরিবর্তে তিনি বাহ্যিক কারণের উর্ধ্বে যে হাকীকত বিদ্যমান রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে হাকীকত মানুষ এরূপ ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে যায়। আর সে হাকীকত এই যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলার অপার হিকমত ও পরিপূর্ণ কুদরতের এই অনুধ্যান ও স্বীকৃতির এক ব্যবহারিক পন্থা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখনই সূর্যগ্রহণ লাগে, তখন সালাতুল-কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায) আদায় করবে।

কুসূফ একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ 'সূর্যগ্রহণ'। হিজরী দশ সালে মদীনা মুনাওয়ারায় যখন সূর্যগ্রহণ লাগে, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল-কুসূফ আদায়ের জন্য মানুষকে একত্র করেন, অতঃপর সম্ভবত তিনি তাঁর মুবারক জীবনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নামায হিসেবে এই সালাতুল-কুসূফের ইমামত করেন। এতে কিয়াম, রুকূ', সিজদা প্রভৃতি সাধারণ নিয়ম অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি দীর্ঘায়িত করা হয়েছিল। নামায আদায়ের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ দেন। তাতে শিক্ষাদান করেন যে, যখনই এরকম সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়, তখন মুসলিমদের কর্তব্য সালাতুল-কুসূফ আদায় করা।[১৮০]

সালাতুল-কুসূফ সুন্নতে মুআক্কাদা। কোনও কোনও ফকীহ একে ওয়াজিবও বলেছেন। কাজেই আগামী ২৪ অক্টোবর এই নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এমন যে-কোনও জায়গায় এ নামায জামাতের সাথে আদায় করা যেতে পারে, যেখানে জুমু'আও হয়ে থাকে। এর জন্য

---

১৮০. বুখারী, হাদীছ নং ৯৮৮; মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৯৯; নাসাঈ, হাদীছ নং ১৪৫৫

আযান-ইকামত সুন্নত নয়, তবে মানুষকে একত্র করার জন্য সাধারণ ভাষায় ঘোষণা করা যেতে পারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল-কুসূফের জন্য যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার ভাষা ছিল–

اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

'জামাতের সাথে নামায আদায় হতে যাচ্ছে।'

তবে ঘোষণার জন্য শরী'আতে এ বাক্যই নির্দিষ্ট নয়, অন্য শব্দেও ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে।

সালাতুল-কুসূফ দু' রাক'আত। এ নামাযের নিয়মও অন্যান্য নামাযের মতই। এর জন্য আলাদা কোনও নিয়ম নেই। তবে এ নামাযে দীর্ঘ ক্বিরাত পড়া সুন্নত। এমনিভাবে রুকূ'-সিজদাও দীর্ঘ হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাক'আতে সূরা বাকারার প্রায় সবটাই পড়েছিলেন। এ ক্বিরাত দিনের অন্যান্য নামাযের মত আস্তেও পড়া যায় আবার মুক্তাদীদের অবসন্নতার আশংকা হলে উচ্চ আওয়াজেও পড়া যেতে পারে। নামায আদায়ের পর গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'আ, তাসবীহ, যিক্‌র ইত্যাদিতে রত থাকা মুস্তাহাব। তাছাড়া সূর্যগ্রহণের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি দান-খয়রাত করার প্রতিও উৎসাহ দিয়েছেন।

কোনও ব্যক্তি যদি বিশেষ কারণবশত সালাতুল-কুসূফের জামাতে শামিল হতে না পারে, তবে ঘরে বা অন্য যে-কোনও স্থানে একাকীও এ নামায পড়তে পারে। মহিলাদেরও উচিত আপন আপন ঘরে একা একা এ নামায আদায় করা। সালাতুল-কুসূফের নিয়তে দু' রাক'আত নামায পড়বে। যতটা লম্বা সূরা মুখস্থ আছে, তা পড়বে, রুকূ'-সিজদাও লম্বা লম্বা করবে আর বাকি সময় বেশি বেশি দু'আ, যিক্‌র ও তাসবীহপাঠে ব্যয় করবে।

সূত্র : যিক্‌র ওয়া ফিক্‌র
২৬ জুমাদাল-উলা, ১৪১৬ হিজরী
২২ অক্টোবর, ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ফুল

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের আগ্রহ আমাদের সমাজে যেসব কুপ্রথা চালু করেছে, এপ্রিল ফুল উদ্‌যাপনের রসম তার অন্যতম।এই রসম পালন করতে গিয়ে এপ্রিলের পয়লা তারিখ মিথ্যা বলে কাউকে ধোঁকা দেওয়া আর ধোঁকা দিয়ে তাকে বেকুব বানানোকে কেবল জায়েযই মনে করা হয় না; বরং এটাকে রীতিমত একটা কৃতিত্ব গণ্য করা হয়। যে ব্যক্তি যতটা নিখুঁতভাবে ও চাতুর্যের সাথে অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে, তাকে ততবেশি শাবাশিযোগ্য মনে করা হয়। ভাবা হয়, পয়লা এপ্রিলকে যথাযথভাবে সে-ই কাজে লাগাতে পেরেছে।

এই যে রুচি, যাকে বাস্তবিকপক্ষে কুরুচিই বলা উচিত, অকারণে কত লোকের দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করে তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এমনকি অনেক সময় এর ফলে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। হয়ত কাউকে এমন কোনও দুঃসংবাদ শোনানো হল, যা সে সইতে পারল না, মুহূর্তেই হার্টফেল করে মারা গেল।

মিথ্যাবলা, ধোঁকা দেওয়া এবং অহেতুক বেকুব বানানোর এই যে রসম, এটা নৈতিক দিক থেকে যে কত ন্যক্কারজনক তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু এর ঐতিহাসিক দিকও সেইসব লোকের জন্য নিতান্তই লজ্জাজনক, যারা হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদার প্রতি যে-কোনওভাবে বিশ্বাস রাখে। এই প্রথাটির সূচনা কিভাবে হয়, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা নানারকম। কোনও কোনও লেখকের বক্তব্য হল, ফ্রান্সে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের আগে বছর গণনা শুরু হত এপ্রিল থেকে, জানুয়ারি থেকে নয়। রোমানরা তাদের দেবী 'ভেনাস'-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে এ মাসকে পবিত্র গণ্য করত। গ্রীক ভাষায় ভেনাস শব্দের অর্থ করা হত Aphrodite। সম্ভবত এই গ্রীক নাম থেকেই উদ্ভাবন করে এপ্রিল মাসের নামকরণ করা হয়েছে।[১৮১]

কোনও কোনও লেখক বলেন, যেহেতু পয়লা এপ্রিল বছরের পয়লা তারিখ হত এবং তার সঙ্গে পৌত্তলিক বিশ্বাসও জড়িত ছিল, তাই মানুষ এ দিনটিকে একটি উৎসবের দিন হিসেবে পালন করত। হাসি-ঠাট্টাও ছিল

---

১৮১. ব্রিটানিকা, এডিশন ১৫, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯২

তাদের আনন্দ-উদ্‌যাপনের একটা বিশেষ অঙ্গ। কালক্রমে এটাই ক্রমবিকাশের ধারায় এপ্রিল ফুলের রূপ পরিগ্রহ করে।

কেউ কেউ বলেন, আনন্দ-উদ্‌যাপনের এই দিনে মানুষ একে অন্যকে বিভিন্ন উপহারও দিত। একবার কোনও একজন উপঢৌকনের নামে কারও সাথে উপহাস করে বসে। পরবর্তীতে সেই উপহাসই যথারীতি একটা প্রথায় পরিণত হয়।

ব্রিটানিকায় এ প্রথার আরও একটি কারণ বলা হয়েছে। ২১ মার্চ থেকে ঋতু পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তনকে কেউ কেউ এভাবে ব্যক্ত করে যে, প্রকৃতি আমাদের সংগে তামাশা করে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছে, তাই মানুষও সে ঋতুতে একে অন্যকে বেকুব বানাতে শুরু করে দিল।[১৮২]

এখনও পর্যন্ত এ বিষয়টা অস্পষ্ট রয়ে গেছে যে, প্রকৃতির এই কথিত তামাশার পরিণামে যে এই প্রথাটি চালু করা হল, তা এর দ্বারা কি প্রকৃতির অনুসরণ করা উদ্দেশ্য ছিল, না প্রতিশোধ গ্রহণ করা?

এর তৃতীয় কারণ বর্ণনা করেছে উনবিংশ শতাব্দির প্রসিদ্ধ ইনসাইক্লোপিডিয়া লারুস। বর্ণিত সে কারণটিকেই এই গ্রন্থে সঠিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণটি হল– প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বর্ণিত তথ্যমতে পয়লা এপ্রিল হল সেই তারিখ, যেদিন রোমান ও ইহুদীদের পক্ষ থেকে হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র বানানো হয়। প্রচলিত নামসর্বস্ব ইঞ্জিলসমূহে সে ঘটনার বিশদ বর্ণিত হয়েছে। লূকের ইঞ্জিলে আছে–

"যারা 'ঈসাকে গ্রেফতার করেছিল, তারা তাকে ঠাট্টা করতে ও মারতে লাগল। তারা 'ঈসার চোখ বেঁধে দিয়ে বলল, বলতো দেখি তোকে কে মারল? এভাবে তারা আরও অনেক কথা বলে তাকে অপমান করল।"[১৮৩]

ইঞ্জিলসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত মসীহ (আঃ)-কে প্রথমে ইহুদী সর্দার ও তাদের পণ্ডিতগণের উচ্চ আদালতে উপস্থিত করা হয়। তারপর তাঁকে পীলাতের আদালতে হাজির করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সেখানেই তাঁর সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। অতঃপর পীলাত তাকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত হেরোদ তাঁকে পুনরায় পীলাতেরই আদালতে প্রেরণ করে।

---

১৮২. ব্রিটানিকা ১খণ্ড, ৪৯৬ পৃ.
১৮৩. লূক ২২ ঃ ৬৩-৬৫

লারুসের বক্তব্য হল, হযরত মসীহকে এক আদালত থেকে অন্য আদালতে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সাথে ঠাট্টা করা ও তাঁকে কষ্ট দেওয়া। আর এ ঘটনা যেহেতু পয়লা এপ্রিলে ঘটেছিল, তাই এপ্রিল ফুলের প্রথা মূলত সেই লজ্জাজনক ঘটনারই স্মারক।

এপ্রিল ফুল পালনের মাধ্যমে যাকে বেকুব বানানো হয়, ফরাসি ভাষায় তাকে Poisson D'avril বলা হয়। এর ইংরেজি অর্থ হচ্ছে April Fish অর্থাৎ এপ্রিলের মাছ।[১৮৪]

বোঝানো উদ্দেশ্য, যাকে বোকা বানানো হল সে যেন পয়লা এপ্রিলে শিকার করা প্রথম মাছ। কিন্তু লারুস তার উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে জানাচ্ছে Poisson শব্দটি, যার অর্থ করা হয়েছে 'মাছ', মূলত এর কাছাকাছি ফরাসি শব্দ Posion-এর বিকৃত রূপ, যার অর্থ হল কষ্ট দেওয়া, শাস্তি দেওয়া। সুতরাং এই প্রথাটি চালু করা হয়েছে মূলত সেই শাস্তি ও কষ্টের স্মারকস্বরূপ, খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী যা হযরত মসীহ (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল।

অপর এক ফরাসি লেখক বলেন, Poisson শব্দটি তার আসল রূপেই আছে। তবে এটা মূলত পাঁচটি শব্দের আদ্যাক্ষর দ্বারা তৈরি। ফরাসি ভাষায় শব্দগুলোর অর্থ যথাক্রমে– 'ঈসা, মসীহ, আল্লাহ, পুত্র ও প্রায়শ্চিত্ত।[১৮৫]

যেন এ লেখকের দৃষ্টিতেও এপ্রিল ফুলের সূচনা হয়েছে হযরত 'ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কৃত ঠাট্টা-উপহাস এবং তাঁকে প্রদত্ত শাস্তি ও কষ্টের স্মারকস্বরূপ।

যদি এ কথা সঠিক হয়ে থাকে (লারুস ও অন্যান্য গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ মতকে সঠিক বলা হয়েছে এবং এর অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।), তবে খুব সম্ভব এ প্রথাটি ইহুদীরাই চালু করেছে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'ঈসা (আঃ)-কে হাসির পাত্র বানানো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, হযরত 'ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার লক্ষে ইহুদীরা যে কুপ্রথাটি চালু করেছে, খৃষ্টানজাতি কিভাবে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে! কেবলই কি গ্রহণ করে নিয়েছে; বরং নিজেরাও সেটির উদ্‌যাপন ও রেওয়াজদানে শরীক হয়ে গেছে। এর একটা কারণ এও হতে পারে যে, খৃষ্টসম্প্রদায় এর মূল সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা না বুঝেই এর অনুসরণ-

---

১৮৪. ব্রিটানিকা ১খণ্ড, ৪৯৬ পৃ.

১৮৫. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফরীদ ওয়াজদি, দাইরাতু মা'আরিফিল-কুরআন ১খণ্ড, ২১-২২ পৃ.

অনুকরণ শুরু করে দেয়। তবে এ কথাও সত্য যে, খৃষ্টসম্প্রদায়ের মেজায-রুচি বড় আজব। তাদের ধারণামতে যেই ক্রুশে হযরত মসীহ (আঃ)-কে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল, কথাতো ছিল তারা সেটিকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে, যেহেতু তার মাধ্যমে হযরত মসীহকে নির্যাতন করা হয়েছিল, কিন্তু উল্টো তারা কিনা সেটিকে একটি পবিত্র বস্তু হিসেবে পূজা করতে শুরু করল। আজ খৃষ্টধর্মে ক্রুশকেই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজনীয় বস্তু মনে করা হয়ে থাকে।

যাহোক উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এতটুকু কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এপ্রিল ফুলের প্রথাটি ভেনাস দেবীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হোক বা এটি প্রকৃতির উপহাসের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পালিত হোক কিংবা হোক এটি হযরত মাসীহ (আঃ)-এর সঙ্গে কৃত ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্মারক, সর্বাবস্থায় এ কুপ্রথাটি কোনও না কোনও অলীক কল্পনা বা ধৃষ্টতামূলক মতবাদ কিংবা অসংগত এক বাস্তব ঘটনার সাথেই যুক্ত। সুতরাং এ কুপ্রথা পালনের কোনও অবকাশ অন্ততপক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেই। তাছাড়া তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কুপ্রথাটি নিম্নলিখিত মহা পাপসমূহের সমষ্টিও বটে।

ক.মিথ্যা বলা;

খ.ধোঁকা দেওয়া;

গ. অন্যকে কষ্ট দেওয়া এবং

ঘ.এমন এক ঘটনার স্মৃতিচারণ, যার উৎস হয় পৌত্তলিকতা, নয়ত অলীক কল্পনা কিংবা এক নবীর সঙ্গে ধৃষ্টতামূলক আচরণ।

এবার মুসলিমগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিক– এ প্রথাটি কি এর উপযুক্ত যে, অন্যদের মত নিজেরাও এতে শরীক হয়ে মুসলিম-সমাজে এর প্রচলন দেওয়া হবে?

আল্লাহ তা'আলার শুক্‌র যে, আমাদের সমাজে এপ্রিল ফুল পালনের রেওয়াজ খুব বেশি নয়। কিন্তু এখনও প্রতি বছর কিছু না কিছু খবর এ সম্পর্কে শোনা যায় যে, কোনও কোনও লোক এটি পালন করে থাকে। যারা না বুঝে এ প্রথায় শরীক হয়ে থাকে, তারা যদি ঠাণ্ডা মাথায় এর হাকীকত, এর উৎস ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে, তবে ইনশাআল্লাহ এর থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে।

সূত্র : যিক্‌র ওয়া ফিক্‌র
১৪ শাওয়াল, ১৪১৪ হিজরী
২৭ মার্চ, ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ